জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও চলমান প্রসঙ্গ

শাকিল ওয়াহেদ

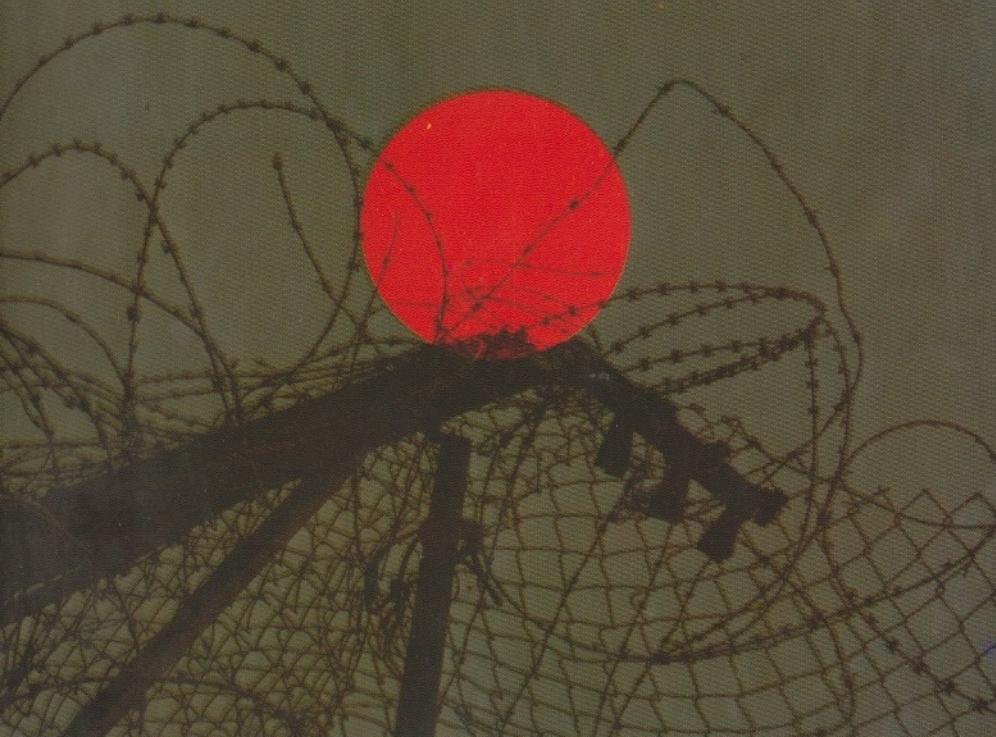

জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও চলমান প্রসঙ্গ

'জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও চলমান প্রসঙ্গ' এক অস্থির ও সংকটময় কালের চিত্র। গভীর দেশপ্রেম এবং রাজনীতি ও সমাজ বিশ্লেষণের যৌক্তিক প্রেক্ষাপটই এ গ্রন্থের মৌল প্রাণশক্তি। মুক্ত চোখ ও যুক্তিনিষ্ঠ মন লেখককে যুগিয়েছে প্রয়োজনীয় রসদ।

বেশ কিছু লেখা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে ঘিরে তাত্ত্বিক আবহে আবর্তিত। আবার কিছু লেখা চলমান প্রসঙ্গে বিশ্লেষণধর্মী। লেখার ঢঙ্গে বিশেষত্ব চোখে পড়ে। একেবারেই অফ ট্র্যাকের গোটা তিনেক লেখা রয়েছে। রুমকি নামের ছোট্ট মেয়ে, সুলেমান নামের সমাজবিচ্ছিন্ন কিশোর আর অ্যানা গ্যাব্রিয়েলা নামের গ্রিক তরুণী লেখাগুলোতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে যেন। হৃদয় ছুঁয়ে যায়। পাঠকেরা চরিত্রগুলোকে নিয়ে ভাবে, কেউ কেউ মমতায় আকুল হয়ে রুমকি, সুলেমান আর অ্যানা গ্যাব্রিয়েলার কুশল জানতে চায় লেখকের কাছে। এই বইয়ে সংকলিত সবগুলো লেখাই বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। মোটামুটি পাঠকপ্রিয়তাও পেয়েছে। গ্রন্থাকারে পাঠক কিভাবে গ্রহণ করেন এবার সেটা দেখার পালা।

—প্রকাশক

www.pathagar.com

শাকিল ওয়াহেদ ১৯৭০ সালের ৪ জুন জন্মগ্রহণ করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। পিতা মরহুম এম এ ওয়াহেদ এবং মা মরহুমা শাহেদা বেগম। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ভর্তি হন অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে এসএসসি পাস করে চলে আসেন ঢাকায়। ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি, ঢাকা সিটি কলেজ থেকে বি.কম এবং সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অফ বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ) থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন কৃতিত্বের সাথে।

কর্মজীবনের শুরু তদানীন্তন এএনজেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাঙ্কে। এক বছর পর ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে বিজ্ঞাপনের ব্যবসা শুরু করেন। ২০০৫ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি দেশে রাজনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসলে বিএনপি'র পক্ষে যথাসম্ভব সাহসী ভূমিকা রাখার সুযোগ পান এবং জাতীয়তাবাদী তাঁতী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। দৈনিক আমার দেশ-এর সাথে যুক্ত হন দেশবরেণ্য সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের নেতৃত্বে ২০০৮ সালে। কসবা-আখাউড়া নির্বাচনী এলাকা থেকে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র দলীয় মনোনয়ন লাভ করলেও পরবর্তীতে তা প্রত্যাহার করে নেন দলের পূর্বতন সংসদ সদস্যের পক্ষে। ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় কাউন্সিলে বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক নির্বাচিত হন।

স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র সন্তান নিয়ে শাকিল ওয়াহেদ এর ছোট্ট পরিবার। স্ত্রী কাজী শামছুন্নাহার (শিউলী) কসবা উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান।

'জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও চলমান প্রসঙ্গ' লেখকের প্রথম

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী রাজনীতি
ও চলমান প্রসঙ্গ

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও চলমান প্রসঙ্গ

শাকিল ওয়াহেদ

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১২

স্বত্ব : লেখক
প্রকাশক : মিজানুর রহমান সরদার
প্রচ্ছদ : মোঃ উজ্জ্বল হোসাইন

শিকড় ৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ থেকে
মিজানুর রহমান সরদার কর্তৃক প্রকাশিত
হেরা প্রিন্টার্স ২৭ শ্রীশদাস লেন
থেকে মুদ্রিত অক্ষর বিন্যাসে
শিকড় কম্পিউটার্স
ফোন ৭১১৬০৫৪

দাম ৩০০ টাকা মাত্র

Price Taka 300 Only
US $ 9 Only

JATIOTABADI RAJNEETI 'O' CHOLOMAN PROSHONGO
by Shakil Wahed Published by Mizanur Rahman Sardar
of Shikor 38 Banglabazar 2nd Floor Dhaka 1100

ISBN 984 760 162 3

www.pathagar.com

উৎসর্গ

অগ্রজপ্রতিম মাহমুদুর রহমানকে
যার সংসর্গে এসে
জীবনবোধ পাল্টে গেছে আমার

www.pathagar.com

ভূমিকা

শৈশবে কখনও কখনও ভেবেছি, বড় হয়ে একদিন লিখব। স্কুলে রচনা লিখতে গিয়ে ভেবেছি, লিখছি। শখের বশে কবিতা লিখতে গিয়ে অপরিণত পদ্য কিছু লিখে ফেলেছি—যা স্কুলের দেয়াল পত্রিকায় এবং মফস্বল শহরের লিটল ম্যাগাজিনে এক-দু'বার ছাপাও হয়েছে। কিন্তু ভারিক্কি ধরনের রাজনৈতিক লেখা কখনো লিখব এমনটা শৈশব-কৈশোরের ভাবনায় ছিল না।

সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেয়ার দু'বছরের মাথায় দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নেমে এসেছিল দুর্দিন। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারিতে পট পরিবর্তন হলে সৌভাগ্যক্রমে আমার সুযোগ ঘটে সে কঠিন সময়ে সাহসী ভূমিকা পালনকারী বিএনপি নেতা রুহুল কবীর রিজভী ও সদ্য নিযুক্ত মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পাওয়ার। সে সময় টুকটাক রাজনৈতিক লেখালেখি শুরু করেছিলাম তাদের সহায়তা করতে গিয়ে; মূলত প্রেস বিজ্ঞপ্তি, দাফতরিক চিঠিপত্র ও দলীয় ক্রোড়পত্রের জন্য বাণীর খসড়া লেখার মাধ্যমে। এর কিছুদিন বাদে যোগাযোগ ঘটে যায় অগ্রজপ্রতিম মাহমুদুর রহমানের সঙ্গে, যিনি তখন দৈনিক নয়াদিগন্তে সাহসী সব কলাম লিখে আলোড়ন তুলে চলেছেন। তার নেতৃত্বে দৈনিক আমার দেশ-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ঘটনা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। যদিও প্রথম দিকে আমি কেবলই পত্রিকাটির বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিষয় দেখাশোনা করতেই ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু বাড়তি হিসেবে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ ঘটে কী করে একটি দৈনিক পত্রিকা সকাল থেকে বিকালের মধ্যে লেখায় লেখায় ভরে ওঠে, নিপুণভাবে সম্পাদিত হয় এবং রাতের আঁধারে ছাপা হয়ে সূর্যোদয়ের পর সারাদেশে মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে যায়।

মাহমুদুর রহমান যে রাতে সরকারি রোষানলে পড়ে পত্রিকা অফিস থেকে গ্রেফতার হলেন, সেদিন রাগে-দুঃখে নিরুপায় হয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম। সে সময় সরকার, সাংবাদিক সমাজের একটি মহল এবং বিচার বিভাগের কেউ কেউ বলতে শুরু করেন, মাহমুদুর রহমান নাকি সম্পাদক হওয়ার যোগ্য নন। মাহমুদুর রহমানকে খুব কাছ থেকে দেখে এবং সেসব তির্যক বাক্যবাণ শুনে শুনে মনে হয়েছিল মাহমুদ ভাইয়ের সম্পাদক হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে একখানা যেমনই হোক লেখা আমি লিখব। উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশের আওতায় দৈনিক আমার দেশ পুনঃপ্রকাশ শুরু হলে আমরা কারান্তরীণ মাহমুদুর রহমানের মুক্তি আন্দোলন জোরদার করার জন্য প্রথম পৃষ্ঠায় বাম দিকের কলামটি উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সেই কলামে প্রতিদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা

www.pathagar.com

লিখতে থাকেন। দৈনিক আমার দেশ-এর উপ-সম্পাদক সৈয়দ আবদাল আহমদ আমাকেও একদিন সেই কলামে লেখার অনুরোধ করলে, বসে যাই লিখতে। সম্বল হল—বুকভর্তি ভালোবাসা, আবেগ আর মাহমুদুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের অভিজ্ঞতা। লিখে ফেললাম, মনে যা এল তা-ই লিখলাম। কোন জাতীয় দৈনিকে প্রথমবারের মত আমার লেখা ছাপা হল। শিরোনাম হল 'অগ্রজপ্রতিম মাহমুদুর রহমান : অকুতোভয় এক সম্পাদক'।

বিএনপির সহ-তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার সুবাদে কাঁধে চাপল বিশেষ বিশেষ দিবসে দলের ক্রোড়পত্র সম্পাদনা করার দায়িত্ব। সানন্দে দায়িত্ব নিলাম। বিএনপি চেয়ারপার্সনের প্রেস সচিব মারুফ কামাল খান সোহেল ও দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানের নির্দেশনায় ২০১০ সালে দলের ৩২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ক্রোড়পত্রটি মোটামুটি স্বাধীনভাবে সম্পাদনা করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও একখানা লেখা লিখলাম সেই ক্রোড়পত্রে। এরপর থেকে দলের প্রতিটি ক্রোড়পত্রকে উপলক্ষ করে একটি করে রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখছি। দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসেবে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে দলীয় ক্রোড়পত্রগুলো তিনিই চূড়ান্ত দেখে দিচ্ছেন। তার কাছ থেকেও বিশেষ উৎসাহ পেয়েছি লেখার ব্যাপারে।

১৭ মার্চ ২০১১ তারিখে মাহমুদ ভাই প্রায় দশ মাস কারাভোগ করে জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। এসেই আবার পত্রিকায় পূর্ণকালীন সময় দিতে লাগলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে উৎসাহ দিয়ে বললেন—শাকিল, লেখালেখি চালিয়ে যাও। দলীয় ক্রোড়পত্রে লেখার পাশাপাশি চলমান রাজনীতি ও সামাজিক বিষয় নিয়ে দৈনিক আমার দেশ-এ টুকটাক লিখতে শুরু করলাম।

নবীন লেখক হিসেবে কবি আবদুল হাই শিকদার এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ আবদাল আহমদকে প্রতিটি লেখা ছাপা হওয়ার আগে পড়তে দিয়েছি কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে শুধরে নেয়ার জন্য। তাদের এই সহযোগিতার ঋণ শোধ করবার ক্ষমতা আমার নেই। সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাংবাদিক আতাউস সামাদ লেখা পড়ে উৎসাহ দিয়েছেন কখনো ফোন করে, কখনো বা সামনাসামনি দেখা হলে কথাচ্ছলে। তার মত বিদগ্ধ পাঠকের কাছ থেকে নিয়মিত উৎসাহ পেয়ে মনের জোর বেড়ে গেছে অনেকখানি।

আমার প্রিয় নেতাদের একজন নজরুল ভাই একদিন চা খেতে খেতে বললেন, তোমার লেখাগুলো পড়ছি। মোটামুটি ভালই হচ্ছে। সবগুলো একসঙ্গে করে একটা বই করে ফেল। নইলে হারিয়ে যাবে, পরে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ নিয়ে আবদাল ভাই এবং শিকদার ভাইয়ের সঙ্গেও কথা বললাম। তারাও বই করার ব্যাপারে উৎসাহ দিলেন। সেই সূত্রেই এ বই।

www.pathagar.com

এ বই একটি সঙ্কলন মাত্র। বিভিন্ন উপলক্ষে দলীয় ক্রোড়পত্রে ও বিভিন্ন সময়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখাগুলোর একটি সোজাসাপ্টা সঙ্কলন। এর মধ্যে কিছু লেখা সরাসরি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বিশেষ করে দলীয় ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত লেখাগুলো। কিছু লেখা চলমান রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে— যেগুলো উপ-সম্পাদকীয় হিসেবে দৈনিক আমার দেশ-এ ছাপা হয়েছে। আর কিছু রয়েছে সামাজিক বিষয় নিয়ে নিজের অনুভূতি ও বিশ্লেষণ নিয়ে লেখা। প্রথম প্রকাশিত বইয়ের নবীন লেখক হিসেবে আশা করি ভুল-ভ্রান্তির জন্য সহৃদয় পাঠকের কাছ থেকে নিঃশর্ত ক্ষমা পাব।

স্ত্রী কাজী শামছুন্নাহার শিউলী ও একমাত্র কিশোর ছেলে শিখর শামস ওয়াহেদকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। আমার প্রতিটি লেখা শেষ হওয়ামাত্র প্রথম স্তরের পাঠক হিসেবে তাদের অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। তারা পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে লেখা সম্পাদনায় আমাকে সাহায্য করেছে বলে ছাপার অক্ষরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। প্রতিটি লেখা পত্রিকায় প্রকাশের পর বেশ কিছু পরিচিত-অপরিচিত পাঠক ফোন করে, কেউবা ফেসবুকে, কেউবা আবার সামনাসামনি কোথাও দেখা হলে মৌখিকভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।

লিখতে গিয়ে বিভিন্ন লেখার তথ্য-উপাত্তের জন্য অসংখ্য বই-প্রতিবেদন পড়েছি। সেখান থেকে যেমন প্রয়োজন তথ্য ব্যবহার করেছি। লেখার ভেতরেই যেখানে যেখানে সম্ভব সূত্র উল্লেখ করেছি। তাদের প্রতিও তথ্য উপাত্তের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দৈনিক আমার দেশ-এর আইটি বিভাগের প্রধান সেলিম এমদাদ, শিফট ইনচার্জ আবুল হাসেম ও মনিরুজ্জামানসহ কম্পোজারবৃন্দ আমার জটিল হাতের লেখা কষ্ট করে কম্পোজে সহায়তা করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রুফ রিডাররাও নির্ভুলভাবে লেখাগুলো ছাপাতে অবদান রেখেছেন বলে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রতিশব্দ কমিউনিকেশন্সের গ্রাফিক ডিজাইনার মোঃ উজ্জ্বল হোসাইন সুন্দর প্রচ্ছদ করে দিয়েছেন এবং শিল্পী সুকান্ত ভৌমিক প্রচ্ছদের ক্যালিগ্রাফি করে দিয়েছেন বলে তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সবশেষে প্রকাশক মিজানুর রহমান সরদার আমার মত একজন নতুন লেখকের বই প্রকাশ করতে রাজি হয়েছেন, এজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। তার যেন ব্যবসায়িক ক্ষতি না হয়, সেজন্য পাঠকের সুদৃষ্টি কামনা করা ছাড়া আমার আর কিইবা করার আছে?

শাকিল ওয়াহেদ
গুলশান, ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূ চি প ত্র

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রাসঙ্গিকতা ও তাত্ত্বিক ভিত্তি ▮ ১৩
৩২ বছরের গৌরবগাঁথা ▮ ১৯
চির উন্নত মম শির ▮ ২৬
একজন মেজরের স্বাধীনতা ঘোষণা ▮ ৩৩
শহীদ জিয়ার বিপ্লবী চরিত্র ▮ ৩৯
মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ জিয়া ▮ ৪৬
জন্মবার্ষিকীর শ্রদ্ধার্ঘ্য ▮ ৫২
গৃহবধূ থেকে দেশনেত্রী ▮ ৫৮
কারার ঐ লৌহকপাট ▮ ৬৬
উত্তরাধিকারে শুরু, যোগ্যতায় এগিয়ে চলা ▮ ৭৩
তারেক রহমানের ভবিষ্যৎ : দলীয় নেতা থেকে রাষ্ট্রনায়ক ▮ ৭৯
তাঁতশিল্পের সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা ▮ ৮৬
আড়িয়ল বিল থেকে পদ্মার ওপার : অতঃপর? ▮ ৯৫
ফেলানীকে ফেলেই দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? ▮ ১০০
লিমনরা কেমন আছে? ▮ ১০৬
টোকাই বলে গালি দিলেন প্রতিমন্ত্রী? ▮ ১১৩
হরতাল, বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ এবং পুলিশি তাণ্ডব ▮ ১১৯
বিচারপতি তোমার বিচার... ▮ ১২৫
তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা নিয়ে মুখোমুখি রাজনীতি ▮ ১৩১
সংবিধানের আত্মকথন ▮ ১৩৮
ভারতবান্ধব বনাম ভারতবিরোধী ▮ ১৪৮
দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং আওয়ামী মন্ত্রীদের উপদেশ বর্ষণ ▮ ১৫৫
বন্ধু কেন শত্রুর মত নিষ্ঠুর? ▮ ১৬১
সরকারের ভিত কি নড়ে গেছে? ▮ ১৬৮
অগ্রজপ্রতিম মাহমুদুর রহমান : অকুতোভয় এক সম্পাদক ▮ ১৭৬
স্কুল পালানো রুমকি ও তার বাবার কষ্ট ▮ ১৮৬
সুলেমানের কোরবানি দেখা ▮ ১৯৩
অ্যানা গ্যাব্রিয়েলা ▮ ২০০
রুস্তমের গায়েবি ফোন ▮ ২০৭
জন্ম তব বঙ্গে ▮ ২১৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রাসঙ্গিকতা ও তাত্ত্বিক ভিত্তি

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান করে অবিভক্ত ভারতবর্ষ ধর্মের ভিত্তিতে যখন দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল তখন রাজনীতিবিদেরা কি ভেবেছিলেন যে ২৪ বছর পরে তা আবারো বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশ নামক আর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নিতে পারে? ভাবেননি যে, তা বোঝাই যায়। যতটুকু ভেবেছিলেন, তার ভিত্তিতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জন্যে ভারত এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জন্যে পাকিস্তান এই দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। ভারত বিভাগের এই কালে বাঙালি জাতিগোষ্ঠী যে দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ল, তাও তাদের চোখে অস্বাভাবিক বলে মনে হলনা। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরা ভারতের অংশে পড়া পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরা পাকিস্তানের অংশে পড়া পূর্ব পাকিস্তান নামক প্রদেশে বসবাস করতে থাকল। ধর্মীয় জাতীয়তাবোধ সেসময়ে অন্যসব বোধকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং ধর্মের ভিত্তিতে দুটি পৃথক রাষ্ট্র ভারত-পাকিস্তান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠী স্বাধীন হিন্দুস্তান পাবার আনন্দে মাতোয়ারা রইল অন্যদিকে মুসলমান জনগোষ্ঠী হিন্দু আধিপত্যের বাইরে নিজস্ব রাষ্ট্র পাকিস্তান পেয়ে আপাতত তুষ্ট হল। ধর্মের বাইরে যে সমস্ত জাতিগত পরিচয় ছিল যেমন বাঙালি, মারাঠা, পাঞ্জাবী, তামিল প্রভৃতি সাময়িককালের জন্য হলেও ধর্মীয় জাতীয়তাবোধের উন্মাদনার নিচে চাপা পড়েছিল। হিন্দু নাকি মুসলমান এই ছিল বড় প্রশ্ন, কে বাঙালি আর কে তামিল সে প্রশ্ন ওঠেনি। পূর্ব পাকিস্তান নামক ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডটির পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি যে মস্তবড় এক ভুল ছিল তা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ নামক একটি নতুন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ভৌগোলিক অবিচ্ছিন্নতা যে জাতিরাষ্ট্র গঠনের জন্য এক অপরিহার্য বিষয় তাও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের বাস্তবতায় পরবর্তীতে সবাই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রায় ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগকালীন মস্ত বড় ভুলটি শোধরানো সম্ভবপর হয়।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের অধিবাসী বাঙালিরা ব্রিটিশ আমলে যেমন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের দ্বারা অবহেলিত হয়েছে বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের

www.pathagar.com

শিকার হয়েছে তেমনি ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পরে পাকিস্তান আমলেও চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত বাঙালিরা না পেরেছিল কখনো ঠিকমত ভারতীয় হতে, না পারল পরবর্তীতে পাকিস্তানী হতে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অপরিণামদর্শী অবহেলা, বৈষম্য আর বাঙালি বিদ্বেষ বিদ্যমান থাকার কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যেই বাঙালিদের মোহভঙ্গ ঘটে যায়। পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা এবং সামরিক-বেসামরিক আমলারা এই অবহেলিত প্রদেশটির সাধারণ জনগণের মন-মানসিকতা বুঝতে এবং এর বিশেষ স্পর্শকাতরতার দিকে সুনজর দিতে ব্যর্থ হন। ১৯৫২ সালে বাঙালিরা প্রথম পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রভাষা ইস্যুতে যখন ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে তখনই তারা বিশেষভাবে অনুধাবন করতে শুরু করে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিবাসী হলেও তারা যেন আলাদা কেউ। যেন শুধুই পাকিস্তানী নয়, তার চেয়েও বেশি করে তারা বাঙালি। তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দূরবর্তী বিচ্ছিন্ন এক ভূখণ্ডে বসবাস করে, তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে, তাদের হাসি-কান্না-গান-বাজনা-উৎসব-পার্বন পাকিস্তানের বাকি অংশ থেকে আলাদা। সমগ্র পাকিস্তানের সাপেক্ষে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তারা শাসনক্ষমতায় যেতে পারেনা বরং কেবলই শাসিত হয়, চাকরি-বাকরি-ব্যবসা-বাণিজ্যে-রাজনীতিতে তারা শুধুই পিছিয়ে পড়ে।

পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ হয়, স্বপ্নভঙ্গ ঘটে পূর্ব পাকিস্তান নামক প্রদেশটিতে। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাসহ নানা অবহেলা আর বৈষম্য এক ধরনের মানসিক বিচ্ছিন্নতাও সৃষ্টি করল। ধীরে ধীরে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে বসবাসরত বাঙালিদের মানসে স্বতন্ত্র এক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটতে থাকে অবচেতনভাবেই। পরিণতিতে পূর্ব পাকিস্তান এক পর্যায়ে হয়ে ওঠে 'বাংলা'। এই 'বাংলা' তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান নামক ভূখণ্ডটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল, আশ্চর্যজনকভাবে পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গে বসবাসরত বাঙালিদের মধ্যে এর কোন সাড়া পড়ল না। 'বাংলা' নামটির সাথে দেশ শব্দটি জুড়ে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত বাঙালিরা 'বাংলাদেশ' নামের একটি নতুন দেশ গঠন করতে চাইল। এই নতুন দেশ 'বাংলাদেশ' পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ এবং ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ দুটোর সমন্বয়ে গড়ে উঠতে পারত, ভৌগোলিক অবিচ্ছিন্নতা আর অভিন্ন ভাষার সুবাদে তেমনটি হলে আশ্চর্য হবার কিছু ছিলনা। কিন্তু হলনা। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী বাঙালিরাই শুধু বাংলা নিয়ে স্বপ্ন দেখল, বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র বা দেশ গড়তে চাইল। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা সে স্বপ্ন থেকে যে কোন কারণেই হোক দূরে রইল এবং বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অংশ হতে চাইলনা বা একাত্ম হতে পারল না। এপার বাংলা আর ওপার বাংলা পৃথক ছিল, পৃথকই রয়ে গেল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে একজন মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ড হানাদার মুক্ত হয় এবং সারাবিশ্বে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ সময়ে নব্য স্বাধীন দেশটির অধিবাসী নাগরিকদের জাতীয়তা কি হবে সেই প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে সামনে চলে আসে। তৎকালীন প্রধান নেতা এবং রাষ্ট্রনায়ক মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সকল অধিবাসীকে বাঙালি বলে অভিহিত করেন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ সবার জন্য প্রযোজ্য বলে ঘোষণা দেন। বাংলাদেশের সব জনগোষ্ঠীর জন্য বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য চাকমা নেতা মানবেন্দ্র লারমা তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেন সেসময়ে এবং স্পষ্টভাবে বলেন যে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হলেও জাতিগতভাবে বাঙালি নন বরং তিনি একজন চাকমা। প্রত্যুত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান মানবেন্দ্র লারমাকে চাকমা পরিচয় ভুলে গিয়ে বাঙালি হয়ে যাবার পরামর্শ দেন। পরবর্তীতে মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বে শান্তি বাহিনী গঠন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদী লড়াই শুরু করার ঘটনা সবারই জানা। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বসবাসরত সংখ্যাগুরু বাঙালি জাতিসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে স্বীকৃতি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য জাতীয়তা নির্ধারণ করার প্রয়োজন সর্বপ্রথম অনুভব করেছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই ভাবতে থাকেন কি করে বিভেদ ভুলে বাংলাদেশের ছোট বড় সকল জাতিগোষ্ঠীকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তার পরিচয়ে পরিচিত করা যায়। সেই ভাবনা থেকেই যুগান্তকারী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণা রূপলাভ করে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাতে।

তাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণাটি ৭টি মৌলিক উপাদান বা ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। সেগুলো হল প্রথমত, জাতিগঠনে উন্মুখ জনগোষ্ঠী; দ্বিতীয়ত, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ; তৃতীয়ত, আমরি বাংলা ভাষা; চতুর্থত, স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ড; পঞ্চমত, যার যার ধর্মপালনের স্বাধীনতা; ষষ্ঠত, অনন্য সাধারণ এক সংস্কৃতি এবং সপ্তমত, স্বাধীন দেশের উপযোগী স্বনির্ভর অর্থনীতি। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিসহ বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রে বসবাসকারী ছোট বড় সব জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জনগণই হল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রথম উপাদান বা ভিত্তি। এই সামগ্রিক জনগোষ্ঠীকে বিবেচনা করার ফলে বাঙালি ছাড়া অন্য সব ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের কাছেও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণাটি সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়। আবার এর ফলে বাংলাদেশে বসবাস করেন না এমন বাঙালি যেমন পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বাঙালিদের জাতীয়তার সাথে বাংলাদেশে বসবাসকারী বাঙালিদের জাতীয়তার

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরুপণ করা সম্ভবপর হয়। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বাঙালিরা জাতীয়তাসূত্রে বাংলাদেশী নন, ভারতীয়। আর বাংলাদেশে বসবাসকারী বাঙালিরা হলেন জাতীয়তাসূত্রে বাংলাদেশী। আবার বাংলাদেশে বসবাসকারী চাকমা, মগ, গারো, সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীগুলো বাঙালি না হলেও জাতীয়তাসূত্রে বাংলাদেশী হবার সুযোগ লাভ করেন।

এরপর আসে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা। আমরা সবাই জানি যে, বাংলাদেশী জাতির জন্ম হয়েছে এক রক্তক্ষয়ী মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে। সারা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম জাতিই রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে জন্মলাভ করেছে। তাই আমাদের গৌরবময় মহান স্বাধীনতা যুদ্ধকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় কোন জনগোষ্ঠীর প্রাণ বিসর্জনের নজিরবিহীন ঘটনা হিসেবে বিশ্বের ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই অনন্য ভাষা আন্দোলনই বাঙালি জাতিকে প্রাথমিকভাবে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে যা পরবর্তীতে আরো বিকাশ লাভ করে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে। তাই বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি একটি স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ড বা মানচিত্র। এই ভূখণ্ডের ওপর আমাদের অবারিত অধিকার। এখানে আমরা বসবাস করতে পারি নির্ভয়ে-নিরুপদ্রবে। আমাদের ভূখণ্ড বা মানচিত্র হল তাই আমাদের জাতীয়তাবাদের, স্বাধীনতার ও সার্বভৌমত্বের মূর্ত প্রতীক।

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা বাংলাদেশের বাস্তবতায় বেমানান। কারণ বাংলাদেশের মানুষ সাধারণভাবে ধর্মপ্রাণ। ধর্মীয় অনুশাসন আর আচার অনুষ্ঠান এই দেশের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, উৎসব প্রভৃতি জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলো আবহমানকাল থেকে ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের সমাজে। তাই এই দেশের সংখ্যাগুরু মুসলমান জনগোষ্ঠীসহ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অবাধ স্বাধীনতা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আরেকটি ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। আমাদের রয়েছে এমন এক শেকড়ে প্রোথিত সংস্কৃতি যা অন্য সবার চেয়ে আলাদা। হাজার বছরের ঐতিহ্যে বেড়ে ওঠা এই সংস্কৃতি আমাদের আলো, বাতাস, জীবনযাত্রার সাথে একাকার হয়ে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সাথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও আমাদের সংস্কৃতি মৌলিকভাবে ভিন্নতর। আমাদের আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা, পোশাক-আশাক, খাদ্যাভ্যাস, সাহিত্য-সঙ্গীত অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। এই অনন্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। সর্বশেষে রয়েছে

www.pathagar.com

আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। বাংলাদেশের স্বাধীন ভূখণ্ডে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তাদের স্বতন্ত্র জীবন-জীবিকাকে ঘিরে আবর্তিত, স্বনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকার অবলম্বন। এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতাকেও তাই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রটির অভ্যুদয়ের বাস্তবতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনিবার্য রূপান্তর ঘটেছিল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হিসেবে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সেই রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে তাত্ত্বিক ভিত্তি স্পষ্টীকরণের কাজটি করে দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙালি জনগোষ্ঠী স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র লাভের পর অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে তারা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের মত বাঙালি নয়, তারা নতুন স্বতন্ত্র এক আত্মপরিচয়ের প্রয়োজন অনুভব করে। কারণ তাদের সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এক সমমনা জনগোষ্ঠী আছে, সার্বভৌম ভূখণ্ড বা মানচিত্র আছে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আছে বাংলা ভাষা, গৌরবময় স্বাধীনতা যুদ্ধ আছে, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে এমনকি নিজেদের জীবন-জীবিকার জন্য স্বাধীন স্বনির্ভর অর্থনীতি আছে। যার বেশিরভাগ উপাদান ভারতের অন্তর্গত প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গে বসবাসরত বাঙালিদের নেই। তাই নৃতাত্ত্বিকভাবে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা এক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধে বিলীন হয়ে আছে, তাদের জাতীয়তাবোধ নৃতাত্ত্বিক বাঙালি জাতীয়তাকে ছাড়িয়ে রাষ্ট্রীয় ভারতীয় জাতীয়তায় রূপান্তরিত হয়েছে। এর বিপরীতে স্বাধীন বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে বসবাসরত নাগরিকদের জন্য স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদ হিসেবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদই তাই যৌক্তিক পরিণতি হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তা রাষ্ট্রীয় জাতীয়তায় রূপান্তরের এমন ঘটনাকে নজিরবিহীন বলা যাবে না। নৃতাত্ত্বিকভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশাল আরব জাতি যেমন রাষ্ট্রীয়ভাবে মিশরীয় কিংবা আলজিরীয় কিংবা ইরাকী কিংবা সিরীয় জাতীয়তাকে গ্রহণ করেছে তেমনিভাবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা ভারতীয় আর বাংলাদেশের বাঙালিরা বাংলাদেশী জাতীয়তাকে গ্রহণ করেছে। আজ স্বাধীনতা অর্জনের চল্লিশ বছর পর বাঙালি জাতীয়তাবাদ বনাম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নিয়ে অহেতুক বিতর্কের অবসান হওয়া প্রয়োজন। কারণ নৃতাত্ত্বিকভাবে আমরা বাঙালি হলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা যে বাংলাদেশী জাতীয়তা ধারণ করি, এ বিষয়ে তো কোন সন্দেহ পোষণ করার সুযোগ নেই।

বিএনপি'র ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমার দেশ, প্রথম আলো, যুগান্তর, নয়াদিগন্ত, দিনকাল, সংগ্রাম প্রভৃতি জাতীয় দৈনিকে বিএনপি কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে ছাপা হয়েছে ৩০ আগস্ট ২০১১ তারিখে

www.pathagar.com

৩২ বছরের গৌরবগাঁথা

আজ ১লা সেপ্টেম্বর। আজ থেকে ৩২ বছর আগে ১৯৭৮ সালের এই দিনে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠার ফলে দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক শূন্যতা ও অস্থিরতা অবসান করে মুক্ত পরিবেশে কার্যকর বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিএনপি প্রতিষ্ঠার ঘটনা ঐতিহাসিকভাবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়াও বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র রয়েছে গৌরবৌজ্জ্বল অবদান। বাকশাল পরবর্তী অস্থিরতায় ও রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণে যেমন প্রতিষ্ঠালগ্নে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বিএনপি তেমনি আবার স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের কবল থেকে গণতন্ত্রকে মুক্ত করতেও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আপসহীন আন্দোলন সংগ্রামে ৯ বছর অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এই বিএনপি। আবার বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের প্রিয় দল বিএনপি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সর্বাধিকবার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছে। আজ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে ৩২ বছরের যুবক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি'র কার্যক্রম ও অবদানের একটি মূল্যায়ন প্রচেষ্টা প্রাসঙ্গিক বলেই মনে করি।

বিএনপি রাজনীতির মূল আদর্শগত তাত্ত্বিক ভিত্তি হল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, উৎপাদনের রাজনীতি ও জনগণের গণতন্ত্র। দলটির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন মহান স্বাধীনতার ঘোষক এবং নিখাঁদ দেশপ্রেমিক একজন অনন্য রাষ্ট্রনায়ক। ৭৫ পরবর্তী বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে পুরো জাতি যখন এক অনিশ্চয়তা ও হতাশায় নিমজ্জিত তখন ৭ই নভেম্বর ঐতিহাসিক সিপাহী জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে বন্দিদশা থেকে মুক্ত হন তিনি। দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে দেশের স্বার্থে জীবন বাজি রেখে তিনি দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং দ্বিধাবিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যুগান্তকারী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রবর্তন করে তাত্ত্বিকভাবে তা প্রতিষ্ঠাও করেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিএনপি নামক ৩২ বছর বয়সী দলটির সবচেয়ে বড় অবদান হল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে বসবাসরত সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিসহ নানা ক্ষুদ্র জাতি সত্তা ও ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অভিন্ন গ্রহণযোগ্য পরিচয় নির্ধারণ করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারা।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ বহুদলীয় গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করে একদলীয় বাকশাল নামক ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম করেছিল। ১৯৭৫ এর রক্তক্ষয়ী পট পরিবর্তনের পর নানা অস্থিরতা, উত্থান-পতনের মাধ্যমে যে গভীর রাজনৈতিক শূন্যতা ও সংকট সৃষ্টি হয়েছিল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রতিষ্ঠা করে সেই শূন্যতা পূরণের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি বাকশালের আওতায় বিলুপ্ত স্বয়ং আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ করে দিয়ে মুক্ত পরিবেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। সবগুলো রাজনৈতিক দলকে অবাধে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি করার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে একটি উদার গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণে বিএনপি তথা এর প্রতিষ্ঠাতা শহীদ জিয়াউর রহমানের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাকশালের আওতায় মাত্র চারটি পত্রিকা সরকারি মালিকানায় নিয়ে বাকি সকল পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। রুদ্ধ হয়েছিল মত প্রকাশের স্বাধীনতা। কিন্তু বিএনপি সবগুলো সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমকে মুক্ত করে দিয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিল। পরবর্তীতেও বিএনপি সবসময় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ও তথ্য প্রবাহকে অবারিত রাখতে সংগ্রাম করেছে আর রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে থাকাকালে নতুন নতুন সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, রেডিও ইত্যাদি ব্যাপকহারে প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

আওয়ামী বাকশালীদের ফ্যাসিস্ট কায়দায় সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরার বিপরীতে বিএনপির পক্ষ থেকে গণমাধ্যমের প্রতি ইতিবাচক ভূমিকা সাংবাদিক সমাজ ও দেশবাসী সবসময় কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে। বর্তমানের জাতীয় প্রেসক্লাবটির জমি প্রদানসহ ভবন নির্মাণের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। এছাড়াও প্রেস ইন্সটিটিউট অফ বাংলাদেশ (পিআইবি) ও প্রেস কাউন্সিল নামক দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া।

বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহ্যগতভাবেই ধর্মপরায়ণ আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার যে ভ্রান্তনীতি আওয়ামী বাকশালীরা চালু করেছিল তা পরিবর্তন করে সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে 'পরম করুণাময় আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপন করেছিল বিএনপি।

আর সংখ্যাগুরু মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখিয়ে সংবিধানের শুরুতেই বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম সন্নিবেশিত করেছিল বিএনপি। পাশাপাশি অন্য সকল ধর্মাবলম্বীদের যার যার ধর্ম পালনের স্বাধীনতাও নিশ্চিত করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে দেশের ধর্মপরায়ণ সকল মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

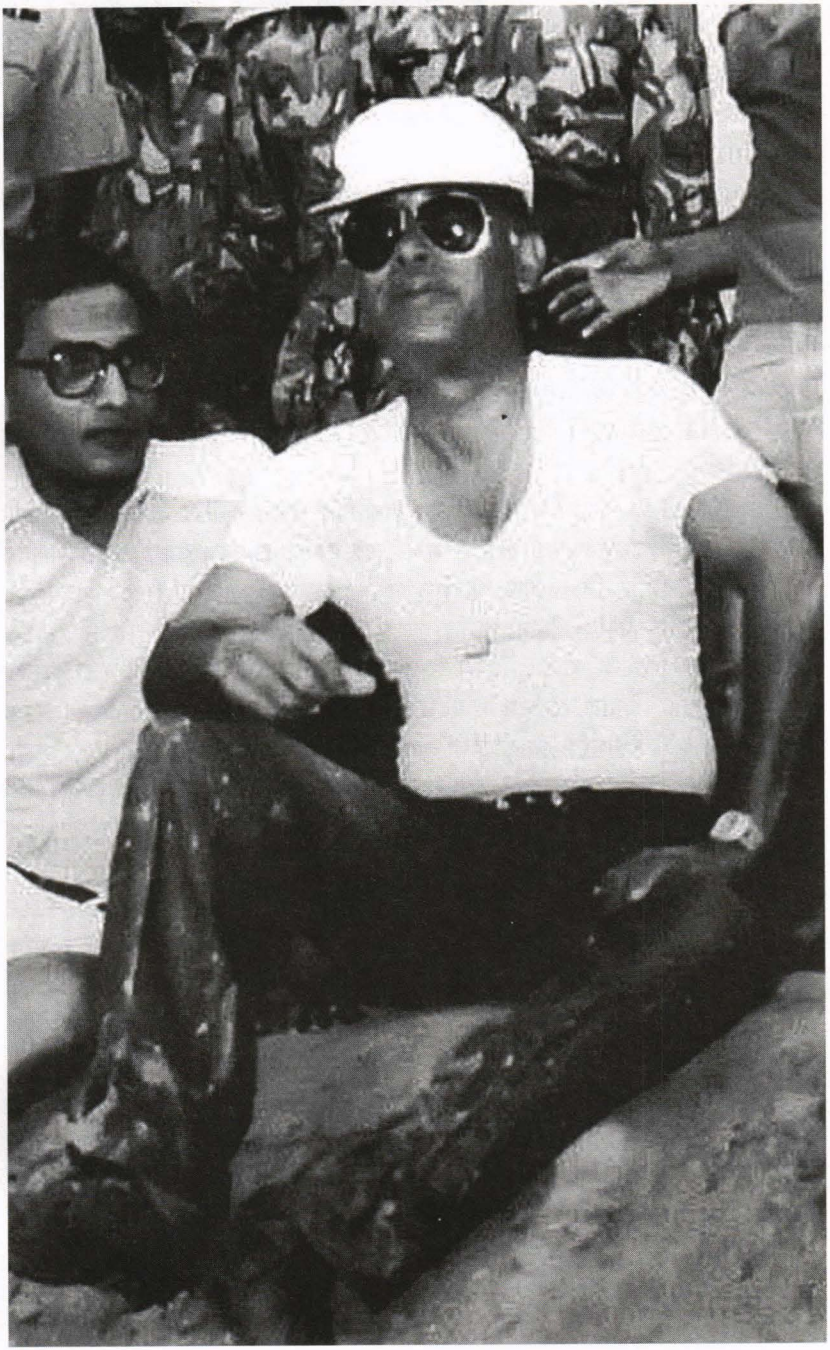

www.pathagar.com

বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। তার শাহাদাত বরণের মধ্যদিয়ে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হবার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৮১ সালেই। কিন্তু জনপ্রিয় মহান রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডে ক্ষুব্ধ সমগ্র দেশের মানুষের প্রবল প্রতিক্রিয়ায় কুচক্রীরা সে সময়েই ক্ষমতা গ্রহণে সাহস করে উঠতে পারেনি।

তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে বিএনপি গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু আড়ালে থাকা কুচক্রীদের প্রতিভূ স্বৈরাচারী এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বিএনপি সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ জনমানুষের প্রিয় দল বিএনপিকে ধ্বংস করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে স্বৈরাচারী এরশাদ। হামলা, মামলা, ভয়ভীতি, নির্যাতন, গ্রেফতারসহ নানা কায়দায় দেশব্যাপী বিএনপি নেতাকর্মীদের দলত্যাগ করার জন্য চাপ দেয়া হতে থাকে।

কেউ কেউ দল ত্যাগ করে, কেউবা রাজনীতি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, কেউবা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকে। দলের এই দুর্দিনে ও দূরবস্থার মধ্যে তৎকালের বিএনপি চেয়ারম্যান বিচারপতি আবদুস সাত্তার সময়ের দাবিতে নিরীহ গৃহবধূ ও দলের তৎকালীন ভাইস চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার কাছে দলের দায়িত্ব অর্পণ করেন। শুরু হয় দল পুনর্গঠন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দীর্ঘ সংগ্রাম দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে। গৃহবন্দিত্ব থেকে শুরু করে স্বৈরাচারের নানা নির্যাতনসহ কূটকৌশলকে মোকাবেলা করে তিনি স্বয়ং রাজপথে আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্বে দিতে থাকেন। দলের ভেতরে নতুন প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হতে থাকে, জনসমর্থন বাড়তে থাকে, সারাদেশে নতুনভাবে বিএনপির পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হতে থাকে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে।

তিনি স্বৈরাচারের অধীনে ১৯৮৬ সালের নির্বাচনসহ সকল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তার এই আপসহীন নেতৃত্বে জনগণের আস্থা বাড়তে থাকে এবং স্বৈরাচারের পতন আন্দোলনে তিনি মূল নেত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হন। অবশেষে ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারের পতন ঘটে। অভ্যুদয় ঘটে এক নতুন বিএনপির তথা এক পরিণত আপসহীন দেশনেত্রীর। রাজপথের সংগ্রামে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে পোড়খাওয়া অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ দল বিএনপি এবং তার নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জনগণের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নেন তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আপসহীন নেতৃত্বের গুণাবলীর জন্য। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে স্বৈরাচার বিরোধী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে বিএনপির ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

১৯৯১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সে নির্বাচনে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি অভাবনীয় বিজয় অর্জন

www.pathagar.com

করে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে সুদীর্ঘ ৯ বছর পর। দেশনেত্রী খালেদা জিয়া বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন যা ইতিহাসের পাতায় বিএনপির অবদান হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার অঙ্গীকারে এই সময়ে বিএনপি সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে আরেকটি মাইলফলক স্থাপন করেছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩২ বছরে বিএনপি নানা সময়ে নানা মেয়াদে মোট পাঁচবার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছে। এই শাসন পরিচালনার সময়গুলোতে দেশে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছে বিভিন্ন খাতে। বিএনপি শাসনামলের পরিসংখ্যানের সাথে অন্য সময়ের পরিসংখ্যান তুলনা করলেও তা সহজেই অনুধাবন করা যাবে। প্রথম মেয়াদে দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তৎকালীন বিপর্যস্ত বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রটির সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়তে ও দারিদ্র্য বিমোচন করতে সচেষ্ট ছিলেন। দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি ১৯ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে উন্নয়নের এক শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের সূচনা করেন। তিনি কৃষি প্রধান বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি জমি সর্বোত্তম ব্যবহার করার ওপর জোর দিয়েছিলেন।

সারাদেশের অনাবাদী পতিত জমি আবাদী করতে এবং প্রয়োজনীয় সেচের পানির জন্য খাল কাটা কর্মসূচীর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর ফলে যে বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছিল সেই দেশই বিদেশে খাদ্য রফতানি করতে সক্ষম হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও শিক্ষা বিস্তারে তার প্রচেষ্টা ছিল সময়োপযোগী। তার সময়েই গার্মেন্ট শিল্প হাঁটি হাঁটি পা করে যাত্রা শুরু করে ছোট আকারে যা আজ দেশের প্রধান রফতানি খাতে পরিণত হয়েছে। তার আমলেই তার পৃষ্ঠপোষকতায় নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস-এর উদ্যোগ আজ বিশ্বসমাদৃত গ্রামীণ ব্যাংক কর্মসূচীতে পরিণত হয়েছে যা পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশাল ভূমিকা রাখছে। দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তার স্বল্প সময়ের শাসনকালে কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার জোয়ার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন সারাদেশে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ ও মাঠে ঘাটে সফরের মধ্য দিয়ে।

তার শাসনামলেই আওয়ামী বাকশালী কর্তৃক প্রবর্তিত তথাকথিত সমজাতন্ত্রের নামে পুরো রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতির বিপরীতে বিএনপি বেসরকারি খাতের বিকাশে যথাযথ নীতিকাঠামো চালু করে। তৎপরবর্তীতে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৩ বার বিভিন্ন মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে দেশের অর্থনীতি ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে। বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি শিল্পখাতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯৯১ - ৯৬ ও ২০০১ - ২০০৬ মেয়াদে রাষ্ট্র পরিচালনাকালে দেশে রেকর্ড পরিমাণ বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়,

www.pathagar.com

শিল্প খাতে সর্বোচ্চ শতকরা ১১ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পায় (৬ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমপরিমাণ), জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির সবগুলো সূচকেই ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বিএনপি তার শাসনামলে নানা পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরতা ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে এনে আত্মনির্ভরশীল বাজেট প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়।

জাতীয় রাজস্ব আয় দিয়ে রাজস্ব বাজেট অর্থায়ন করাসহ বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটেরও সিংহভাগ নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়নে সক্ষমতা অর্জন করে। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের উপযোগী করে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য জেলা-উপজেলা পর্যায়ে হাসপাতাল স্থাপন ও আধুনিকীকরণসহ ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয়। সারাদেশে রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্টসহ নগর ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিএনপি তার শামনামলগুলোতে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল। তথ্য প্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ খাতে বিএনপি যথাযথ নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে।

আওয়ামী লীগের সৃষ্ট দীর্ঘদিনের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে বিএনপি সবসময় দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার চেতনায় বাস্তবানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিএনপি বরাবরই কৃতিত্ব দেখিয়েছে। আওয়ামী দুঃশাসনের বিপরীতে বিএনপি সন্ত্রাসী চাঁদাবাজসহ আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী শীর্ষ সন্ত্রাসী ও গডফাদারদের দমনে নানা সময়ে দলনিরপেক্ষভাবে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশ পরিচালনায় বিএনপির কৃতিত্বসমূহ এতই ব্যাপক যে, তার বিস্তারিত বর্ণনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়।

দেশ জাতির এক ক্রান্তিকালে বিএনপির জন্ম। শৈশব কৈশোর পেরিয়ে নানা চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে এই দল আজ ৩২ বছরের এক টগবগে যুবক। এই বৈচিত্র্যময় চলার পথে দলের ঝুলিতে জমা হয়েছে রাষ্ট্রপরিচালনাসহ জনগণের পাশে থেকে আন্দোলন সংগ্রামের বর্ণিল অভিজ্ঞতা।

জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে তাদের সাথে দলের সম্পৃক্ততা বেড়েছে সময়ের পরিক্রমায়। আজ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল পরিণত হয়েছে দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলে। তাই জনগণ, দেশ ও জাতির প্রতি এই দলের দায়বদ্ধতা বেড়ে গেছে অনেক গুণে। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এবং দলকে তৃণমূল পর্যায় থেকে সংগঠিত করে আরও জনসম্পৃক্ত ও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন দলে তারুণ্যের প্রতীক বর্তমান সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার উদ্যোগ, সামর্থ ও জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে

www.pathagar.com

প্রতিপক্ষ তার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। মিথ্যা অভিযোগে আটক করে সীমাহীন নির্যাতন চালিয়ে তাকে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। তিনি আজ বিদেশে চিকিৎসাধীন।

দেশপ্রেমিক জনগণ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম অপেক্ষা করছে সুস্থ তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনের জন্য। আমাদের মাঝে ফিরে এসে তারেক রহমান তার প্রিয় দলকে আধুনিকায়ন ও আরও জনসম্পৃক্ত করতে আবারও যথাযথ ভূমিকা নেবেন এই প্রত্যাশা আজ আমাদের সবার। আজকের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই দিনে দলের ৩২ বছরের গৌরবগাঁথা আরো দায়িত্বশীলতার সাথে সামনের দিকে এগিয়ে নেবার শপথ নিতে আহ্বান জানাই দলের প্রতিটি নেতাকর্মীকে।

বিএনপি'র ৩২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমার দেশ, কালের কণ্ঠ, যুগান্তর, নয়াদিগন্ত, দিনকাল প্রভৃতি জাতীয় দৈনিকে বিএনপি কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে ছাপা হয়েছে ১ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে

www.pathagar.com

চির উন্নত মম শির

সবার পক্ষে সম্ভব না হলেও কেউ কেউ ভীড়ের মধ্যে নজরে পড়ার মত মাথা উঁচু করেই চলেন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আজীবন মাথা উঁচু রেখেছেন এবং তার প্রিয় দেশবাসীকে মাথা উঁচু করে চলবার দীক্ষা দেয়ার চেষ্টা করে গেছেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। ১৯৫৩ সালে তিনি যখন তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার হিসেবে যোগ দেন তখন তার বয়স মাত্র ১৭ বছর। সেই তরুণ বয়সেই পদ্ধতিগতভাবে মাথা উঁচু রাখবার শপথ নিয়েছিলেন নিজ পেশার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। তার পেশাগত ও রাজনৈতিক জীবনের পুরোটা জুড়ে রয়েছে কেবলই মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাবার অদম্য সাহসী প্রবণতা যা ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে তার জীবনকে বিপন্ন করেছে বারবার। কিন্তু দমাতে পারেনি এই দেশপ্রেমিক বীরকে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যখন যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় ঘটে তখন জিয়াউর রহমান একজন জেন্টেলম্যান ক্যাডেট অফিসার হিসেবে এবোটাবাদের সামরিক একাডেমীতে প্রশিক্ষণরত। শেরে বাংলা-সোহ্‌রাওয়ার্দী-ভাসানীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে আর সব বাঙালিদের মত একাডেমীতে প্রশিক্ষণরত বাঙালি ক্যাডেটরাও আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছিলেন বলে জানা যায়। প্রতিক্রিয়ায় একাডেমীর পশ্চিম পাকিস্তানী ক্যাডেটরা যুক্তফ্রন্টের বাঙালি জাতীয় নেতাদেরসহ সমগ্র বাঙালি জাতিকে গালাগাল করতে থাকলে অন্যসব বাঙালি ক্যাডেটদেরসহ জিয়াউর রহমান সেই দিন তুমুল বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। উত্তেজনাপূর্ণ বাকযুদ্ধ এক পর্যায়ে দু'পক্ষের দু'জনের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবার সিদ্ধান্ত হয়। জাত্যাভিমানে এগিয়ে গিয়ে তরুণ জিয়াউর রহমান বাঙালি ক্যাডেটদের পক্ষে মুষ্টিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি ক্যাডেট লতিফের সঙ্গে। সেই ক্ষণস্থায়ী মুষ্টিযুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন তিনি।

মাথা উঁচু করে দিয়েছিলেন একাডেমির সকল বাঙালি ক্যাডেটের তথা সমগ্র বাঙালি জাতির। সামরিক প্রশিক্ষণের ২য় বছরেই যথাসময়ে মাথা উঁচু করে রুখে দাঁড়াবার এই ঘটনাটি শুধুমাত্র ছেলেমানুষী উত্তেজনা হিসেবে উড়িয়ে দেবার জো নেই। বরং 'মর্নিং শোজ দ্যা ডে' প্রবাদটি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বলে স্মরণ করা যেতে পারে। মাত্র ১৮ বছর বয়সে এক তরুণের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার যে রোমান্টিক যাত্রা শুরু হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি বারবার আমরা দেখতে পাই তার পরবর্তী জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৯৬৫ সালের কথা। পাক-ভারত যুদ্ধ চলছে। জিয়াউর রহমান তখন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানির কমান্ডার হিসেবে লাহোরের নিকটবর্তী খেমকারান সেক্টরে লড়ছেন। ভারতীয় রাজপুত, মারাঠা, পাঞ্জাব প্রভৃতি নামিদামি রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে তার কোম্পানি অসম সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বীরত্বের খেতাব অর্জন করেছিল। ২৯ বছরের যুবক সেনাধ্যক্ষ জিয়াউর রহমান সেই সময়ে মাথা উঁচু করে সম্মুখ সমরে লড়বার মাধ্যমে যোদ্ধা হিসেবে বাঙালি রেজিমেন্টের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে। ১৮ বছর বয়সে মুষ্টিযুদ্ধ মোকাবেলা যে কেবলই ছেলেমানুষী আবেগ ছিল না তার প্রমাণ দিলেন পরিণত যুবা বয়সে পুনর্বার বীরত্বের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়ে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর বীর সিপাহসালার জিয়াউর রহমান আর তার আলফা কোম্পানিকে চেনে না এমন কেউ তাবৎ পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিল না। সবাই চিনে নিয়েছিল বাঙালি বীর জিয়াউর রহমানকে যিনি যখন প্রয়োজন মাথা উঁচু করে লড়তে জানেন।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানির সেনানায়ক জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে অভূতপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে ২য় সর্বোচ্চ খেতাব অর্জন করার ঘটনাটি অবচেতনভাবে বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধের আগাম প্রস্তুতি হিসেবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ করে এজন্য যে এর মাত্র ৬ বছর পরই ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে শৌর্যবীর্যের সুনামে পিছিয়ে থাকা এই বাঙালি রেজিমেন্টকেই তথাকথিত পৃথিবী সেরা পাকবাহিনীর মুখোমুখি হতে হয়েছিল। যেই পাকবাহিনীতে ছিল ঐতিহাসিকভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ পাঞ্জাব, পাঠান, বালুচ প্রভৃতি স্বনামখ্যাত যোদ্ধা রেজিমেন্টসমূহ, সেই দুর্ধর্ষ পাকবাহিনীকে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধে মোকাবিলা করার মানসিক সামর্থ্য অর্জনের সূচনা কি ১৯৬৫ সালেই ঘটেছিল? জিয়াউর রহমান কি মাথা উঁচু করে ভারতীয় বাহিনীর মারাঠা, পাঞ্জাব, রাজপুত রেজিমেন্টগুলোর বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিক ও সেনা কর্মকর্তাদের মনে 'আমরাও পারি' ধরনের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলেন?

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। উত্তাল সারা বাংলা। স্বাধীনতার দাবি স্বাধিকারের দাবি চারিদিকে। ২৫ মার্চ গভীর রাতে অপারেশন সার্চলাইট নামে বিভীষিকাময় গণহত্যা চালালো বর্বর পাকবাহিনী। গ্রেফতার বরণ করলেন শেখ মুজিবুর রহমান। নেতৃত্বহীন জাতি তখন দিশেহারা। ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছে আপাত নিরীহ বাঙালি জাতি। দিক নির্দেশনাহীন এই অবস্থায় একজন মেজর জিয়া মাথা উঁচু করে রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, উই রিভোল্ট—আমরা বিদ্রোহ করলাম। তখন তিনি চট্টগ্রামস্থ ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড। তার ব্যাটালিয়নের অধিনায়কসহ সকল পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাকে নিরস্ত্র ও বন্দি

www.pathagar.com

করলেন। নিজ ব্যাটালিয়নের কর্মকর্তা ও জোয়ানদের ডেকে সশস্ত্র সংগ্রামের ঘোষণা দিলেন। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে মাথা উঁচু করে রুখে দাঁড়াবার এই ছোট্ট ঘটনাটি তাৎক্ষণিকভাবে সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের সামরিক ভিত্তি রচনা করে দিল।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বেতারে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন— 'আমি মেজর জিয়া বলছি'...। সমগ্র জাতি ঘুরে দাঁড়াল একজন মেজর জিয়ার বেতার ঘোষণায়। ভীত সন্ত্রস্ত অসহায় অবস্থা থেকে মাথা উঁচু করে রুখে দাঁড়ানোর আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত হল দিকে দিকে। একটি আপাতঃ শান্তিপ্রিয় পলায়নপর জাতি আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার প্রস্তুতি নিতে থাকল। পরাক্রমশালী পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে মুখোমুখি হবার সাহস ছড়িয়ে দিলেন একজন মেজর জিয়া স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির মধ্যে। এই অসামান্য মহান স্বাধীনতা ঘোষণার দায়িত্বটি পালন করবার মধ্য দিয়ে একজন মেজর জিয়া তাৎক্ষণিকভাবে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিলেন।

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই অসামান্য মাথা উঁচু করা ঘোষণা কোনদিনই মুছে ফেলা যাবে না। কারণ এই মহান স্বাধীনতার ঘোষণা একজন মেজর জিয়ার কণ্ঠে ধ্বনিত হলেও তা ছিল সমগ্র জাতির আশা আকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি। তাই বেতারে বারকয়েক ধ্বনিত হওয়া মাত্র সমগ্র জাতির মুখে মুখে আকাশে বাতাসে এই ঘোষণা বারংবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। এ শুধু একজন বীর সিপাহসালারের মাথা উঁচু করা ঘোষণায় আর সীমাবদ্ধ রইল না বরং সমগ্র জাতির মাথা উঁচু করে প্রাণপণ লড়বার মূলমন্ত্রে পরিণত হল।

স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে মেজর জিয়া ক্ষান্ত হলেন না। সামরিকভাবে পরাক্রমশালী পাক বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য নিজ ব্যাটালিয়নসহ সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালি অফিসার ও জোয়ানদের সুসংগঠিত করতে লাগলেন। চট্টগ্রামসহ সারাদেশের সেনানিবাসগুলোতে অধিকাংশ বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ও জোয়ানরা পাক বাহিনীর নির্মম গণহত্যার শিকার হয়েছিল। তাই মেজর জিয়া বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট কর্মকর্তা ও জোয়ানদের নিয়েই সামরিক মোকাবেলা শুরু করলেও একই সঙ্গে মুক্তিপাগল ছাত্র, যুব, জনতা থেকে নতুন সৈনিক সংগ্রহ করে প্রশিক্ষণ দিয়ে দিয়ে মুক্তিবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই নিজ ব্যাটালিয়ন ও ইপিআর-এর সমন্বয়ে একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী গঠন করতে সক্ষম হন।

এই দুর্ধর্ষ বাহিনীই মুক্তিবাহিনীর প্রাথমিক রূপ হিসেবে স্বীকৃত যা ১৯৭১ সালের এপ্রিলের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত চট্টগ্রাম শহর ও আশপাশ নিজেদের দখলে রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা এই লেখায় দেব না। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি জাতি বীরদর্পে তথাকথিত পরাক্রমশালী পাক বাহিনীকে পরাজিত করে মাথা উঁচু করে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করতে সক্ষম হয়। একজন মেজর জিয়া

www.pathagar.com

সেই যে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে মাথা উঁচু করে বলেছিলেন—উই রিভোল্ট বা আমরা বিদ্রোহ করলাম, ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় বেতারে মাথা উঁচু করে মহান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন—আমি মেজর জিয়া বলছি, স্বপ্রণোদিত হয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে প্রতিরোধ সংগ্রামের সামরিক সূচনা করেছিলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলে তা কেবল তার নিজের এবং তার অধীনস্থ গুটি কয়েক সামরিক বাহিনীর সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং ছড়িয়ে পড়েছিল বিদ্যুৎ গতিতে সমগ্র জাতির শিরা-উপশিরায়। মাথা উঁচু করা নেতার নেতৃত্বের গুণে সমগ্র বাঙালি জাতি মাথা উঁচু করে ফেলল ঐক্যবদ্ধভাবে এবং প্রাণপণ লড়ে স্বাধীনতা অর্জন করে ফেলল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। বীরত্বের জন্য স্বাধীনতার পর তিনি পেলেন বীরউত্তম খেতাব আর জাতি পেল অমূল্য স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার পর জিয়াউর রহমান কুমিল্লায় একটি ব্রিগেডের দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করা হয় এবং পরবর্তীতে দুঃখজনক রক্তক্ষয়ী পট পরিবর্তন ঘটে আওয়ামী লীগেরই এক বড় অংশের নেপথ্য প্ররোচনায়। বাকশালী রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তারই দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তার মন্ত্রিসভায় যোগ দেন আওয়ামী লীগেরই সকল সিনিয়র নেতৃবৃন্দ।

১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট মেজর জেনারেল জিয়া সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন। নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে সেই বিশৃঙ্খল দিনগুলো কাটছিল নানামুখী অন্তর্দ্বন্দ্ব, উত্তেজনা এবং গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে। সরকার এবং সেনাবাহিনীতে চেইন অফ কমান্ড ভেঙে পড়ার পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করে দিয়ে ৩ নভেম্বর তৎকালীন চীফ অফ জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে জনসমর্থনহীন এক অভ্যুত্থান ঘটে। জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দী করা হয়।

সাধারণ সৈনিকদের কাছে ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। বরং তাদের মাঝে জেনারেল জিয়ার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল আকাশচুম্বী। নানামুখী ষড়যন্ত্র ও ঘাত প্রতিঘাতের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় ৭ নভেম্বর সাধারণ সিপাহীরা বিপ্লব সংঘটিত করে। গৃহান্তরীণ জেনারেল জিয়াকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে সিপাহী জনতার বিপ্লবের মহানায়কে পরিণত করে। চরম বিশৃঙ্খল পরিবেশে জেনারেল জিয়া সেনাবাহিনী, রাষ্ট্র ও সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুনরায় তিনি গুরুভার বহনের অঙ্গীকার করেন। ইতিহাসের আরেক সন্ধিক্ষণে পুনর্বার মাথা উঁচু করে দেশ ও জাতির পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

www.pathagar.com

পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন জনগণের ভালবাসায় সিক্ত হয়ে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশকে তিনি বিশ্বের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাবার ব্রত গ্রহণ করেন। একদলীয় বাকশাল অবসান করে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন ও দ্বিধাবিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করবার লক্ষ্যে যুগান্তকারী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন করেন। সেনাবাহিনীতে ও প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গণশিক্ষা কার্যক্রম ও জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চালু করা হয়। গণমাধ্যম ও বিচার বিভাগের ছিনিয়ে নেয়া স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেন তিনি। স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়বার লক্ষ্যে কৃষিকে আধুনিকায়ন, খাল খনন, কৃষি ঋণ বিতরণ, বন্ধ শিল্প কারখানা চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

এছাড়াও গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ, বিদেশে শ্রমিক রপ্তানি, গার্মেন্ট শিল্প চালু, গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প চালুসহ নানা উদ্ভাবনী ধারণা প্রয়োগ করে দেশকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি জিয়া। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা স্বল্প পরিসরে এই লেখায় দেয়া সম্ভব হবে না। তবে সংক্ষেপে এটুকু বলব যে, তার সকল প্রচেষ্টা এই সময়ে নিবেদিত ছিল নতজানু অবস্থা থেকে উত্তরণ করে প্রাণপ্রিয় দেশকে বুক চিতিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে।

যা কেবল কথায় নয় কাজের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এছাড়াও তিনি নতজানু একমুখী পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন করে ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি চালু করেন। জোট নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেও চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে আধুনিক বাংলাদেশের ভিত্তি রচিত হতে থাকে যার অনেকগুলো সুফল আজও আমরা আমাদের চারপাশে দেখতে পাই। দেশপ্রেমিক জিয়াউর রহমান সেই যে তরুণ বয়সে মাথা উঁচু করে চলা শুরু করেছিলেন তা রাষ্ট্রপতি হয়েও বজায় রাখতে পেরেছিলেন এমনকি তা নিজের দেশ ও দেশের জনগণের মাঝেও অনুরণিত করবার প্রয়াসে নিয়ত সচেষ্ট ছিলেন।

১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শাহাদাত বরণ করেন কতিপয় বিপথগামী কুচক্রীর হাতে। আজীবন মাথা উঁচু করে চলা জাতীয়তাবাদী এই মহান নেতা সেই দিন শারীরিকভাবে থেমে গেলেও তার বীরত্ব-মন্ত্রণা আজও আপামর জনসাধারণের মননে অনুরণিত হয় প্রতিদিন।

তার আদর্শ ও নীতির যে বীজ তিনি রোপণ করে গিয়েছিলেন বর্ণাঢ্য জীবনের নানা বাঁকে বাঁকে তা আজ ফুলে ফলে শোভিত হয়ে সারা বাংলাদেশকে বর্ণময় করে

www.pathagar.com

তুলছে। শারীরিকভাবে বিরাজ না করেও সর্বত্র মাথা উঁচু করে বিরাজ করতে পারার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? আজ ২৯ বছর পরেও যখন দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তখনও মনে হয় যেন একজন জিয়াউর রহমান মাথা উঁচু করে বেতারে মন্ত্রণাবাক্য পাঠ করে চলেছেন—বল বীর, বল চির উন্নত মম শির!

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আমার দেশ, নয়াদিগন্ত, দিনকাল, সংগ্রাম প্রভৃতি জাতীয় দৈনিকে বিএনপি কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে ছাপা হয়েছে ৭ নভেম্বর ২০১০ তারিখে

www.pathagar.com

একজন মেজরের স্বাধীনতা ঘোষণা

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শুরু থেকেই বাঙালি জাতি একটি মহাকাঙ্ক্ষিত ঘোষণার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। প্রাণের চেয়েও প্রিয় স্বাধীনতার ঘোষণা। তথাকথিত রাজনৈতিক কূটকৌশলের দোলাচলে সেই ঘোষণা তৎকালীন প্রধান রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দেয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। চলছিল একদিকে রাজপথের সংগ্রাম, ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন আর অন্যদিকে চলছিল নেপথ্যের সমঝোতা আলোচনা। তৎকালীন পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ঢাকায় তৎকালীন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের দফায় দফায় আলোচনা চলে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পরও শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির প্রাণের দাবি হয়ে ওঠা স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে বরং ২৭ মার্চ হরতাল আহ্বান করেন। হঠাৎ করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগের পরপর ২৫ মার্চ কাল রাতে পাক হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট নামে ঢাকা শহরের নিরস্ত্র ঘুমন্ত মানুষের ওপর চালায় এক নির্মম গণহত্যাযজ্ঞ। সেই রাতেই শেখ মুজিবুর রহমান তার নেতাকর্মীদের আত্মগোপনের নির্দেশ দিয়ে নিজে গ্রেফতার বরণ করেন পাকিস্তানীদের হাতে।

মেজর জিয়াউর রহমান তখন চট্টগ্রামের ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২৫ মার্চ গভীর রাতে তার পাক কমান্ডিং অফিসার তাকে চট্টগ্রাম বন্দরে রিপোর্ট করতে পাঠান। পথে আগ্রাবাদে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থামলেন মেজর জিয়া। বাঙালি মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরীর কাছ থেকে তিনি জানতে পেলেন যে পাকবাহিনী অপারেশন সার্চলাইট নামে ঢাকা শহরে নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যেই মেজর জিয়া রুখে দাঁড়ালেন এবং বললেন, উই রিভোল্ট অর্থাৎ আমরা বিদ্রোহ করলাম। তৎক্ষণাৎ মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরীকে ষোলশহর বাজারে গিয়ে পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন এবং নিজে তার সঙ্গে আসা ট্রাকের সব পাক সেনা কর্মকর্তা ও সদস্যদের গ্রেফতার করলেন। ত্বরিত গতিতে সেখান থেকে ফেরত গিয়ে তার কমান্ডিং অফিসার কর্নেল জানজুয়াকেও গ্রেফতার করলেন।

অতঃপর নিজ ব্যাটালিয়নের কর্মকর্তা সৈনিকদের ডেকে সাময়িকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান

www.pathagar.com

জানান। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিবাহিনীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় সেইদিন সেইক্ষণে মেজর জিয়ার হাতেই।

মুক্তিবাহিনী গঠিত হল মেজর জিয়ার নেতৃত্বে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ক্ষুদ্রপরিসরে চট্টগ্রামে। এবার এটা আনুষ্ঠানিভাবে ঘোষণা করে সমগ্র জাতিকে এবং বিশ্ববাসীকে জানানো ও জাগানো প্রয়োজন। পরদিনই ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বহুকাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। মেজর জিয়ার সেই প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটিতে তিনি নিজেকে হেড অফ দ্য স্টেট বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বর্ণনা করে স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে বলে জানান দেন।

ভারতীয় সেনা বাহিনীর হালনাগাদ অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা শিরোনামের অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে "... Yahya Khan left Dacca abruptly on 25 March 1971 and Tikka Khan left loose his night of terror the same night. The next day, while the whereabouts of Mujib remained unknown, Major Ziaur Rahman announced the formation of the Provisional Government of Bangladesh over Radio Chittagong".

অর্থাৎ 'ইয়াহিয়া খান হঠাৎ করেই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেন এবং টিক্কা খান সেই রাতেই তার সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। পরদিনই যখন মুজিবের খোঁজ অজানা তখন মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বেতার থেকে অন্তর্বর্তী বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা দেন।' এভাবেই একজন মেজর জিয়া বাঙালির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর হালনাগাদ ওয়েবসাইটটিতে উপরোক্ত স্বীকৃতির পাশাপাশি মেজর জিয়াউর রহমানের একটি ছবিও দেয়া রয়েছে।

২৭ মার্চ, ১৯৭১। মেজর জিয়া তার আগের দিন কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণাটি আরও ব্যাপকভিত্তিক ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে সংশোধন করে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে নতুন করে মুসাবিদা করেন এবং পুনরায় ঘোষণা দেন ... ইংরেজিতে ... I, major Ziaur Rahman, Provisional Commander In Chief of the Bangladesh Liberation Army, do here-by proclaim, on behalf of our great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Independence of Bangladesh..."

বাংলায় ঘোষণা দেন... "প্রিয় দেশবাসী, আমি মেজর জিয়া বলছি। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আপনারা দুশমনদের প্রতিহত করুন। দলে দলে এসে যোগ দিন স্বাধীনতা যুদ্ধে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ বিশ্বের সব স্বাধীনতাপ্রিয় দেশের উদ্দেশে আমাদের আহ্বান,

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের ন্যায়যুদ্ধে সমর্থন দিন এবং স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন। ইনশাআল্লাহ, বিজয় আমাদের অবধারিত।"

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ সংশোধিত আকারে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করার সিদ্ধান্ত যে সুবিবেচনাপ্রসূত ও অধিক ফলপ্রসূ হয়েছিল তা ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়। সে সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নাম যোগ করে তার অনুপস্থিতিতে তার পক্ষে দায়িত্ব নিয়ে একজন সেনাবাহিনীর মেজর স্বাধীনতা ঘোষণা করে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে—তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল খুবই ইতিবাচক। যখন সশস্ত্র পাকবাহিনী গণহত্যা চালাচ্ছে সামরিক কায়দায় তার বিপরীতে একজন সামরিক বাহিনীর মেজর সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দিচ্ছে তা ভীতসন্ত্রস্ত পলায়নপর বাঙালির মনে সাহসের সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। তাদেরকে রুখে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করে তোলে। মরতে হলে লড়াই করে মরব অথবা মরণপণ লড়াই করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনব এমনতর আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল।

২৭ মার্চ প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাটি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বিরতি দিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পর পর প্রচারিত হয়েছিল। তাই তা ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণ তা শুনতে পেরে আশ্বস্ত হয়। সবার মধ্যে এই আস্থার সৃষ্টি করে যে, দীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলনের পর সশস্ত্র সংগ্রামের অধ্যায় শুরু হয়েছে। আর এতে বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা ও সৈনিকরা এরই মধ্যে যোগ দিয়েছেন, যা আশার আলো জাগায় সেই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে। সেনাবাহিনী, ইপিআর ও পুলিশে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তা ও জওয়ানরা স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে দলে দলে। আন্তর্জাতিকভাবেও এ ঘোষণাটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ২৯ মার্চ ব্রিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকার প্রতিবেদনে মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা স্থান পায়।

পরবর্তীতে গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদও ১১ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে তার বক্তৃতায় তুলে ধরেন, মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি এভাবে... "এর ফলে সর্বপ্রথম মেজর জিয়াউর রহমান ঘোষিত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার একটি পূর্ণাঙ্গ সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে এবং সেখান থেকেই মুক্ত এলাকাগুলো শাসিত হচ্ছে।" মুক্তিযুদ্ধে স্বতন্ত্র শৌর্যবীর্যের জন্য খ্যাত কাদেরিয়া বাহিনীর অধিনায়ক বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তমও সম্প্রতি বলেছেন, "...তার ঘোষণা শুনে আমি নিজেও উৎসাহিত হয়েছি। গোটা জাতি উৎসাহিত হয়েছে।" ১৯৭৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি বলেন, "Your position is already assured in the annals of the history of your country as a brave fighter who was the first to declare the independence of Bangladesh..." অর্থাৎ

www.pathagar.com

"...আপনার স্থান আপনার দেশের ইতিহাসে গ্রন্থিত রয়েছে একজন সাহসী যোদ্ধা হিসেবে, যিনি প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন...।"

মেজর জিয়াউর রহমান শুধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি তার ব্যাটালিয়নকে নিয়ে মুক্তিবাহিনীর গোড়াপত্তন করেন এবং সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেন। সামগ্রিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত মেজর জিয়াউর রহমানই ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনানায়ক। সামরিক দিক থেকে মহাপরাক্রমশালী পাকবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য নিজ ব্যাটালিয়ন ছাড়াও সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিকদের জড় করতে সচেষ্ট হন তিনি। চট্টগ্রামসহ সারাদেশের সেনানিবাসগুলোয় অধিকাংশ বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিক নির্মম গণহত্যার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

তাই মেজর জিয়া উপলব্ধি করলেন যে প্রথমত, অবশিষ্ট বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিকদের সংগঠিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মুক্তিপাগল ছাত্র জনতা, যুব-শ্রমিক-কৃষকদের মধ্য থেকে নতুন সৈনিক সংগ্রহ করতে হবে শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য। এই দুই উপায়েই তিনি নিজ বাহিনী গঠন-পুনর্গঠন চালিয়ে যেতে যেতে ১৯৭১ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই নিজ ব্যাটালিয়ন ও ইপিআর সমন্বয়ে একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী দাঁড় করাতে সক্ষম হন। ঐতিহাসিক সমরবিদেরা এই দুর্ধর্ষ বাহিনীকেই মুক্তিবাহিনীর প্রাথমিক আনুষ্ঠানিক রূপ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যারা ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত চট্টগ্রাম শহর ও আশপাশের এলাকা নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৭ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম অঞ্চলের সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালের ৭ জুলাই স্বাধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেড জেড ফোর্স সংগঠিত করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় মেজর জিয়ার ওপর। প্রাথমিকভাবে এর অবস্থান হয় ভারতের মেঘালয় প্রদেশের তুরা নামক জঙ্গলে। এই ব্রিগেডের অধীনে দেয়া হয় ১ম বেঙ্গল, ৩য় বেঙ্গল, ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলো; একটি গোলন্দাজ ব্যাটারি আর ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যাল ও সাপ্লাই কোরের কিছু সদস্যকে। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও রংপুর জেলার বিভিন্ন রণক্ষেত্রে জেড ফোর্স ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। ১৯৭১ সালের ১২ অক্টোবর জেড ফোর্সকে স্থানান্তর করে বৃহত্তর সিলেট জেলার অংশবিশেষে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। সিলেটেও জেড ফোর্স ব্যাপক সাফল্য লাভ করে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে। ১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর জেড ফোর্স সিলেট শহর ও জেলা শত্রুমুক্ত করে মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে অসম বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য মেজর জিয়াউর রহমান বীর-উত্তম খেতাব লাভ করেন।

www.pathagar.com

যুদ্ধ তো অনেকেই করেছেন। সামরিক বাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সৈনিক ও সেনা কর্মকর্তারা যেমন করেছেন, তেমনি আপামর বাঙালি ছাত্রজনতা, যুব শ্রমিক, কৃষক এমনকি মা-বোনেরাও সর্বব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের শেষে বাংলাদেশের বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন বহু ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে। আজ স্বাধীনতা যুদ্ধের ৪০ বছর পরও যে একজন মেজর জিয়ার নাম স্বাধীন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়, তার অন্যতম প্রধান কারণ হল সেই অনন্য স্বাধীনতার ঘোষণা। সেই ঘোষণা শোনার জন্য স্বাধীনতাকামী বাঙালি উন্মুখ হয়েছিল। যত দিন বাংলাদেশ বেঁচে থাকবে, টিকে থাকবে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব, তত দিন বাজবে একজন মেজর জিয়ার অনন্য সেই ঘোষণা... 'আমি মেজর জিয়া বলছি। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ঘোষণা করছি...।'

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আমার দেশ, নয়াদিগন্ত, দিনকাল, সংগ্রাম প্রভৃতি জাতীয় দৈনিকে বিএনপি কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে ছাপা হয়েছে ২৬ মার্চ ২০১১ তারিখে

www.pathagar.com

শহীদ জিয়ার বিপ্লবী চরিত্র

বিপ্লবী মানে কি? ইন্টারনেটের তথ্যভাণ্ডার উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত সংজ্ঞা অনুসারে বিপ্লবী হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি সক্রিয়ভাবে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন কিংবা বিপ্লবের পক্ষে ওকালতি করেন। আর বিপ্লব মানে হল এমন এক ঘটনা বা প্রক্রিয়া, যা সমাজের বা রাষ্ট্রের বা অন্য কোন মানবিক বিষয়-আশয়ের ওপর বৃহত্তর পরিসরে আকস্মিক, উল্লেখযোগ্য, টেকসই এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে।

সাধারণত বিপ্লবী আর বিপ্লব শব্দ দুটোই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কখনো-সখনো বিজ্ঞান, আবিষ্কার, শিল্পকলা, সমাজসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বিশাল কোন প্রভাবের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে শব্দ দুটোর ব্যবহার হয়ে থাকে। সঙ্গত কারণেই আজকের আলোচনা কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিপ্লবীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখা শ্রেয়। রাজনীতিতে একজন বিপ্লবী তাকেই বলা হয়, যিনি দ্রুতগতির, তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হতে যাওয়া, খোল-নলচে পাল্টে দেয়া ধরনের আমূল কোন পরিবর্তনকে সমর্থন করেন এবং সেই ইতিবাচক প্রকৃতির পরিবর্তন আনয়নে সক্রিয় অবদান রাখেন।

এর বিপরীতে একজন সংস্কারক হলেন তিনি, যিনি পরিকল্পনামাফিক, তুলনামূলকভাবে ধীরগতির, বিদ্যমান কাঠামো না ভাঙা ধরনের কোন পরিবর্তনকে সমর্থন করেন। আর রক্ষণশীল হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি কোন ধরনের পরিবর্তনকেই স্বাগত জানান না। সবশেষে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি হলেন তিনি, যিনি ইতিবাচক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার পরেও পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে চান।

সমাজবিজ্ঞানী জেমস সি ডেভিস-এর মতে, রাজনৈতিক বিপ্লবীরা মোটামুটি দু'ভাবে শ্রেণীবিন্যাসিত বা চিত্রিত হতে পারেন। প্রথমত, তাদের আদর্শ বা উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাস; যেমন উদারবাদী বিপ্লবী, রিপাবলিকান বিপ্লবী, গণতন্ত্রী বিপ্লবী, জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী, সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী, সাম্যবাদী বিপ্লবী, ফ্যাসিস্ট বিপ্লবী, নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, তাদের কাজের ধরনের ওপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাস; যেমন সহিংস বিপ্লবী, শান্তিবাদী বিপ্লবী কিংবা অহিংস বিপ্লবী প্রভৃতি। বিপ্লব ও বিপ্লবীর তাত্ত্বিক সংজ্ঞা বা ধারণাগত আলোচনা করা হল। এবার উপরোক্ত ধারণাগুলোর আলোকে শহীদ জিয়ার কর্মকাণ্ড ও চরিত্রে বিপ্লবী উপাদান খোঁজার চেষ্টা করা যাক পরের অনুচ্ছেদগুলোতে।

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমানের জীবনে প্রথম বিপ্লবী চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে। সেই রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর নির্বিচার গণহত্যা চালায়। তিনি তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন বাঙালি মেজর, যিনি অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসেবে চট্টগ্রামে কর্মরত। সে সময়ের প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ করেছেন আর অন্যসব আওয়ামী শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ভারতে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে সীমান্তের পথে পলায়মান। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ নিরস্ত্র বাঙালি জাতি তখন নেতৃত্বহীনতায় দিশাহীন অবস্থায় প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক ছুটছে। বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালি সৈনিক-পুলিশ-ইপিআর-সেনাকর্মকর্তা হত্যা ও নির্বিচার গণহত্যার খবর পেয়ে এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে মেজর জিয়া সেই ২৫ মার্চ কালরাত্রিতেই এক মহান বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। বলে ওঠেন—'উই রিভোল্ট' অর্থাৎ 'আমরা বিদ্রোহ করলাম'।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহিংসতার বিপরীতে মেজর জিয়ার এই বিদ্রোহ ঘোষণার সিদ্ধান্তটি ছিল তাৎক্ষণিক। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের খোল-নলচে পাল্টে দেয়ার মত সুদূরপ্রসারী এক অনন্য সিদ্ধান্ত ছিল সেটি।

সেদিন রাতেই তিনি তার রেজিমেন্টের কমান্ডারকে বন্দি করে নিজ রেজিমেন্ট নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সূচনা ঘটে যায় সেই রাতেই তার নেতৃত্বে। পরদিন তিনি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মহান স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণ করেন—'আমি মেজর জিয়া বলছি..., আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি...।' ২৫ মার্চ রাতের সামরিক বিদ্রোহটি পরদিন স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পরিণতি লাভ করে এবং ফলস্বরূপ তা এক সার্থক বিপ্লবে রূপ নেয়। পাকিস্তান নামক ২৪ বছর বয়সী রাষ্ট্রটির মানচিত্র বদলে যায় নিমিষে, বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙেচুরে বাংলাদেশ নামক নতুন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। আকস্মিকতা, দ্রুততা এবং পরিবর্তনের ব্যাপকতায় এই ঘটনা পরম্পরাকে বিপ্লব বলে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। আর এই বিপ্লবে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে বিপ্লবী বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

মেজর জিয়ার সেনা কর্মকর্তা থেকে বিপ্লবী হয়ে ওঠার এই সময়টুকু নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রথমত তিনি ছিলেন অসমসাহসী এক বীর। দ্বিতীয়ত ছিলেন ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। তাই ২৫ মার্চ রাতেই তাৎক্ষণিক বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তৃতীয়ত ছিলেন অনন্য দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবেসে নিজের ও নিজের পরিবারকে ঘোর বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে তাই বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। প্রকৃতপক্ষে এসবই তো একজন আদর্শ বিপ্লবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিপ্লবী মিখাইল বাকুনিন-এর মতে, 'The revolutionary is a doomed man. He has no private interests, no affairs, sentiments, ties, property, nor even a name of his own. His entire being is devoured by one purpose, one thought, one passion – the revolution. Heart and soul, not merely by word but by deed, he has severed every link with the social order and with the entire civilized world; with the laws, good manners, conventions and morality of that world. He is its merciless enemy...' অর্থাৎ 'বিপ্লবী হলেন একজন বিচ্ছিন্ন মানুষ। তার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই, বিষয় নেই, আবেগ, সম্পর্ক, সম্পদ নেই; এমনকি নিজের কোন নামও নেই। তার সমগ্র সত্তা উৎসর্গকৃত হল একটাই লক্ষ্যে, একটাই চিন্তায়, একটাই নেশায়—তা হল বিপ্লব। হৃদয়ে এবং মননে, শুধু কথায় নয়, কাজেও। তিনি সামাজিক কাঠামো এবং সমগ্র সভ্য জগতের সঙ্গে; সেই জগতের সকল আইন, সদাচরণ, রীতিনীতি এবং নৈতিকতার সঙ্গে যে কোন ধরনের সংযোগকে বিপর্যস্ত করেছেন। তিনি এসব কিছুর এক নির্দয় শত্রু...'।

জিয়াউর রহমানের মধ্যে আমরা মিখাইল বাকুনিন বর্ণিত বিপ্লবী চরিত্রের সঙ্গে কি কি মিল খুঁজে পাই দেখা যাক। মেজর জিয়া ২৫ মার্চ রাতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে একজন বিচ্ছিন্ন মানুষে পরিণত হলেন। আর তা করতে গিয়ে তার নিজের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ রইল না, বিষয় রইল না, পরিবার ত্যাগ করে যুদ্ধযাত্রার মাধ্যমে নিজের আবেগ, সম্পর্ক, সম্পদ পরিত্যাগ করলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে নিজের নিরাপদ চাকরি, পদবি বা নামটিও হারালেন। শুধু কথায় নয় কাজেও, বিদ্রোহ ঘোষণার মাধ্যমে শৃঙ্খলাবদ্ধ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাঠামো থেকে বেরিয়ে এলেন; ছিন্ন করলেন এতদিনকার পেশাগত সম্পর্ক, তাদের রীতিনীতি, সদাচরণ, তৎকালীন বিদ্যমান আইন—সবকিছুকে উপেক্ষা করলেন। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণ করে তিনি হয়ে উঠলেন পাকিস্তানি বাহিনীর তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধানতম শত্রু।

জনপ্রিয়তম বিপ্লবী চে গুয়েভারা আদর্শ বিপ্লবীকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, '...the true revolutionary is guided by a great feeling of love... We must strive every day so that this love of living humanity will be transformed into actual deeds, into acts that serve as examples, as a moving force...' অর্থাৎ '...সত্যিকারের বিপ্লবী নির্দেশিত হয় এক অনন্য ভালোবাসার অনুভূতি দ্বারা...। আমাদের প্রতিদিন চেষ্টা করতে হবে যেন জাগ্রত মানবতার প্রতি এই ভালোবাসা প্রকৃত অর্থেই কাজে রূপান্তরিত হয়, এমন ধরনের কাজ, যা সামনে এগিয়ে যাবার শক্তি হিসেবে উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে।...' মেজর জিয়া ২৫ মার্চ রাতে তার দেশের ও দেশের নিপীড়িত জনগণের প্রতি গভীর

www.pathagar.com

ভালোবাসার অনুভূতি দ্বারা চালিত বা নির্দেশিত হয়েছিলেন। নিজ জাতির নিপীড়িত মানবতার প্রতি জেগে ওঠা সহানুভূতিকে তিনি কাজে রূপান্তরিত করেছিলেন সেই রাতেই সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তার সূচিত বিদ্রোহ মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সূচনার ভিত রচনা করে দিয়েছিল।

স্বাধীনতা অর্জনের পরে বিপ্লবী জিয়াউর রহমান ব্যারাকে ফিরে যান। সদ্য স্বাধীন দেশের নবগঠিত সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে সংঘটিত দুঃখজনক হত্যাযজ্ঞে তৎকালীন বাকশালী রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে বাকশালের অধীনে বিলুপ্ত আওয়ামী লীগেরই একটি অংশ খন্দকার মুশতাক আহমদের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে। দেশে এক ভয়াবহ অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীতে নির্দেশসূত্র বা চেইন অফ কমান্ড সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। একদিকে শেখ মুজিব হত্যাকারী মাঝারি পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তাগণ বঙ্গভবনে অবস্থান নিয়ে খন্দকার মুশতাককে সামনে রেখে দেশ শাসন করতে থাকে।

অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের আরেকটি অংশ চেইন অফ কমান্ড ফিরিয়ে আনার নামে ঢাকা সেনানিবাসে সংগঠিত হতে থাকে। এই দুই পক্ষের হুমকি-পাল্টা হুমকিতে সৃষ্ট ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝে কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে কর্মকর্তাবিহীন সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠার দাবিতে সিপাহীদের স্লোগানমুখর উচ্ছৃঙ্খলতা চলতে থাকে। সব মিলিয়ে ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সারাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটে। অবশেষে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর তারিখে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। বঙ্গভবনে অবস্থানকারী শেখ মুজিব হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তাদেরকে আপস-মীমাংসার অধীনে দেশত্যাগ করার সুযোগ করে দেন খালেদ মোশাররফ। অপরদিকে নিজেই চেইন অফ কমান্ড ভেঙে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দি করেন।

পেশাগত নিষ্ঠা ও সততার জন্য সেনাবাহিনীতে সাধারণ সিপাহীদের মাঝে আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান করার বিষয়টি যেমন সাধারণ সিপাহীদের কাছে কোন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, তেমনি তার ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারে জনগণের সমর্থনও ছিল শূন্যের কোঠায়। ফলে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর তারিখে অভূতপূর্ব এক সিপাহী-জনতার বিপ্লব সংঘটিত হয়।

বিপন্ন স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়া সিপাহী-জনতার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিপ্লব সংঘটিত করার বিষয়টি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। গৃহবন্দি অবস্থা থেকে জিয়াউর রহমান সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্ত হন এবং তার কাঁধেই পরম নির্ভরতায় বিরাজমান বিশৃঙ্খল

www.pathagar.com

পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের দায়িত্ব অর্পণ করে বিপ্লবী সিপাহী-জনতা। লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, ৭ নভেম্বর তারিখে প্রচলিত অর্থে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে কোন অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়নি বরং স্বতঃস্ফূর্ত এক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। গৃহবন্দি থাকার কারণে জেনারেল জিয়াউর রহমান এই বিপ্লবে কোনরকম প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখার সুযোগ পাননি। অথচ গৃহবন্দি জিয়াকে মুক্ত করে তার হাতে বিশৃঙ্খলা অবসান করে দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব অর্পণ করার লক্ষ্যে সিপাহী-জনতা স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব সংঘটিত করে ফেলে।

সিপাহী-জনতার বিপ্লবে তাই তাকে পরোক্ষ মহানায়ক বলা যেতে পারে। বিপ্লবী সিপাহী-জনতা তার নামে এবং তাকে উপলক্ষ করেই সেই মহান বিপ্লব সংঘটিত করেছিল। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমানের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে তথা নেতৃত্বে এই সিপাহী-জনতার বিপ্লবটি প্রলম্বিত হয়েছিল বা অন্য অর্থে দীর্ঘমেয়াদি আরেকটি বিপ্লব সূচিত হয়েছিল, যা ১৯৮১ সালের ৩০ মে তারিখে তার শাহাদাৎ বরণের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

বিপ্লবী সিপাহী-জনতার কাছ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্তির পর পর জিয়াউর রহমানের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় বিরাজমান বিশৃঙ্খলা অবসান করে সেনাবাহিনীতে এবং দেশের প্রশাসন কাঠামোতে কাঙ্ক্ষিত শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। বিপ্লবোত্তর সময়ে এই কাজটি করা মোটেই সহজ ছিল না। স্বতঃস্ফূর্ত সিপাহী-জনতার বিপ্লবকে রক্ষা করতে প্রতিনিয়ত প্রতিক্রিয়াশীলদের হুমকি মোকাবিলা করতে হয়েছে তাকে। তিনি কুশলতার সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলদের কবল থেকে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনকে মুক্ত করে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন, বিপ্লবকে সুসংহত করেছেন এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষা দিয়েছেন।

আর এর পরের ধাপে তার দেশ গঠনমূলক বিপুল কর্মযজ্ঞকে অভিনবত্ব, ইতিবাচক পরিবর্তনের ব্যাপকতা এবং সুদূরপ্রসারী ভূমিক.র বিবেচনায় শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। বাকশালের অধীনে সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করার ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যতার অবসান করে তিনি দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করেন। বাকশালের অধীনে বিলুপ্ত হওয়া সব সংবাদপত্রকে পুনরায় প্রকাশের অনুমতি দিয়ে তিনি অবাধ বাকস্বাধীনতা সুনিশ্চিত করেন। দেশের অর্থনীতিকে সচল করার লক্ষ্যে নানা ধরনের উদ্ভাবনী ধারণার প্রয়োগ ঘটান তিনি এবং নিজে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন তাতে।

এমনকি সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করেন একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে। উদাহরণস্বরূপ কৃষিতে সেচের সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক খালকাটা কর্মসূচি চালু করেন, যা সারাদেশে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয় এবং খাদ্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সর্বপ্রথম তিনিই বিদেশে জনশক্তি রফতানি শুরু করেন এবং গভীর সমুদ্রে মাছ শিকার চালু করেন। রফতানিমুখী গার্মেন্ট শিল্প

www.pathagar.com

পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেন, যা দেশের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি রচনা করে দেয় পরবর্তীতে। গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পকে সর্বাত্মক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। কারণ তা গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুঁজির সরবরাহ বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখবে বলে তিনি ধারণা করেছিলেন। সারাদেশে গণশিক্ষা কর্মসূচি চালু করেন এবং গ্রামপ্রতিরক্ষাবাহিনী গঠন করে তৃণমূলে বিপুল জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করেন। একমুখী বিচ্ছিন্ন পররাষ্ট্রনীতির অবসান করে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরবসহ বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে সমমর্যাদার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করে এক ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির সূচনা করেন।

এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অভূতপূর্ব সব কর্মকাণ্ড তার নেতৃত্বে ঘটে গিয়েছিল বেশ দ্রুতগতিতেই, যা জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পেরেছিল। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সময়কালের মধ্যে তার পরিচালিত বিপুল কর্মযজ্ঞকে রাষ্ট্রীয় সংস্কার, নাকি শান্তিপূর্ণ বিপ্লব, নাকি বিপ্লব ও সংস্কারের এক যথাযথ মিশেল বলে অভিহিত করা হবে, সে বিষয়ে মনোজ্ঞ তাত্ত্বিক বিতর্ক চলতেই পারে এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আরও গভীরতর বিশ্লেষণও করা যেতে পারে। এই গুরুদায়িত্ব রইল বিজ্ঞ রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ওপর।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আমার দেশ, যুগান্তর, নয়াদিগন্ত, দিনকাল, সংগ্রাম প্রভৃতি জাতীয় দৈনিকে বিএনপি কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে ছাপা হয়েছে ৬ নভেম্বর ২০১১ তারিখে

www.pathagar.com

মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ জিয়া

মানুষ মরণশীল। তারপরেও কিছু কিছু ক্ষণজন্মা ব্যক্তি মৃত্যুকে জয় করে অমরত্ব অর্জন করতে সক্ষম হন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তেমনই একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব যিনি তার আদর্শ ও কর্মময় জীবনকে প্রসারিত করতে পেরেছেন জৈবিক মৃত্যুকে অতিক্রম করে। স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেননি তিনি নানা সময়ে দেশের প্রয়োজনে ঝুঁকি নেয়ার কারণে। এমনকি স্বাভাবিক মৃত্যুও হয়নি তার। নিঃশর্ত দেশপ্রেমের মূল্য দিতে হয়েছে শাহাদাত বরণ করে। আজ তার ৩০তম শাহাদাতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তাকে স্মরণ করছি।

বীরের জীবনই বেছে নিয়েছিলেন তিনি। তরুণ বয়সেই তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন ক্যাডেট অফিসার হিসেবে। নিজের পেশাদারিত্ব, মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছিলেন চৌকস সেনা কর্মকর্তা হিসেবে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে তার নেতৃত্বাধীন কোম্পানি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বীরত্বের খেতাব অর্জন করে।

বীরত্বের তকমা লাগানো সেই তরুণ সিপাহসালার যুবক বয়সে ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে পুনরায় ১৯৭১ সালে বীরদর্পে এগিয়ে আসেন। প্রবল জাত্যাভিমানী তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর জিয়া বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণ করেন। সে সময়ের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতার বরণ ও সামনের সারির অন্যান্য নেতার আত্মগোপনের প্রেক্ষাপটে দিকনির্দেশনাহীন বাঙালি জাতির সামনে তার উচ্চারিত বলিষ্ঠ স্বাধীনতার ঘোষণা সীমাহীন অন্ধকারে আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হয়।

তিনি চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় ২৫ মার্চ কালরাতে নির্বিচার বাঙালি নিধন ও গণহত্যার খবর শুনে তাৎক্ষণিকভাবে রুখে দাঁড়ান। নিজের উর্ধ্বতন পাক কমান্ডারকে গ্রেফতার করে নিজ রেজিমেন্ট নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সূচনা করেন। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণ করেন ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে প্রথমবার এবং পরে সংশোধিত আকারে ২৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখে। ইতিহাসের বাঁক ফেরানো এমন বিপজ্জনক মুহূর্তে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে নিজ পেশা, জীবন ও পরিবারকে বিপন্ন করে এই বীর এগিয়ে গিয়ে তৎকালীন পাকিস্তান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নানামুখী গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে তার সংস্কার বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করতে সক্ষম হয়। ছোট-বড় সব দল আইনি কাঠামোর আওতায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ আদর্শ ও মত প্রচার করার অধিকার লাভ করে যা একদলীয় বাকশালের আওতায় রহিত করা হয়েছিল। বন্ধ করে দেয়া সব সংবাদপত্রকে পুনরায় প্রকাশের অনুমতি দিয়ে স্বাধীনভাবে যে কোন মতের সংবাদপত্র প্রকাশের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করে দেন তিনি।

আর দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রেস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন। সাংবাদিকদের মিলনস্থল জাতীয় প্রেস ক্লাবের আজকের ভবনটির জমি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরসহ ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি অনুদানও প্রদান করেন শহীদ জিয়া। দেশের গুণী-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের খুঁজে খুঁজে এনে তার মন্ত্রিসভা ও দলে স্থান করে দেন। দেশের প্রয়োজনে ব্যক্তি উদ্যোগকে উপর থেকে তৃণমূল পর্যন্ত উৎসাহিত করতে থাকেন। আজকের নোবেলজয়ী গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ক্ষুদ্রঋণের ধারণা শুনে দেশের ভয়াবহ দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকারী ভূমিকা রাখতে তিনি এই ধারণাকে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন।

তারই পৃষ্ঠপোষকতার ধারাবাহিকতায় গ্রামীণ ব্যাংক তার পরীক্ষামূলক পর্যায় পার হয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত মহীরুহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল মেরুদণ্ড গার্মেন্ট শিল্পও শহীদ জিয়ার আমলেই তার আগ্রহের কারণে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়ে আজ এক বিশাল শিল্পে পরিণত হয়েছে। আমাদের অর্থনীতির আরেকটি স্তম্ভ বিদেশে জনশক্তি রফতানির ধারণাও শহীদ জিয়ার উদ্যোগেই শুরু হয়েছিল যা আজ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে। গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের ধারণাও তার আমলে চালু করা হয় যা আজ দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচকার্য বছরব্যাপী চালু রাখতে তিনি সারাদেশে খালকাটা কর্মসূচি চালু করেন যেখানে তিনি নিজে সামনে থেকে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে অংশ নিতেন।

এই খালকাটা কর্মসূচি সারাদেশে তার জনসম্পৃক্ততা বাড়িয়ে দেয়, কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে দেন তিনি এবং গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার লক্ষ্যে তিনি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি প্রচলন করেন। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে শহীদ জিয়ার সাফল্য আকাশচুম্বী। একমুখী পররাষ্ট্রনীতির অবসান করে তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে 'প্রভু নয় বন্ধু চাই' নীতির আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রগুলো, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনভুক্ত দেশগুলো, চীন ও

www.pathagar.com

পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটান। তার আমলেই বাংলাদেশ একটি ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি প্রচলন করতে সক্ষম হয় তার ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগে। শিশু ও মহিলাদের উন্নয়নে তিনিই প্রথম মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করেন, শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে জনপ্রিয়তম শিশু প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা 'নতুন কুঁড়ি' চালু করেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্পকারখানা চালু করার পাশাপাশি নতুন কল-কারখানা ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপনার ব্যবস্থা করেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ যাকে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বা 'বটমলেস বাস্কেট' বলে অভিহিত করেছিলেন সেই বাংলাদেশকে একটি আধুনিক আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্মানজনক অবস্থানে উন্নীত করার জন্য নিঃশর্ত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। তার বুনে যাওয়া অনেক বীজ থেকে চারা অঙ্কুরিত হয়ে অনেকগুলোই আজ পত্রপল্লবে, ফুলে-ফলে শোভিত হয়ে শোভা ও সুবাস ছড়াচ্ছে। বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রটির আজ তুলনামূলক স্থিতিশীল যে ভিত্তি রচিত হয়েছে, তার সিংহভাগ কৃতিত্ব যে শহীদ জিয়ার তা আর কারোর অবদানকে খাটো না করেও বলে দেয়া যায় নিঃসংকোচে।

শহীদ জিয়া একদিন এই বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বেড়ে উঠেছিলেন, দেশের তরে যখন প্রয়োজন লড়াই করে গেছেন, দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়ে দেশটিকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবদান রেখে গেছেন এবং দেশপ্রেমে কোনোরকম আপস না করায় কুচক্রিদের নোংরা ষড়যন্ত্রে বীরদর্পে শাহাদাত বরণ করেছেন চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে ১৯৮১ সালের ৩০ মে তারিখে। জৈবিক মৃত্যু তাকে দৈহিকভাবে অনুপস্থিত রাখলেও তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে বিরাজমান আছেন বাংলাদেশের মাঠেঘাটে, শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে সর্বোপরি আপামর গণমানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায়। তার বীরত্ব, তার আদর্শ, তার জীবনাচরণ, তার কর্মময় জীবন কিংবদন্তি হয়ে জাগরূক আছে এবং থাকবে—এ বিষয়ে সংশয়ের কোনই অবকাশ নেই।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৩০তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আমার দেশ, যুগান্তর, নয়াদিগন্ত, দিনকাল, সংগ্রাম প্রভৃতি জাতীয় দৈনিকে বিএনপি কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে ছাপা হয়েছে ৩০ মে ২০১১ তারিখে

www.pathagar.com

জন্মবার্ষিকীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

মৃত্যুর ৩০ বছর পরেও জন্মবার্ষিকী পালিত হয়—এই পৃথিবীতে এমন লোকের সংখ্যা হাতে গোনা সম্ভব। আজ ১৯ জানুয়ারি। মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে তার প্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশে। ৭৫তম জন্মবার্ষিকীতে এই ক্ষণজন্মা মহানায়কের বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্য আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি বগুড়া জেলার বাগবাড়ী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন জিয়াউর রহমান। পিতা মুহম্মদ মনসুর রহমান একজন পেশাদার রসায়নবিদ হিসেবে সরকারি আলীপুর টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে কর্মরত ছিলেন। মা জাহানারা খাতুন ছিলেন একজন আদর্শ গৃহবধূ মাতা। মনসুর রহমান ও জাহানারা খাতুনের পাঁচ পুত্রসন্তানের মধ্যে জিয়াউর রহমান ছিলেন দ্বিতীয়। চার বছর বয়সে শিশু জিয়াউর রহমান কলকাতার পার্ক সার্কাসের এক পাঠশালায় ভর্তি হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে শিশু জিয়াউর রহমানসহ পরিবারের সবাইকে বগুড়ার বাগবাড়ীতে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হলে তিনি সেখানকার গ্রামের স্কুলে কিছুকাল লেখাপড়া করেন।

পরবর্তীকালে মহাযুদ্ধের শেষ দিকে পরিবার পুনরায় কলকাতায় স্থানান্তরিত হলে শিশু জিয়াউর রহমান কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন এবং সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত এই স্কুলেই লেখাপড়া করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর বাবা মনসুর রহমান পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকরি নিয়ে করাচিতে চলে যান সপরিবারে। করাচি একাডেমিতে গিয়ে জিয়া ভর্তি হন দেশভাগের পর। ১৯৫২ সালে তিনি এই করাচি একাডেমি থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরে ডি জে কলেজে অধ্যয়নকালেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ক্যাডেট অফিসার হিসেবে যোগ দেন তিনি। ১৯৫৩ সালে সদ্য কৈশোর পেরুনো তরুণ জিয়াউর রহমানের সেনাবাহিনীতে যোগদানের ঘটনাটিই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়। সেদিন যদি তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ না দিয়ে অন্যসব ভাইয়ের মত অন্য কোন বেসামরিক পেশা বেছে নিতেন, তবে হয়ত ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা হত।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালি হাতেগোনা কয়েকজন অফিসারের মধ্যে জিয়াউর রহমান তাঁর মেধা ও পেশাগত দক্ষতার জন্য বিশেষ সুনাম অর্জন

www.pathagar.com

করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে তিনি প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানির কমান্ডার হিসেবে লাহোরের খেমকারান সেক্টরে যুদ্ধ করেন। সম্মুখ সমরে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাঁর কোম্পানি বিশেষ সামরিক খেতাবও লাভ করেছিল। ১৯৬৬ সালে তিনি কোয়েটা স্টাফ কলেজ থেকে পিএসসি উত্তীর্ণ হন। ওই একই বছরে তিনি কাকুলস্থ তদানীন্তন পাকিস্তান সামরিক একাডেমির ইনস্ট্রাকটর নিযুক্ত হন। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় তিনি জয়দেবপুরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ছিলেন। ১৯৭০ সালে চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের কথা। জিয়াউর রহমান তখন একজন মেজর হিসেবে চট্টগ্রামেই কর্মরত। সারা বাংলা তখন উত্তাল। স্বাধীনতার দাবি, স্বাধিকারের দাবি সর্বত্র। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ কালরাত্রির হত্যাযজ্ঞের পর গোটা জাতি যখন দিশেহারা, ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ ছুটছে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়, শেখ মুজিব গ্রেফতার বরণ করেছেন। সেই দিকনির্দেশনাহীন অবস্থায় মেজর জিয়া আবির্ভূত হলেন অন্ধকারের দিশারী হিসেবে। দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে নিজের জীবন বিপন্ন করে দেশ-জাতির প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় এগিয়ে এলেন তিনি। চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারে ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণ করলেন দৃঢ়কণ্ঠে—আমি মেজর জিয়া বলছি...। একজন মেজর জিয়া ইতিহাসের পাতায় তাৎক্ষণিকভাবে স্থান করে নিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে।

গোটা জাতি ঘুরে দাঁড়াল, উজ্জীবিত হল, সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সুদীর্ঘ ৯ মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষে বিজয়ী হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করল। মেজর জিয়া শুধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, নিজে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন 'জেড ফোর্সে'র কমান্ডার হিসেবে। তিনি তাঁর পরিবারকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর হেফাজতে সমর্পণ করে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে সহযোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বীরউত্তম উপাধিতে ভূষিত হলেন তিনি। স্বাধীনতার পর মেজর জিয়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করলেন কুমিল্লার এক ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে।

পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালের জুন মাসে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপপ্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট তিনি সেনাপ্রধান হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সেনা বিদ্রোহের সময় সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান গৃহবন্দি হন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক সিপাহী জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে বন্দি জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করেন সাধারণ সিপাহী জনতা। দেশ ও জাতির আরেক ক্রান্তিলগ্নে স্বাধীনতার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ঘোষক পুনরায় দেশ-জাতির প্রয়োজনে জীবনবাজি রেখে এগিয়ে এলেন। একটি বিশৃঙ্খল পরিবেশে প্রকৃত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন জিয়াউর রহমান। তিনি বাকশালী দমবন্ধ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। সংবাদপত্র এবং গণমাধ্যমের অবাধ প্রকাশ ও প্রচারণা অবারিত করে দিলেন। বিচার বিভাগের কেড়ে নেয়া স্বাধীনতা ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় পর্যায়ে নানা মত, গোষ্ঠী ও শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে স্থিতিশীল ও স্বনির্ভর করার কার্যক্রমে মনোনিবেশ করলেন। ১৯৭৮ সালের ৩ জুন সব দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পরই বাংলাদেশের মানুষ পেতে শুরু করে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ। বাকশালের কারণে মানুষের যেসব মৌলিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল, রাষ্ট্রপতি জিয়া তা ফিরিয়ে দেন। এসবের ধারাবাহিকতায় যুগের প্রয়োজনে ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কার্যকর বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাকশালের আওতায় বিলুপ্ত বহুধাবিভক্ত ও বিধ্বস্ত আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করে মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেন। এছাড়া মুসলিম লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ইউনাইটেড পিপলস পার্টিসহ সব রাজনৈতিক দলকে অবাধে যার যার আদর্শ অনুযায়ী রাজনীতি করার অধিকার ফিরিয়ে দেন। তাঁরই সদিচ্ছায় ও আন্তরিক চেষ্টায় বাংলাদেশে পুনরায় বহুদলীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি রচিত হয়। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে শহীদ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে সর্বস্তরে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি ১৯-দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে উন্নয়নের এক শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের সূচনা করেন। দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে নানা উৎপাদনমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করেন দারিদ্র্য দূর করে দেশকে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য। শিক্ষার বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। কৃষি উন্নয়নে ও কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পতিত জমিতে আবাদসহ খালকাটা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে সেচের সুবিধা সম্প্রসারণ করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের সাফল্য ছিল অসামান্য। রাষ্ট্রপতি হিসেবে ৩০টি দেশ তিনি সফর করেন।

লন্ডন ও লুসাকায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন, কলম্বোয় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন, মক্কায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন। ১৯৮০ সালে জাতিসংঘের বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দেন এবং এ সময়েই বাংলাদেশ জাপানকে হারিয়ে

www.pathagar.com

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে তিন সদস্যবিশিষ্ট 'আল কুদস' কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ইরাক-ইরান যুদ্ধাবসানের উদ্দেশ্যে গঠিত নয় সদস্যবিশিষ্ট ইসলামী শান্তি মিশনের তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। মিশনের কাজে তিনি এককভাবে ইরাক ও ইরান সফর করেছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে তিনি সার্ক গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি নিজে যেমন ছিলেন সৎ, সাহসী, পরিশ্রমী, মেধাবী, নির্লোভ দেশপ্রেমিক, দূরদর্শী কর্মোদ্যোগী, উদার গণতন্ত্রী, ধর্মপরায়ণ ইত্যাকার নানা গুণে গুণান্বিত; তেমনি দেশের সেবায় মেধাবী সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের খুঁজে এনে তিনি তাঁর দলে, মন্ত্রিসভায় ও সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থান করে দিয়েছিলেন। যার সুফল পাওয়া গিয়েছিল তাঁর শাসনামলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের মাধ্যমে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তা নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রনায়কত্বে ও নেতৃত্বে সারাদেশে এক অভূতপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য এবং জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের উন্নয়নে ও সমস্যা সমাধানে নতুন নতুন ধারণা ও উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন এবং সমর্থন জুগিয়েছেন সবসময়। তাঁর আমলেই বাংলাদেশে গার্মেন্ট শিল্প সূচনা লাভ করে পরীক্ষামূলকভাবে, যা আজ দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। মধ্যপ্রাচ্যে দক্ষ জনশক্তি রফতানিও শুরু করেন তিনি। গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার তাঁর আমলে শুরু। বন্ধ শিল্পগুলো চালু করে তিন শিফটে কাজ শুরুসহ নতুন শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেন তিনি। পিছিয়ে পড়া নারীসমাজকে এগিয়ে আনার লক্ষ্যে তিনি মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় চালু করেন। শিশু একাডেমি স্থাপনসহ শিশুদের প্রতিভা বিকাশে বাংলাদেশ টেলিভিশনে জনপ্রিয় 'নতুন কুঁড়ি' অনুষ্ঠান শুরু তাঁরই কৃতিত্ব।

গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোক্তা নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. ইউনূসের যুগান্তকারী ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের ধারণাকে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান, যা আজ পত্রপল্লবে বিকশিত হয়ে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত ও প্রশংসিত। খুবই অল্প সময় ক্ষমতায় থাকা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতেন।

নিজে করে দেখাতেন, উৎসাহ দিতেন এবং কঠোর পরিশ্রম করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন অন্যদের জন্য। কয়েক মাইল হেঁটে গ্রামেগঞ্জে ভ্রমণ করা, নিজের হাতে কোদাল নিয়ে খালকাটা কর্মসূচি উদ্বোধন, মাঠে-ঘাটে চাষী-শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময় ইত্যাকার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ব্যাপক উন্নয়নের জন্য গণজোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। বিশেষ করে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে খালখনন, গণশিক্ষা, শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জনগণকে সচেতন করেছেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কোন কর্মসূচি উদ্বোধনের

www.pathagar.com

মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজ হাতে খালকাটা, গাছের চারা রোপণসহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে জনগণকে সৃজনশীল, উদ্যমী ও উৎসাহিত হতে প্রভাবিত করেছেন। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণকালে তিনি কৃষি, বাণিজ্য এমনকি খাদ্যাভ্যাসের বিষয়েও নতুন নতুন প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা দেখে তা দেশে এসে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন। দেশের উন্নয়নে ব্যক্তি উদ্যোগকে রূপকভাবে কাজে লাগানোর জন্য তিনি বেসরকারি খাতকে উন্মুক্ত ও উৎসাহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে কিছু বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার চক্রান্তে শাহাদাত বরণ করেন এই জনপ্রিয় দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়ক। সারাদেশ স্তব্ধ হয়ে পড়ে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান স্ত্রী গৃহবধূ বেগম খালেদা জিয়া ও দুই কিশোর পুত্র তারেক রহমান ও আরাফাত রহমানকে। আরও রেখে গেছেন তাঁর প্রিয় গুণমুগ্ধ দেশবাসীকে, যারা আজও তাঁর দেশপ্রেম ও আদর্শকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ও বহন করে চলেছেন। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন তথা দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা তাঁকে আজও অমর করে রেখেছে। ৭৫তম জন্মবার্ষিকীতে ইতিহাসের এই মহানায়কের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র সব নেতাকর্মী ও আপামর দেশবাসীর পক্ষ থেকে।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দৈনিক আমার দেশ-এ ছাপা হয়েছে ১৯ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে

www.pathagar.com

গৃহবধূ থেকে দেশনেত্রী

স্বামী তার মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বীর উত্তম মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রথম রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শের প্রবর্তক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা এবং আধুনিক স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। সেই অনন্য দেশপ্রেমিক স্বামীর ২১ বছরের পরম নির্ভরতার ছায়াসঙ্গী ছিলেন তিনি। ১৯৮১ সালের ৩০শে মে প্রিয়তম স্বামী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অকাল অস্বাভাবিক প্রয়াণে বেগম খালেদা জিয়া আর দশজন গৃহবধূর মতই হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। মর্মস্পর্শী এই আকস্মিক বিচ্ছেদ মেনে নেয়া তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

শহীদ স্বামীর রেখে যাওয়া সংসার সামলানো এবং পিতৃহারা দুই কিশোর পুত্রকে মানুষ করা প্রভৃতি গুরুদায়িত্ব একাকী সামাল দিতে গিয়ে বহু বছর পর হিমশিম খেতে থাকেন তিনি। ১৯৬০ সালে কিশোরী গৃহবধূ হয়ে সংসার শুরু করা খালেদা জিয়া এ সময়ে ২১ বছরের বর্ণিল দাম্পত্য জীবনের পাতা উল্টে সুখ-দুঃখ-কষ্ট-বিরহ-সংকট রোমন্থন করে করে নিজের অজান্তেই রূপান্তরিত হচ্ছিলেন আরো পরিণত দায়িত্বশীল গৃহবধূ হিসেবে। স্বামীর প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে শহীদ স্বামীর প্রিয় আরাধ্য জিনিসগুলোর প্রতি তার আরো গভীর ভালোবাসা জন্ম নেয়। সংসার, দুই পুত্র ছাড়াও দেশ, দেশের মানুষ, গণতন্ত্র, দল আর আদর্শ ছিল তার ক্ষণজন্মা স্বামীর অতি প্রিয়। অকালে স্বামীহারা বেগম খালেদা জিয়া তাই শহীদ স্বামীর উপরোক্ত প্রিয় জিনিসগুলোকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করাকেই নিজের বাকি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে ফেলেন।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ড আপাতদৃষ্টিতে সরল সোজা সেনা বিদ্রোহের ফল বলে মনে হলেও বেগম খালেদা জিয়া প্রথম থেকেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে এর পেছনে রয়েছে আরো সুদূরপ্রসারী গভীর ষড়যন্ত্রের নায়কেরা। যারা বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও শহীদ জিয়া সূচিত উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করতে চায়। শহীদ জিয়া প্রতিষ্ঠিত তার প্রিয় দল বিএনপিকে ধ্বংস করে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চায়। আধিপত্যবাদীদের ক্রীড়নক তাবেদার সরকার গঠন করতে চায়। এই উপলব্ধি থেকেই বেগম খালেদা জিয়া মূলত দেশপ্রেমিক স্বামীর আদর্শ ও কীর্তিকে রক্ষা করার ও প্রলম্বিত করার উদ্দেশ্যে নির্ঝঞ্ঝাট গৃহবধূ জীবন থেকে রাজনীতির

www.pathagar.com

কঠিন সংগ্রামী জীবন বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মরহুম স্বামীর প্রতি গভীর প্রেম বৃহত্তর পরিসরে এসে দেশপ্রেমের ফল্গুধারায় রূপান্তরিত হল।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবরণের পর উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও দলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু শহীদ জিয়ার হত্যাকারীদের নেপথ্যচারী চক্রান্তকারীদের প্রতিভূ স্বৈরাচারী এরশাদ তখন সেনাপ্রধান হিসেবে নানারকম ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে। তার অশুভ ইন্ধনে সরকার ও দলের ভেতরে শৃঙ্খলাহীনতা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। এমনই সংকটময় পরিস্থিতিতে দলকে টিকিয়ে রাখা এবং ঐক্যবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজনে শহীদ জিয়ার অনুপস্থিতিতে সর্বজন গ্রহণযোগ্য এমন এক নেতৃত্বের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে যার ছোঁয়ায় দল সকল বিভেদ কাটিয়ে টিকে থাকতে পারবে এবং যুগের প্রয়োজন মেটাতে পারবে।

দলের সে সময়ের অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃবৃন্দ যারা শহীদ জিয়ার আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে দলকে পরিচালিত করতে চাচ্ছিলেন তারা বেগম খালেদা জিয়াকে দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। সামগ্রিক পরিস্থিতি অবগত হয়ে প্রিয়তম স্বামী শহীদ জিয়ার গড়া দলকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে বেগম খালেদা জিয়া দলের প্রাথমিক সদস্য পদ গ্রহণ করেন ১৯৮২ সালের ৩রা জানুয়ারি। তার দলে যোগদানের মাধ্যমে কার্যকর নেতৃত্বহীন বিএনপিতে নতুন আশার সঞ্চার হয় এবং অন্যদিকে স্বৈরাচারী এরশাদের টনক নড়ে ওঠে। তৎকালীন সেনাপ্রধান এরশাদের ইন্ধনে দলের ভেতরে লুক্কায়িত কুচক্রীরা স্বাভাবিক নিয়মেই প্রমাদ গুণতে থাকে এবং যে কোন মূল্যে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণের ব্যাপারে প্রবল বিরোধিতা করতে থাকে। কিন্তু শহীদ জিয়ার খাঁটি অনুসারীরা বেগম খালেদা জিয়াকে পাশে পেয়ে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও দলে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দলকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। এহেন দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে বেগম খালেদা জিয়া অসীম ধৈর্যের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে অগ্রসর হতে থাকেন।

১৯৮২ সালের ২১শে জানুয়ারি বিএনপির চেয়ারম্যান নির্বাচনে খালেদা জিয়া প্রার্থী হলে তৎকালীন সেনাপ্রধান এরশাদের ইঙ্গিতে দলের ভেতরের কুচক্রী অংশ বিচারপতি সাত্তারকেও চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী ঘোষণা করে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এর মাধ্যমে দলে এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে বেগম জিয়া বিচারপতি সাত্তারের সঙ্গে আলোচনা করেন।

বিচারপতি সাত্তার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রণীত ১৯ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং দলের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাবার আশ্বাস দিলেন খালেদা জিয়াকে। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে দলের বৃহত্তর স্বার্থে বেগম

www.pathagar.com

খালেদা জিয়া তার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেন। বিচারপতি সাত্তার যখন একাধারে রাষ্ট্রপতি এবং দলের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন সে সময়ে তৎকালীন সেনাপ্রধান এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতায় সেনাবাহিনীর অংশীদারিত্ব চেয়ে বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে তার দীর্ঘদিনের লালিত কুমতলবের জানান দেন। এ নিয়ে বিতর্ক চলাকালেই দলের এবং সরকারের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা স্বৈরাচারী এরশাদের কুচক্রী দোসররা পরিকল্পিতভাবে আইন শৃঙ্খলাজনিত কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা সংঘটিত করে।

এহেন পরিস্থিতিতে শহীদ জিয়ার শাহাদাতবরণের প্রায় দশ মাস পর ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ স্বৈরাচারী এরশাদ বন্দুকের নলের মুখে বিচারপতি সাত্তারকে হটিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বিএনপি সরকারকে উৎখাত করে এবং সংবিধান স্থগিত ও সংসদ বাতিল করে সামরিক শাসন জারি করে। শহীদ জিয়ার স্বপ্নের বহুদলীয় গণতন্ত্র আবার মুখ থুবড়ে পড়ে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। হাজার হাজার নেতাকর্মী বিশেষ করে বিএনপির নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হয় এবং নির্যাতন নিপীড়নের মাধ্যমে বিএনপিকে ধ্বংস করা হয়ে দাঁড়ায় স্বৈরাচারী এরশাদের সামরিক সরকারের মূল লক্ষ্য। বিচারপতি সাত্তার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

ইতোমধ্যে ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সামরিক সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং চারজন ছাত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। সে অবস্থায় স্বৈরাচারী এরশাদের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করতে বেগম খালেদা জিয়া মাঠে নেমে পড়লেন। তার রাজপথের সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে দলে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটে। ১৯৮৩ সালের মার্চে তিনি দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। একই বছর ১লা এপ্রিল স্বৈরাচারী এরশাদ ঘরোয়া রাজনীতির সুযোগ উন্মুক্ত করলে বিএনপির ঢাকাস্থ কার্যালয়ে বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বেগম খালেদা জিয়া তার জীবনের প্রথম আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা দেন যেখানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান। বর্ধিত সভার পর থেকে বিচারপতি সাত্তার অসুস্থতাজনিত কারণে দলের কার্যক্রম থেকে দূরে রইলেন।

কিন্তু দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া ঠিকই নেতৃত্ব দিতে থাকলেন। সমমনা দল নিয়ে গঠন করলেন ৭ দলীয় ঐক্য জোট। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট গঠিত হয়। সামরিক শাসন বিরোধী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে ৭ দল ও ১৫ দলের যৌথসভায় ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৫ দফা কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ইতোমধ্যে বেগম খালেদা জিয়া ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন এবং কার্যকরভাবে শুধু বিএনপি নয় ৭ দলের নেত্রী হিসেবে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিচিতি পেতে থাকেন। অবশেষে ১৯৮৪ সালের ১০ই মে বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির চেয়ারপার্সন হিসেবে নির্বাচিত হন। স্বামীর শাহাদাতবরণের প্রায় ৩ বছর পর তিনি ধাপে ধাপে নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে স্বামীর গড়া প্রিয় দল বিএনপির মূল দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের হাতে তুলে নেন। গৃহবধূ পরিণত হলেন রাজনৈতিক দলের নেত্রীতে।

দলের তখন চরম দুর্দিন। তার নেতৃত্বে যেমন সামরিক শাসন বিরোধী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন চলছে তেমনি স্বৈরাচারী এরশাদের তরফ থেকে পাল্টা চাপ হিসেবে তার দলে বিশাল ভাঙন সৃষ্টি করা হয় সামরিক সরকারের নোংরা পৃষ্ঠপোষকতায়। দলের অধিকাংশ সিনিয়র নেতা তখন দল ত্যাগ করে এরশাদের দলে এবং মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। বিএনপি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে থেকেই এরা দলের ভেতরে উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি করে স্বৈরাচারী এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের পথকে প্রশস্ত করতে সহায়তা করছিল। এমন সংকটময় পরিস্থিতিতেও বেগম খালেদা জিয়া তার মনোবল অটুট রেখে দলের হাল ধরে সামনে এগুতে থাকেন।

কিছুদিনের মধ্যে ১৯৮৫ সালে তার দলে আরেকদফা ভাঙন এবং তার নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় ঐক্যজোটেও ভাঙন ধরায় স্বৈরাচারী এরশাদ। এহেন পরিস্থিতিতেও বেগম জিয়া সাহসিকতার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করে জাতীয় স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করেন। স্বৈরাচারী এরশাদের কূটকৌশলের বিপরীতে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পাল্টা কৌশল প্রয়োগ করে করে বেগম খালেদা জিয়া দলকে টিকিয়ে তো রাখছিলেনই পাশাপাশি নতুন করে পুনর্গঠনের মাধ্যমে আরো শক্তিশালী করে তুলছিলেন। ১৯৮৬ সালে স্বৈরাচারী এরশাদ তার শাসনকে বৈধতা দেয়ার লক্ষ্যে যে সংসদ নির্বাচন ঘোষণা করে সেখানে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত ৭ দল ও ১৫ দলের সকলের হলেও আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা শেষ মুহূর্তে চতুরতার মাধ্যমে নির্বাচনে অংশ নেন। কিন্তু খালেদা জিয়া স্বৈরশাসক এরশাদের অধীনে কোন নির্বাচনে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকার সাহসী দূরদর্শিতা প্রদর্শন করে সাময়িকভাবে একা হয়ে পড়লেও কিছুদিনের মধ্যেই এই সাহসী সিদ্ধান্তের জন্য নন্দিত হতে থাকেন সর্বমহলে।

স্বৈরাচারী এরশাদ ও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী নেত্রী শেখ হাসিনার যৌথ কূটচালও খালেদা জিয়া মোকাবেলা করেন অসম সাহসিকতার সঙ্গে দেশপ্রেমিক জনগণের ওপর ভরসা রেখে। ফলে রাজনৈতিকভাবে এ সময়ে বেগম খালেদা জিয়া এগিয়ে যান অনেক দূর, জনগণের হৃদয়ের মণিকোঠায় তার স্থান হয় নীতি আদর্শে আপসহীন নেত্রী হিসেবে। পরবর্তীতে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগসহ ১৫ দলীয় জোট ও অন্য সকলে কমবেশি ফিরে এলেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে অটুট থাকার কৃতিত্বের সুবাদে খালেদা জিয়া গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের প্রধান

www.pathagar.com

নেত্রীতে পরিণত হন। তার আপসহীন নির্লোভ আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বার বার ভেঙে যাওয়া দলের বিপরীতে তিনি নতুন প্রজন্মের এক বিশাল সংখ্যক নেতাকর্মীদের পান তার পাশে বিশ্বস্ত লড়াকু সৈনিক হিসেবে। তার নেতৃত্বের ও ব্যক্তিত্বের মহিমায় সারা বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে সারাদেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অধিকাংশ বর্ষীয়ান সিনিয়র নেতাদের বিভ্রান্ত পথভ্রষ্টতা তাকে ভবিষ্যতের দিকে নজর দিতে বাধ্য করেছিল এবং ফলে ছাত্রদল, যুবদল, শ্রমিক দল ও কৃষক দলের মত অঙ্গসংগঠনগুলোর মাধ্যমে রাজপথ থেকে অসংখ্য তরুণ নেতৃত্বের প্রতিভা খুঁজে এনেছিলেন তিনি।

সারাদেশ জুড়ে বেগম খালেদা জিয়ার আপসহীন নেতৃত্বের বিভা ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বৈরাচারী এরশাদের সকল কূটকৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচার এরশাদের পতন ঘটে। এই রাজনৈতিক সাফল্য খালেদা জিয়াকে তার দলের নেত্রী থেকে আপসহীন দেশনেত্রীতে পরিণত করে। জনমনে তার ভাবমূর্তি সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়।

দেশনেত্রী খালেদা জিয়া স্বৈরাচারী এরশাদ পতনের পর ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী হন যা সে সময়ের নগরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে অপ্রত্যাশিতই ছিল। সাধারণ জনগণ বিশেষ করে মহিলা ও নতুন প্রজন্ম তার আপসহীন ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল্যায়ন করে নীরব ভোট বিপ্লবের মাধ্যমে তাকে পুরস্কৃত করে। সুদীর্ঘ ৯ বছর পর স্বামীর গড়া দলকে পুনরায় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আনতে সক্ষম হন তিনি। গৃহবধূ থেকে দেশনেত্রী হওয়া বেগম খালেদা জিয়া এবার বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

স্বামীর প্রতি ভালোবাসার এবং দেশপ্রেমের দায়বদ্ধতা থেকে যে ঝুঁকিপূর্ণ সংগ্রামের পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন তার প্রাথমিক সাফল্য ধরা দেয় ততদিনে। স্বামীর শুরু করে যাওয়া জনকল্যাণমুখী নানা কর্মসূচি যা অকাল প্রয়াণের কারণে তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি সেগুলো পুনরায় শুরু করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন তিনি। পরলোকগত স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের এর চেয়ে ভালো উপায় আর কি হতে পারে? দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ঘোরতর সমালোচককেও তার ১৯৯১ - ৯৬ শাসনামলকে প্রশংসা করতে শুনেছি বিভিন্ন ঘরোয়া আলোচনায়, সভা-সেমিনারে।

শহীদ জিয়া প্রবর্তিত বহুদলীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে এ সময়ে বেগম জিয়া সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করেন। সাফল্যের সঙ্গে উন্নয়ন কার্যক্রম ও রাষ্ট্র পরিচালনা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগসহ তাদের চিহ্নিত দোসরদের যৌথ কূটচালে ১৯৯৬ সালে অনভিপ্রেত সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির উপক্রম হলে দেশনেত্রী

www.pathagar.com

খালেদা জিয়া দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে সংযমের পরিচয় দেন। প্রতিকূল পরিবেশেও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ১১৬টি আসন পেয়ে পরাজিত হয়ে বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে থাকেন তিনি। গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষায় তার এই সময়কার ধৈর্য ও সহনশীল ভূমিকা গঠনমূলক হিসেবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। ১৯৯৬ - ২০০১ সময়কালে আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বেগম খালেদা জিয়া দেশ ও দেশের জনগণের স্বার্থ সুরক্ষায় সংসদের ভেতরে ও বাইরে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করেন।

যার ফলশ্রুতিতে আওয়ামী দুঃশাসনে অতিষ্ঠ জনগণ পুনরায় ২০০১ সালের নির্বাচনে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিপুলভাবে বিজয়ী করে। ২০০১ - ২০০৬ শাসনামলে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি দেশের উন্নয়নে বিশেষ করে কৃষি, শিল্প, ভৌত অবকাঠামো, বিনিয়োগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বেগম জিয়ার ভূমিকা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়।

এ সময়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া ও দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমান বিএনপি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ফলে দলে নতুন সম্ভাবনা ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এই অমিত সম্ভাবনাকে দেশবিরোধী অশুভ শক্তি তাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়ার লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী নৃশংস ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বিএনপির চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ ও তার দেশীয় দোসররাসহ আন্তর্জাতিক প্রভুরা সম্মিলিতভাবে তারেক রহমানসহ জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপপ্রচার ও কল্পকাহিনীর ধূম্রজাল সৃষ্টি করতে থাকে সুপরিকল্পিতভাবে। এই প্রচেষ্টায় তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় নেতৃস্থানীয় কিছু চিহ্নিত সংবাদ মাধ্যম।

যার ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির ঘটনা প্রবাহ সংঘটিত করা হয় পুনরায় দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতিনিধিত্বকারী বিএনপি ও এর রক্ষাকবচ জিয়া পরিবারকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে। এ সময়কার ঘটনাপ্রবাহ অতি সাম্প্রতিককালের বলে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না। বেগম জিয়ার গণতন্ত্র ও দেশের মানুষের প্রতি বিশ্বাসের কারণে সরকার বাধ্য হয় তাদের নীল নকশা থেকে সরে আসতে এবং বেগম জিয়াকে মুক্ত করে দিতে। বাধ্য হয় জরুরি অবস্থা তুলে নির্বাচন দিতে।

এ সবই সম্ভব হয় বেগম জিয়ার অনমনীয় দৃঢ় মনোভাবের জন্য। অনস্বীকার্য যে, বিএনপি ও জিয়া পরিবারের যথেষ্ট ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছে ১১ জানুয়ারির প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কুশীলবরা। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়ার কুশলী আপসহীন নেতৃত্বের ছায়া না থাকলে ক্ষতির পরিমাণ আরো অনেক অনেক বেশি হতে পারত বলে অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের মূল্যায়ন করতে শুনেছি।

www.pathagar.com

রাজনীতিতে উত্থান আছে—পতন আছে, জোয়ার আছে—ভাটা আছে। পালাবদলের খেলায় মানিয়ে নিতে পারলে রাতের পর যেমন দিন অবশ্যম্ভাবী তেমনি সাময়িক পতনের পর উত্থানও অবশ্যম্ভাবী। সময়ের পরিক্রমায় দলকে প্রতিনিয়ত যুগোপযোগী করতে থাকা এবং ভুলকে শুধরে জনগণের মনে পুনঃ পুনঃ স্থান করে নেয়ার নিরন্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দল ও তার আদর্শ প্রলম্বিত হয় প্রজন্মের পর প্রজন্মে। এই যুগ যুগ ধরে প্রাসঙ্গিক থাকার কাজটি করতে হয় দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকেই অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে।

প্রায় ৩ দশক ধরে স্বামীর গড়া দলকে বাঁচিয়ে রেখে আজও বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় দলের সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত রাখতে পারার সিংহভাগ কৃতিত্ব এক সময়কার স্রেফ গৃহবধূ আজকের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকেই দিতে হবে। এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও সবচেয়ে বড় অবদান বেগম জিয়ার। অ্যাথলেটিক মাঠের রিলে রেসের মত স্বামীর হাতের ধানের শীষ এখন তার হাতে। অগ্রবর্তী অবস্থান বজায় রেখে তা যথাসময়ে পরের প্রজন্মে প্রবাহিত করবার গুরুদায়িত্ব সুচারুভাবেই তিনি সম্পাদন করবেন এই ভরসা তার ওপর আছে দলের সকলস্তরের নেতাকর্মী ও আপামর দেশবাসীর। আল্লাহ তাকে সুস্থ রাখুন, দীর্ঘায়ু করুন।

দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ২য় কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে আমার দেশ, নয়াদিগন্ত, কালের কণ্ঠ, সমকাল, দিনকাল, সংগ্রাম প্রভৃতি জাতীয় দৈনিকে বিএনপি কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে ছাপা হয়েছে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে

www.pathagar.com

কারার ঐ লৌহকপাট

বেগম খালেদা জিয়া জীবনে প্রথমবারের মতো অন্তরীণ হন সেই ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন, মে মাসের প্রথম দিকে। ২৬ মার্চ মেজর জিয়া বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণ করার পর তার স্ত্রী হিসেবে দুই শিশুপুত্রসহ তিনি তখন বলতে গেলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে 'দি মোস্ট ওয়ান্টেড পরিবার'। চারপাশে খোঁজ খোঁজ রব, চিরুণী অভিযান চলতে থাকে তাকে খুঁজে বের করার জন্য। অসহায় গৃহবধূ খালেদা জিয়া দুই শিশুপুত্র নিয়ে সেই যুদ্ধাবস্থায় স্বামীর অনুপস্থিতিতে কী করবেন, কোথায় যাবেন এমনসব চিন্তায় ভীষণ রকম দিশেহারা তখন।

নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ষোলশহরের বাসা ছেড়ে চট্টগ্রামেই চাচা দেলোয়ার হোসেনের বাসায় আত্মগোপন করেন প্রথমে। তার কিছুদিন পর বোরকায় মুখ ঢেকে নদীপথে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছান এবং সেখান থেকে গাড়িতে করে বড় বোন চকলেট আপার ঢাকাস্থ শান্তিনগরের বাসায় আশ্রয় নেন দুই শিশু পুত্রসহ। তারও অল্প কিছুদিন বাদে সিদ্ধেশ্বরীতে আরেক পরিচিত স্বজনের বাসায় সরে থাকাকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। দুই শিশু পুত্রসহ ঢাকা সেনানিবাসে বন্দি ছিলেন প্রায় সাড়ে সাত মাস। ১৯৭১ সালেরই ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হওয়ার দিন মুক্তি লাভ করেন তিনি। সে সময়ে তিনি তো একজন গৃহবধূ মাত্র। কেমন লেগেছিল তার প্রথম বন্দিত্বের অভিজ্ঞতা? যুদ্ধরত স্বামীর মঙ্গলচিন্তায় বিরামহীন উদ্বেগ আর দুই শিশুপুত্রের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় অসহনীয় কেটেছিল তার সে সময়টুকু। আসলে বেগম খালেদা জিয়াকে দুই শিশু পুত্রসহ বন্দি করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চেয়েছিল লড়াকু মেজর জিয়ার ওপর মানসিকভাবে চাপ প্রয়োগ করতে। তারা আশা করেছিল এর ফলে মেজর জিয়া মনের জোর হারাবেন এবং তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন কিংবা পিছু হটবেন। কিন্তু তাদের সেই চাপ প্রয়োগের কৌশল সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয়েছিল। মেজর জিয়া দমে যাননি বরং স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরদর্পে লড়ে গেছেন। যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিলেন সবার আগে, সেই যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন একেবারে বিজয় অর্জনের মুহূর্ত পর্যন্ত। মুক্তিযুদ্ধে অসম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি বীর উত্তম খেতাবও লাভ করেন। ১৯৭১ সালে বেগম জিয়া বন্দি দশার প্রথম যে অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করেন, তা তার পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দুঃখজনক হত্যাযজ্ঞে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে আওয়ামী লীগেরই একটি অংশ খন্দকার মুশতাক আহমদের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে। শেখ মুজিব হত্যাকারী সেনাবাহিনীর মাঝারি পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তা বঙ্গভবনে অবস্থান নিয়ে খন্দকার মুশতাক আহমদকে সামনে রেখে দেশ পরিচালনা করতে থাকে। অন্যদিকে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে অন্য একটি অংশ পাল্টা অভ্যুত্থান সংঘটিত করে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর। সেদিনই খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থানকারীরা স্বামী জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দি করে, সঙ্গে ছিলেন গৃহবধূ বেগম খালেদা জিয়া ও দুই শিশুপুত্র। সেনাবাহিনীতে তখন চেইন অফ কমান্ড বা নির্দেশসূত্র পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে জাসদ সমর্থিত আর একটি অংশ কর্মকর্তাবিহীন সমতল এক সেনাবাহিনীর দাবিতে সাধারণ সিপাহীদের উত্তেজিত করে তোলে। নানা ঘটনার পরম্পরায় ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক সিপাহী জনতার বিপ্লব সংঘটিত হয়। সিপাহী জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অভূতপূর্ব এক বিপ্লবের মাধ্যমে জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দিদশা থেকে মুক্ত করে এই দিনে এবং পরম নির্ভরতায় তার হাতে সেনাবাহিনীতে তথা সমগ্র দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা পুন:প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে। এক অসহনীয় অনিশ্চয়তার মাঝে কাটিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া এই গৃহবন্দিত্বের সময়টুকু। চারপাশে গোলাগুলি, খুনোখুনি—সব মিলিয়ে এক চরম নৈরাজ্যকর অবস্থা। স্বামী-সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে দোয়া করে কাটিয়ে দিয়েছেন সেই ক'দিনের বিনিদ্র রজনীগুলো।

স্বামী যখন ১৯৮১ সালের ৩০ মে শাহাদাৎ বরণ করলেন, চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে কতিপয় বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার হাতে, তখন তিনি ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছিলেন। তখনই আঁচ করেছিলেন স্বামী হত্যার ষড়যন্ত্রে তৎকালীন সেনাপ্রধান এরশাদের নেপথ্য সংশ্লিষ্টতা। স্বামীর প্রতিষ্ঠিত দলকে উৎখাত করে এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ প্রত্যক্ষ করলেন পরের বছরেই গভীর মর্ম যাতনার সঙ্গে। বিএনপিকে ভেঙে যখন স্বৈরাচারী এরশাদ নিঃশেষ করে ফেলার উপক্রম করল তখন দলের সুবিধাবাদী কিছু নেতা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে অন্তর্কলহ ও দলবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হল, তাও দেখলেন। অবশেষে স্বামীর প্রতি গভীর ভালোবাসার টানে স্বামীর প্রতিষ্ঠিত দলকে রক্ষা ও স্বামীর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে দলের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ১৯৮৩ সালে। ছিলেন অন্তঃপুরবাসিনী ও দেশপ্রেমিক স্বামীর প্রেরণাদায়িনী, নেপথ্যে থেকে বীর স্বামীর বীরত্বপূর্ণ সব কাজে সমর্থন জুগিয়ে গেছেন। ঘরকন্নার কাজ ছেড়ে সামনে আসেননি এর আগে কখনও।

প্রয়োজনও পড়েনি স্বামীর উপস্থিতিতে তেমন করে সামনে আসার। স্বামীর অনুপস্থিতিতে এবার এলেন সামনে, ঝড়-ঝঞ্ঝা সবকিছু নিজেই সামনে থেকে মোকাবেলা করার সংকল্প নিয়ে। স্বৈরাচারী এরশাদের সামরিক শাসন অবসান করে

www.pathagar.com

গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাহস করে রাজপথে নেমে এলেন। নেতৃত্ব দিয়ে গেলেন সামনে থেকে, বিপর্যস্ত দলকে গড়ে তুলতে লাগলেন তৃণমূল পর্যায় থেকে। এরশাদের সব কূটচাল আর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে লাগলেন নিজের বিচক্ষণতা আর দৃঢ় মনোবল দিয়ে। ১৯৮৩ সালের ২৮ নভেম্বর বেগম খালেদা জিয়া একজন রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে প্রথমবার গৃহবন্দি হন। ঘাবড়ে যাননি মোটেও, কারণ গৃহবন্দিত্বের অভিজ্ঞতা তো আর তখন নতুন কিছু নয় তার কাছে।

১৯৮৫ সালের ১ মার্চ আবার গৃহবন্দি হলেন খালেদা জিয়া। তিনি তখন কেবল বিএনপি'র নেত্রীই নন বরং সাতদলীয় জোটের নেত্রী হিসেবে স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অব্যাহত আন্দোলন-সংগ্রামের মুখে স্বৈরাচারী এরশাদ বেগম খালেদা জিয়াকে শুধু গৃহবন্দি করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং এ সময়ে সব ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতাকেও নিষিদ্ধ করা হয়। বিএনপি'র ভেতরে আরেক দফা ভাঙন সৃষ্টি করাসহ তার নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোটেও বিভেদ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চলতে থাকে। বেগম খালেদা জিয়া পরম ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এসব অপচেষ্টা মোকাবেলা করেন এবং নিজে রাজপথে অবস্থান নিয়ে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলেন।

চিহ্নিত বিশ্বাসঘাতকরা তাকে ছেড়ে বিভিন্ন দফায় দল ও জোট ত্যাগ করে চলে গেলেও সাধারণ জনগণের সমর্থনকে পুঁজি করে বেগম খালেদা জিয়া নতুন শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে যেতে থাকেন। তার জনভিত্তি এ সময়ে আরও গভীরে প্রোথিত হতে থাকে। ছাত্রদল ও যুবদলের ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে দেশজুড়ে। খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আকৃষ্ট হয়ে এবং তার প্রতি সহানুভূতির কারণে তৎকালীন নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শে সমবেত হতে থাকে দলে দলে। বিশেষ করে ১৯৮৩, ১৯৮৪ এবং ১৯৮৫ সালে ছাত্রদল ও যুবদলের সাংগঠনিক ভিত্তি সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ও পাড়ায়-মহল্লায়, অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

১৯৮৬ সালের মার্চ মাস জুড়ে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোটের যুগপৎ আন্দোলন সংগ্রামের মুখে স্বৈরাচারী এরশাদের পতন প্রায় ঘনিয়ে এসেছিল। আন্দোলন সংগ্রামের সেই চূড়ান্ত ক্ষণে শেখ হাসিনা নাটকীয়ভাবে হঠাৎ করেই স্বৈরাচারী এরশাদের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যুগপৎ আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করে এভাবে শেখ হাসিনা বিশ্বাসঘাতকতা করলেও খালেদা জিয়া ছিলেন স্বৈরাচারী এরশাদের অধীনে কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ব্যাপারে অবিচল। সে সময়ে ১৫ দলীয় জোট থেকে ৫টি দল বেরিয়ে গেলেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৮ দল ও জামায়াতে ইসলামী ১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়। স্বৈরাচারী এরশাদের সামরিক শাসনকে বৈধতার সিল দেয়ার এই

www.pathagar.com

বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্যে দু'দিন আগে ৫ মে বেগম খালেদা জিয়াকে পুনর্বার গৃহবন্দি করা হয়। বেগম খালেদা জিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই আঁতাতের সংসদ বাতিলসহ স্বৈরাচারী এরশাদ হটানোর আন্দোলন শুরু করেন। মজার বিষয় হল এই যে, বিশ্বাসঘাতক আওয়ামী লীগ এবং জামায়াতে ইসলামীসহ যারা ১৯৮৬ সালের ৭ মে'র সাজানো ছকের নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল তারাও আঁতাত অনুযায়ী ফল লাভ না করায় সেই নির্বাচনকে ভোট ডাকাতির নির্বাচন বলে আখ্যা দিয়ে পুনঃনির্বাচন দাবি করে। বেগম খালেদা জিয়া প্রথম অবস্থায় রাজনৈতিকভাবে একঘরে হয়ে পড়লেও এ সময়টিতে সাধারণ জনগণের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা তুঙ্গস্পর্শী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজের মাঝে তার আপসহীন ভাবমূর্তি আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ফলস্বরূপ শেখ হাসিনার চতুর বিশ্বাসঘাতকতার বিপরীতে আপসহীন নেত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া বিশেষ সুনাম অর্জন করেন এই সময়েই।

১৯৮৬ সালের নির্বাচন উপলক্ষে বিশ্বাসঘাতকতাকারী আওয়ামী লীগসহ অন্য সব দল পরবর্তী সময়ে ফিরে আসে খালেদা জিয়ার আপসহীন পথে। ফলে যুগপৎ আন্দোলনের দাপটে স্বৈরাচারী এরশাদ তখন দিশেহারা। আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে, মানুষ নেমে আসতে থাকে রাজপথে। ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধের কঠোর এক কর্মসূচি ঘোষিত হয় তিন জোটের পক্ষ থেকে। এই কর্মসূচির সাফল্যে রাজধানী ঢাকা কার্যত অচল হয়ে পড়ে এবং স্বৈরাচারী এরশাদের ক্ষমতার ভিত নড়ে ওঠে আবারও।

ঢাকা অবরোধের দিন পুলিশের গুলিতে নূর হোসেনসহ ৪ জন নিহত হলে ১১ ও ১২ নভেম্বর দেশব্যাপী লাগাতার হরতালের ডাক দেয়া হয়। হরতালের দিন রাজপথের কেন্দ্রস্থলে থাকার উদ্দেশ্যে সহকর্মী মহিলা নেত্রীদেরসহ বেগম খালেদা জিয়া আগের রাতে দিলকুশার পূর্বাণী হোটেলে অবস্থান নেন। হরতালের প্রথমদিন ১১ নভেম্বর সকালে তাকে হোটেলের দরজা ভেঙে গ্রেফতার করে পুনরায় গৃহবন্দি করা হয়। নাটকীয় এই গ্রেফতার ঘটনা গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং আন্দোলন-সংগ্রাম নতুন গতি লাভ করে। তাকে গ্রেফতার করে গৃহবন্দি করা সত্ত্বেও আন্দোলন দমে না গিয়ে বরং পুরো নভেম্বর মাস জুড়েই হরতাল চলতে থাকে। নিরূপায় হয়ে স্বৈরাচারী এরশাদ নভেম্বর মাসের শেষদিকে জরুরি অবস্থা জারি করে। ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বৈরাচারী এরশাদ ১৯৮৬ সালের বিতর্কিত জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়। যে আঁতাতের সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে ১৯৮৬ সালের ৫ মে বেগম খালেদা জিয়াকে গৃহবন্দি করা হয়েছিল, যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে এবং পুনর্বার গৃহবন্দি হয়ে সেই আঁতাতের সংসদ বাতিলে বাধ্য করতে পারা তার জন্য এক বিশাল রাজনৈতিক বিজয় হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। রাজনৈতিক মুন্সীয়ানা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার জন্য এ সময়ে তিনি সর্বমহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হতে থাকেন।

www.pathagar.com

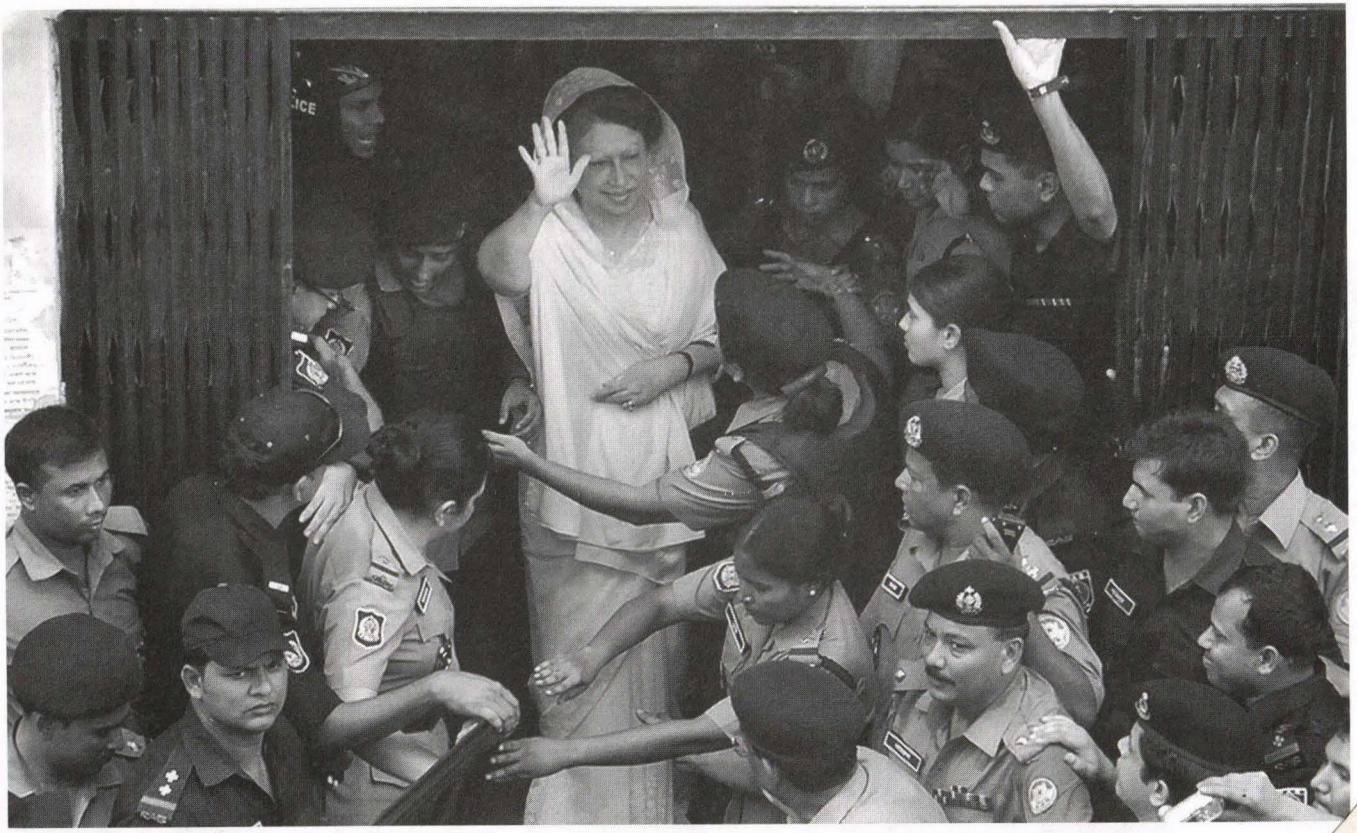

www.pathagar.com

স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের এই দীর্ঘ সময়ে মোট চারবার তিনি গৃহবন্দি হন। কিন্তু বিচলিত হয়ে পিছু হটেননি একবারও। রাজনীতির মাঠে সোচ্চার থেকেছেন, জনগণকে জাগিয়েছেন বার বার এবং দীর্ঘ ৮ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের পথ বেয়ে অবশেষে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বৈরাচারী এরশাদকে উৎখাত করতে সক্ষম হন। রাজপথে পুলিশি হামলা, অমানবিক নির্যাতন, নিঃসঙ্গ গৃহবন্দিত্ব সবকিছুকে তুচ্ছ করে দেশের আপামর জনগণের কাছে অতি প্রিয় এক নেত্রী হয়ে ওঠেন তিনি এবং দেশের মানুষ তাকে দেশনেত্রী উপাধিতে ভূষিত করে। সাধারণ জনগণের উজাড় করা ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে পরবর্তী ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন এই দেশনেত্রী। তার আপসহীনতা, জনসম্পৃক্ততা, রাজপথে সক্রিয়তা, চার চারবারের গৃহবন্দিত্ব—এই সবকিছু তাকে জনগণের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি স্থানে নিয়ে যায়।

সর্বশেষ ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির সাংবিধানিকভাবে অবৈধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথমদিকে অঘোষিতভাবে গৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয় বেগম খালেদা জিয়াকে। শ্বাসরুদ্ধকর সেই সময়ে অবরুদ্ধ অবস্থায় থেকেও তিনি দেশের মানুষের ওপর চালানো নানা নিবর্তনমূলক আচরণের প্রতিবাদ অব্যাহত রাখেন। তাকে অঘোষিতভাবে গৃহে অন্তরীণ রেখে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। নানা মিথ্যা, ভিত্তিহীন মামলায় জড়ানো হয় তাকে এবং তার দুই পুত্রকে। এ সময়ে তাকে সপরিবারে দেশ ত্যাগ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হতে থাকে। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, এদেশ ছাড়া তার আর কোন ঠিকানা নেই এবং দেশের জনগণকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে তিনি কোথাও যাবেন না। বেগম খালেদা জিয়ার আপসহীনতার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় তৎকালীন অবৈধ সরকার। ২০০৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বেগম খালেদা জিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করা হয় এবং জাতীয় সংসদ ভবনে বিশেষ কারাগার স্থাপন করে কারাবদ্ধ করা হয়। আগে নানা সময়ে নানা কারণে গৃহবন্দিত্ব বরণ করলেও আনুষ্ঠানিকভাবে কারাবাস ছিল তার জন্য সেই প্রথম। কারাগারে থেকেও তিনি মাথা নত করেননি, মেনে নেননি দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যায় আপস প্রস্তাবগুলো। তাকে কারাগারে আটকে রেখে বিএনপি'কে ধ্বংস করার সব অপচেষ্টা তিনি রুখে দিয়েছেন দৃঢ় মনোবল, বিচক্ষণতা আর দেশপ্রেমের শক্তি দিয়ে। সাধারণ জনগণ তার পাশে দাঁড়িয়েছে বরাবরের মতই। ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি মুক্তি লাভ করেন কারাগারের লৌহ কপাটের অন্তরাল থেকে।

এক জীবনে ঘোষিত বা আনুষ্ঠানিক গৃহবন্দিত্ব এবং কারাবরণের অভিজ্ঞতা বেগম খালেদা জিয়ার হয়েছে মোট ৭ বার। প্রথম ২ বার তার গৃহবন্দিত্ব ছিল স্বামীর কারণে, নিজের কারণে নয়। পরের ৫ বার স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজ দায়িত্বেই বরণ

www.pathagar.com

করেছেন গৃহবন্দিত্ব ও কারাবাস। নিখাঁদ দেশপ্রেমের এবং সাহসিকতার যে অনন্য উত্তরাধিকার তিনি বীর স্বামীর কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন তা তাকে পিছিয়ে যেতে শেখায়নি একেবারেই। বরং প্রতিটি অন্তরীণ অবস্থা শেষেই আরও বেশি করে আত্মত্যাগের লক্ষ্যে যেন নতুন করে অনুপ্রেরণা নিয়েছেন। স্বামী তার ৩০ বছর আগে দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন। অকালে পিতৃহীন দুই পুত্র আজ বিদেশে চিকিৎসাধীন, অতি প্রিয় পুত্রবধূরাও দূরদেশে, আদরের নাতনীরাও কাছে নেই তার। অসহনীয় এই নিঃসঙ্গতার মাঝে প্রিয়তম স্বামীর ৪০ বছরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটিও কেড়ে নেয়া হয়েছে নিষ্ঠুরভাবে। দেশ ও জনগণের সেবায় আর কত ত্যাগ তিনি স্বীকার করে যাবেন স্বামীর রেখে যাওয়া আদর্শের পতাকাটি উড্ডীন রাখার স্বার্থে?

দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার তৃতীয় কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে আমার দেশ, নয়াদিগন্ত, যুগান্তর, দিনকাল, সংগ্রাম প্রভৃতি জাতীয় দৈনিকে বিএনপি কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে ছাপা হয়েছে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারে শুরু, যোগ্যতায় এগিয়ে চলা

শুরুটা একেকজনের একেক রকম হতেই পারে। বাবা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শুরুটা ছিল ঘটনাচক্রে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, মা খালেদা জিয়া শুরু করতে বাধ্য হয়েছিলেন স্বামীর গড়া দল রক্ষায় পরিস্থিতির চাপে আর তারেক রহমান শুরু করেছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণের সুবাদে রাজনীতিতে পদার্পণ করবার একটুখানি তুলনামূলক প্রাকৃতিক সুবিধা উত্তরাধিকার সূত্রে তারেক রহমান পেয়েছেন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু যেভাবেই যে রাজনীতিতে আসুন না কেন, রাজনীতির পথ কারোর জন্যই স্বয়ংক্রিয় উপায়ে গোলাপের বিছানা হয়নি এবং হবেও না। বাবা যেমন ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়লেও আমৃত্যু কঠোর পরিশ্রম করে নিজের অবস্থান ইতিহাসে তৈরি করে নিয়েছেন মাও তেমনি পরিস্থিতির চাপে গৃহবধূ থেকে রাজনীতিতে এসে রাজপথের আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে, স্বৈরাচার হটিয়ে, তিন তিনবার প্রধানমন্ত্রীত্ব করে নিজের যথার্থতা এবং যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। আমার মতে তারেক রহমান রাজনীতির পাঠ নিতে শুরু করেছেন একেবারে শৈশবেই। ৬ বছর বয়সে প্রত্যক্ষ করেছেন কেমন করে তার বীর বাবা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তাকেসহ তার পরিবারকে আল্লাহর হেফাজতে সমর্পণ করে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। ১১ বছর বয়সের কৈশোরে সেনাপ্রধান বাবাকে গৃহবন্দী হতে দেখেছেন। আবার সিপাহী জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে সেই বাবাকেই জীবন বিপন্ন করে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে দেখেছেন। রাষ্ট্রনায়ক বাবার দেশসেবায় সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা প্রত্যক্ষ করতে করতে একদিন ১৬ বছর বয়সে প্রিয় পিতাকে শাহাদাতবরণ করতে দেখেছেন। ক্রন্দন ও বিলাপরত মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে প্রাণপ্রিয় পিতার মুখ শেষবারের মত দেখার সময় লাখো জনতার উপচেপড়া ভিড়ও দেখেছেন। শহীদ পিতার জনপ্রিয়তা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করা ১৬ বছর বয়সী শোকাতুর সেই কিশোর কি রাজনীতিতে পিতার উত্তরাধিকার বহনের অঙ্গীকার সেই দিনই বুকে ধারণ করেছিল? প্রিয় বাবার অকাল অস্বাভাবিক প্রয়াণ কি তার মনে গভীর কোনো আবেগ সৃষ্টি করেছিল? সাহসিকতা, দেশপ্রেম আর আত্মত্যাগের দীক্ষা কি সেই বয়সেই অবচেতন মনে গ্রহণ করেছিল অনন্য রোল মডেল পিতার কাছ থেকে?

www.pathagar.com

পিতৃহারা এই কিশোর ১০ মাস পরেই তার পিতার গড়া দলকে উৎখাত করে স্বৈরাচারী এরশাদের ক্ষমতা দখল ও সামরিক শাসন জারি প্রত্যক্ষ করল। তার বিধবা মা তখন নিতান্তই একজন গৃহবধূ হিসেবে তাকেসহ অনুজ আরাফাত রহমানকে আগলে রাখছেন। এরই মধ্যে তার ১৭ বছরের তরুণ বয়সে সে দেখল তার মা কি করে পরিস্থিতির চাপে পিতার গড়ে যাওয়া দলের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন শহীদ স্বামীর প্রতি দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে। দায়সারা গোছের দায়িত্ব গ্রহণ নয়। রীতিমত রাজপথে নেমে পড়লেন তার মা। তরুণ তারেক রহমানের চোখের সামনে তার মা খালেদা জিয়া গৃহবধূ তথা মা থেকে ধীরে ধীরে পরিণত রাজনীতিবিদে রূপান্তরিত হতে লাগলেন। মিছিলে নেতৃত্ব দিতে লাগলেন যার ফল হিসেবে পুলিশের লাঠিচার্জে নিগৃহীত হতে লাগলেন এমনকি গ্রেফতারসহ গৃহবন্দীত্ব বরণ করলেন।

সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করতে শুরু করলেন যার মাধ্যমে লক্ষ কোটি জনতা অনুপ্রাণিত হতে লাগল, জাগরণ সৃষ্টি হতে লাগল। স্বৈরাচারী এরশাদের দমনপীড়ন মোকাবেলা করতে লাগলেন তার মা অসীম ধৈর্য আর সাহসিকতার সঙ্গে। তরুণ তারেক রহমান আরো প্রত্যক্ষ করলেন কি করে তার মা স্বৈরশাসক এরশাদ তথা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ শেখ হাসিনার যৌথ কূটকৌশল বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মোকাবেলা করলেন ১৯৮৬ সালের নির্বাচনসহ স্বৈরশাসকের অধীনে সকল নির্বাচন বয়কট করে। আপসহীন নেত্রী হিসেবে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে আরোহণ করলেন তার মা তারই চোখের সামনে। তার মায়ের আত্মবিশ্বাসী ও আপসহীন নেতৃত্বে গড়ে ওঠা প্রবল গণআন্দোলনে অবশেষে স্বৈরশাসকের পতন হল যখন সে ২৫ বছরের টগবগে এক যুবক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯১ সালের নির্বাচনে তার মায়ের নেতৃত্বে তার পিতার গড়া দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী হল। সেই বিজয়ক্ষণে যুবক তারেক রহমান আনন্দে উদ্বেল হয়ে কি আনন্দাশ্রু ফেলেছিলেন? 'তোমার আদর্শের উত্তরাধিকার আমরা বয়ে নিয়ে যাব'—শহীদ পিতার উদ্দেশ্যে এমন কোন আশ্বাসবাণী কি উচ্চারণ করেছিলেন সেইদিন?

প্রথমে রাজপথের আন্দোলন সংগ্রামে বিজয় আর তার পর পর নির্বাচনে বিজয়। তার পিতার রাজনৈতিক উত্তরাধিকারে শুরু করলেও তার মা ততদিনে নিজের যোগ্যতা আর কঠোর পরিশ্রমের বলে পিতার গড়া দলের অবিসংবাদিত নেত্রী হিসেবে অভিষিক্ত হলেন ১৯৯১ সালে। তার সামনেই তার মা বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন।

যার বাবা ছিলেন রাষ্ট্রপতি তার কাছে সাধারণভাবে মায়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়া নতুন কোন অভিজ্ঞতা নয় বটে। তবে রাজনৈতিক উত্তরাধিকারে পিতার আদর্শকে প্রলম্বিত করতে পারার সার্থকতায় যুবক তারেক নিশ্চয়ই বিশেষ আপ্লুত হয়েছিলেন সেই দিনটিতে। শৈশব কৈশোর পেরিয়ে ততদিনে তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক ২৬ বছরের যুবক যিনি আর শুধু দেখেন না, ঘটনাবলীর কার্যকারণ বিশ্লেষণও করতে পারেন। মা রাষ্ট্র

www.pathagar.com

পরিচালনা করলেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত যে সময়ে সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে। নেপথ্যে থেকে আরো উৎসুক হয়ে মায়ের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কার্যক্রম নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করে কার্যকর অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন এই সময়কালে তারেক রহমান। বাবা রাষ্ট্রপতি থাকাকালে কিশোর বয়সের কারণে যা বোঝার সুযোগ হয়নি তার অনেক কিছুই মায়ের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে দেখা-শোনা এবং বোঝার সুযোগ হল।

এ সময়ে ১৯৯২ সালে তারেক রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে বাবার গড়া দলে প্রাথমিক সদস্য পদ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক জীবন যে নিয়তই উত্থান পতনের বৈচিত্র্যে ভরপুর তাও বুঝতে শিখলেন ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে মায়ের দলকে পরাজিত হতে দেখে। সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মা খালেদা জিয়াকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন সংগঠিত করতে দেখেছিলেন তরুণ বয়সে। কিন্তু এবার ত্রিশোর্ধ পরিণত যুবক বয়সে দেখলেন কি করে মা খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলের আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করতে হয়। ১৯৯১ - ৯৬ সময়কালে সরকারি দলের নেত্রী হিসেবে সংসদে মায়ের ভূমিকা দেখেছিলেন। এবার ১৯৯৬ - ২০০১ সময়কালে দেখলেন সংসদে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বে তারেক রহমান দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা শুরু করেন। বিশেষ তথ্য ও গবেষণা সেল স্থাপন করে তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক অভিনব কৌশল প্রয়োগ করে নির্বাচনী প্রচারণায় নতুনত্ব ও আধুনিকতা আনয়ন করেন যার ফলে সে নির্বাচনে তার পিতার গড়া দল মায়ের নেতৃত্বে তার সক্রিয় নেপথ্য অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

মা খালেদা জিয়া পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নির্বাচনে বিজয়ের পর তারেক রহমান সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকারে কোন দায়িত্ব গ্রহণ না করে বরং দলে কাজ করে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড হাতে কলমে শেখা তথা দলকে সংগঠিত করার কাজে মনোনিবেশ করেন। দলের কার্যক্রম মনিটরিং করার সুবিধার্থে একটি উপকারী ডাটাবেজ বা তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করেন তিনি। এছাড়াও তৃণমূলে জেলা-উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন প্রতিনিধি সম্মেলন সফলভাবে আয়োজন করে দল চাঙ্গা করার পাশাপাশি নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলিও সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হন।

২০০২ সালে দলের স্থায়ী কমিটির অনুমোদনক্রমে তিনি দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদে নিযুক্তি লাভ করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভের পর তিনি তার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড আরো বাড়িয়ে দেন এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক বিরোধ ও নিষ্ক্রিয়তা চিহ্নিত করে তা সমাধানে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। মা প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

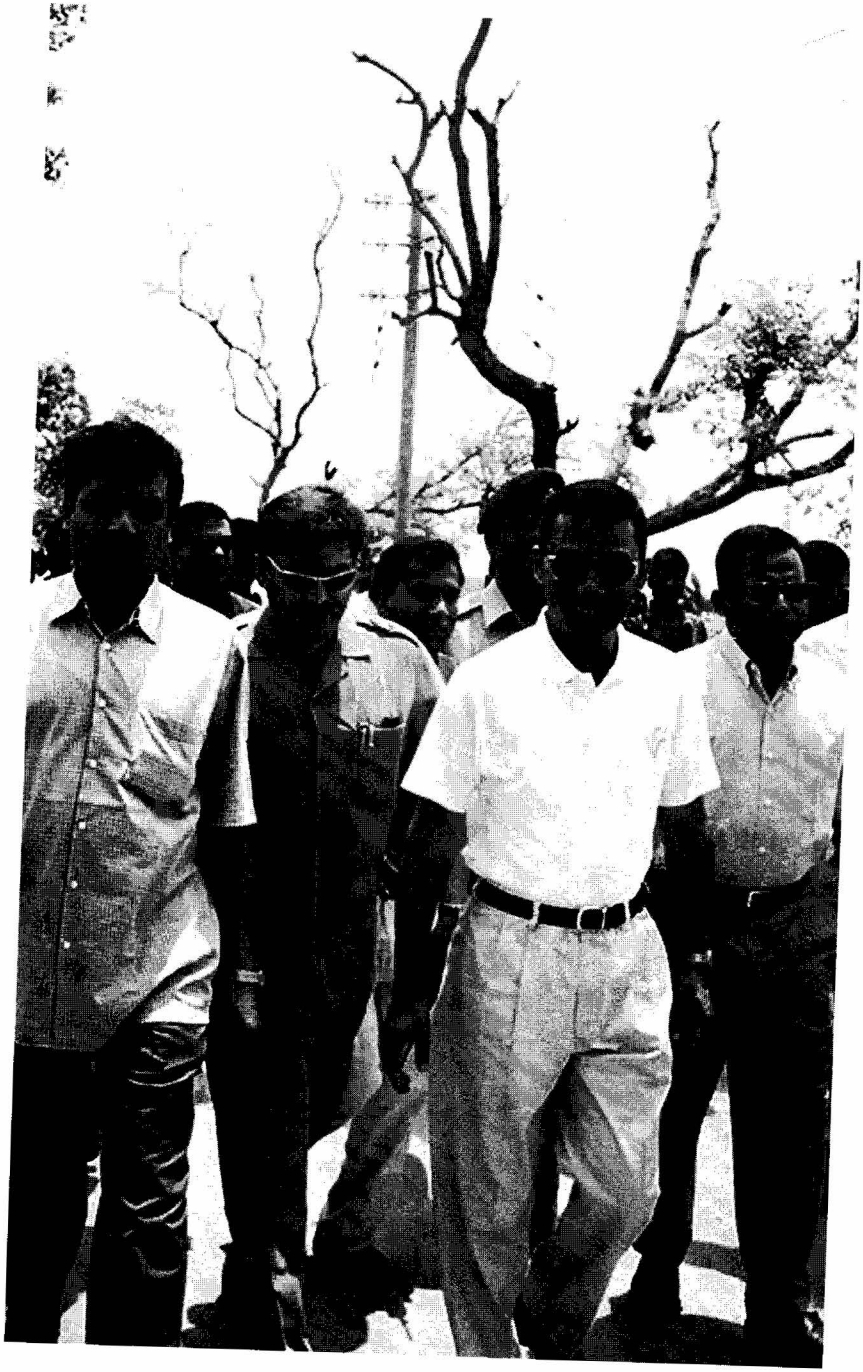

www.pathagar.com

হিসেবে সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকলেও তারেক রহমান সেই নেতৃত্বের ঘাটতি অনেকটাই সামলে নেয়ার চেষ্টা করেন। রাজনীতিবিদ হিসেবে ২০০১ থেকে ২০০৬ সময়কালটি তারেক রহমানের জীবনে সক্রিয়তা ও হাতে কলমে শিক্ষার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচিত হবে।

রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন রাজনৈতিক দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে কাজ করতে গিয়ে একদিকে যেমন তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও সাড়া জাগাতে সক্ষম হন তেমনি আশ্চর্যজনকভাবে প্রবল প্রতিকূলতা ও অপপ্রচারের শিকার হন দলের ভেতরে এবং বাইরে। নবীন রাজনীতিবিদ হিসেবে তাকে দলের ভেতরের কোন কোন অংশ হয়ত তাদের প্রথাগত রাজনৈতিক অবস্থানের জন্যে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে তার বিরুদ্ধে গোপনে বা অপ্রকাশ্যে অপপ্রচার চালিয়েছে। কোথাও কোথাও তিনি নতুন কোন ধারণা প্রয়োগ করতে গিয়েও প্রাচীনপন্থী কোন কোন অংশের বিরাগভাজন হয়েছেন এমনকি কখনো কখনো প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। আর দলের বাইরে তো তার সক্রিয় রাজনৈতিক পদচারণা আরো প্রবলভাবে সমালোচনা, অপপ্রচার ও বিরোধের মুখোমুখি হয়েছে। তার পিতার গড়া দলের ঐতিহাসিক প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগ সকল প্রকার ভব্যতার সীমা অতিক্রম করে তার চরিত্র হননের অবিরাম প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যোগ দেয় বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় সংবাদ মাধ্যম যারা তারেক রহমানের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে ভিত্তিহীন নানা কল্পকাহিনী প্রচার করে তাকে বিব্রত ও হেয়প্রতিপন্ন করার নোংরা খেলায় লিপ্ত হয়। ঐতিহাসিক ভাবেই প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিএনপি সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করার উদারনীতিতে বিশ্বাস করার কারণে এই দায়িত্বজ্ঞানহীন অপপ্রচার বাধাহীনভাবে জনমনে কিছুটা হলেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। নাৎসী হিটলারের প্রচার মন্ত্রী গোয়েবলস-এর বিখ্যাত মিথ্যা বারবার বলতে থাকার তত্ত্ব প্রয়োগ করেছিল মুখচেনা নেতৃস্থানীয় কিছু সংবাদ মাধ্যম। তারা তাদের এই হীন প্রচেষ্টায় কিঞ্চিৎ সাফল্যও লাভ করে।

তিনি তার স্বভাবসুলভ ধৈর্য ও ভদ্র বিনয়ী আচরণ দিয়ে সুসংগঠিত এই অপপ্রচারের মোকাবেলা ও কিছু কিছু জবাব দিলেও ষড়যন্ত্রকারীদের জোট নিষ্ঠুরভাবেই তাকে প্রধান টার্গেটে পরিণত করে। পিতার আদর্শের উত্তরাধিকার স্বাধীনভাবে নিজের কাঁধে তুলে নেবার পূর্বেই তাকে রাজনৈতিকভাবে কিংবা প্রয়োজনে শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ষড়যন্ত্রকারীদের জোট। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রবর্তিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শকে পরের প্রজন্মে প্রবাহিত করতে তারেক রহমান সম্ভাবনাময় নেতা হিসেবে গড়ে উঠছেন এই সত্যটি উপলব্ধি করেই চিরপ্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগসহ তাদের দেশীয় দোসর ও আন্তর্জাতিক প্রভুরা সম্মিলিতভাবে এই সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রে সর্বশক্তি

www.pathagar.com

নিয়োগ করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির ঘটনা প্রবাহ সৃষ্টি করা হয় যেখানে তারেক রহমান ও তার মা প্রধান টার্গেট হিসেবে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হন। এমনকি তাদের উভয়ের প্রাণনাশের অপচেষ্টাও ছিল বলে জানা যায়।

শৈশবে রাজনীতির পাঠশালায় ভর্তি হওয়া তারেক রহমান ২০০২ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে তার পাঠক্রমের সবচেয়ে মূল্যবান ও বিপজ্জনক অধ্যায় পাঠরত ছিলেন বলে বিজ্ঞজনদের মন্তব্য করতে শুনেছি। আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি সকল অশুভ ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও প্রাণে বেঁচে আজ বিদেশে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। দলের বিগত কাউন্সিলে ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল্যায়ন হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে তিনি দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন সর্বসম্মতভাবে। এত দীর্ঘ সময় ধরে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ এবং পরিকল্পিত উপায়ে প্রস্তুতি শেষে সক্রিয় রাজনীতিতে পিতা-মাতার মতই ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে কঠোর পরিশ্রম ও নিজের যোগ্যতায়ই তাকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। উত্তরাধিকারে তার রাজনীতির শুরুটা কেবল হতে পেরেছে কিন্তু পূর্বসূরী পিতা-মাতার মত সাফল্য অর্জন করতে হলে শৈশব থেকে অর্জিত জ্ঞান ও প্রিয়-অপ্রিয় সকল অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে পদে পদে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে তাকে প্রতিনিয়ত। দেশের মানুষের গভীর ভালোবাসা এবং পিতামাতার কালজয়ী আদর্শ হোক তার আগামী দিনগুলোতে পথ চলার পরম পাথেয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সহায় হোন—এই দোয়া করি।

বিএনপি'র সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের ২য় কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে আমার দেশ, নয়াদিগন্ত, সমকাল, দিনকাল, সংগ্রাম প্রভৃতি জাতীয় দৈনিকে বিএনপি কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে ছাপা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে

www.pathagar.com

তারেক রহমানের ভবিষ্যৎ
দলীয় নেতা থেকে রাষ্ট্রনায়ক

দলীয় নেতা অনেকেই থাকেন, সবাই রাষ্ট্রনায়ক হন না বা হতে পারেন না। সেই সম্ভাবনা সবার থাকে না, সেই জনপ্রিয়তা বা গ্রহণযোগ্যতাও সবাই অর্জন করে উঠতে পারেন না এক জীবনে। তারেক রহমানের যে রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার অনন্য সম্ভাবনা রয়েছে সে কথাটি তার ঘোর শত্রুও স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করেন না। কারণ তিনি বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বিগত জাতীয় কাউন্সিলে। গঠনতান্ত্রিকভাবে তিনি বিএনপির দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা হিসেবে দলীয় নেতাকর্মীদের মাঝে বিপুলভাবে জনপ্রিয়। এর আগে তিনি দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে কাজ করেছেন বেশ কয়েক বছর সাফল্যের সঙ্গে।

সে সময়ে দলীয় কার্যক্রমে সার্বক্ষণিকভাবে শ্রম দিয়েছেন এবং তৃণমূল পর্যায়ে দলকে সুসংগঠিত করতে অবদান রেখেছেন। তারও আগে বগুড়া জেলা বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলেন একজন প্রাথমিক সদস্য হিসেবে। দলীয় রাজনীতির পাঠশালায় তার শিক্ষা লাভ ঘটেছে একেবারে তৃণমূল থেকে ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে। উঠে এসেছেন দলের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতৃত্বের আসনে নিজের যোগ্যতা আর গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে।

তদুপরি দলের প্রতিষ্ঠাতা মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে কালজয়ী রাজনৈতিক ঐতিহ্যের এক অনন্য উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন তিনি। পিতাকে দেখেছেন সেই কাঁচা শৈশবে, কেমন করে দেশপ্রেমিক পিতা সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণ করলেন, কেমন করে বীরত্বের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সূচনা করলেন নিজের জীবন বিপন্ন করে এবং তাকেসহ পুরো পরিবারকে সমূহ বিপদের মাঝে ফেলে রেখে গিয়ে। পিতার কাছ থেকে দেশপ্রেমের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণের জন্য এর চেয়ে উত্তম উপায় আর কি হতে পারত?

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন পিতা যখন বীরবিক্রমে যুদ্ধরত তখন তিনি মায়ের হাত ধরে এখান থেকে সেখানে ছুটে বেড়াচ্ছেন। প্রথমে চট্টগ্রামেই চাচাতো নানার বাসায় কিছুদিন, সেখান থেকে লঞ্চে করে নারায়ণগঞ্জ হয়ে ঢাকায় বড় খালার বাসায়, তার কিছুদিন পর সিদ্ধেশ্বরীতে আরেক পরিচিতজনের বাসায় আত্মগোপনে ছিলেন মায়ের সঙ্গে। বয়স তখন তার কতইবা হবে? মাত্র ৫ বছরের শিশু মায়ের হাত ধরে অবোধ

www.pathagar.com

ছোট ভাইকে সঙ্গে করে অবশেষে পাকবাহিনীর হাতে আটক হলেন ১৯৭১ সালের মে মাসে এবং বন্দিশালায় কাটিয়ে এলেন ১৬ ডিসেম্বর তারিখের চূড়ান্ত বিজয়ের দিন অবধি। কচি শৈশবেই সাড়ে সাত মাসব্যাপী বন্দিত্ব যাপনের অভিজ্ঞতা তার শিশু মানসে গভীর ও সুদূরপ্রসারী কোন ছাপ নিশ্চয় ফেলেছিল।

জাতীয়তাবাদের পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ নয় বরং কণ্টকে ভরপুর তা হয়ত বুঝে গিয়েছিলেন সেই শৈশবেই। স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য যখন তার পিতা বীরউত্তম খেতাবে ভূষিত হলেন, তখন তার খুব গর্ব হল। পিতার কৃতিত্বে কার না গর্ব হয়? শৈশবে হয়ত তখনই তার শিশুমনে পিতার মত করে দেশের জন্য কাজ করার অদম্য বাসনা জাগ্রত হয়েছিল। শৃঙ্খলায় বাঁধা পারিবারিক জীবনে বেড়ে উঠতে লাগলেন শিশু তারেক রহমান পেশাদার, নিষ্ঠাবান ও সৎ পিতার সান্নিধ্যে। স্কুলের বাধা ধরা শিক্ষার পাশাপাশি শিখতে লাগলেন পিতা-মাতার কাছ থেকে জীবনের মূল্যবোধগুলো, যেমন করে শেখে আর দশটা শিশু তাদের পরিবারের কাছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখের দুঃখজনক হত্যাযজ্ঞ ঘটার পর অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হল দেশে এবং সেনাবাহিনীতে। আওয়ামী লীগেরই একটি বৃহৎ অংশ খন্দকার মুশতাক আহমদের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করল তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। সেনাবাহিনীতে তখন নির্দেশসূত্র বা চেইন অফ কমান্ড একেবারেই ভেঙে পড়েছে। একদিকে শেখ মুজিব হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা যারা খন্দকার মুশতাক অনুসারী হিসেবে বঙ্গভবনে অবস্থান নিয়েছে, অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অনুসারীরা ঢাকা সেনানিবাসে যুদ্ধংদেহী অবস্থানে, আরেকদিকে কর্নেল তাহেরের অনুসারীরা গণসংগঠনের মতো স্লোগান দিয়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রকাশ্য বিবাদে লিপ্ত।

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীতে পাল্টা অভ্যুত্থান সংঘটিত হলে জিয়াউর রহমান গৃহবন্দি হলেন। আবার কয়েকদিনের মধ্যেই ৭ নভেম্বরে সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্ত হলেন এবং এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে দেশে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মত গুরুদায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন। এ সময়ে ঘটে যাওয়া সবকিছু ভালোমত বিশ্লেষণ করার এবং বোঝার বয়স যে তখন তারেক রহমানের হয়নি তা সত্য হলেও বিরাজমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিলেন তিনি। বিপদের মধ্যে পলায়নপর না হয়ে অবিচল সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার যে অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন বীর পিতার চরিত্রে, তা সেই শৈশবে মাত্র ১০ বছর বয়সে তার মানসে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল।

দায়িত্ব গ্রহণের পর জিয়াউর রহমান দেশে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা নিরসন করে সেনাবাহিনীতে এবং দেশের প্রশাসনের সর্বস্তরে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৮ সালে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন তিনি। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে

www.pathagar.com

থাকেন। বাকশালের দমবন্ধ একদলীয় শাসনব্যবস্থা অবসান করে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করেন, বন্ধ করে দেয়া সব সংবাদপত্রকে পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দেন, প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল—বিএনপি। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, মহিলা, তাঁতিসহ সব শ্রেণী-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করেন।

বন্ধ কল-কারখানা চালু করেন, কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পতিত অনাবাদী জমি চাষের অন্তর্ভুক্ত করেন, সেচ সুবিধা সপ্রসারণের লক্ষ্যে খাল কাটা কর্মসূচি শুরু করেন, সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করতে থাকেন। নিজে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে অতি দ্রুত জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দেশজুড়ে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রনায়ক পিতার ছায়ায় থেকে কিশোর তারেক রহমান কি তখন থেকেই তৈরি হচ্ছিলেন ভবিষ্যতের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে? পিতার আদর্শ, সৎ-সাদাসিধে জীবনযাপন, অতুলনীয় দেশপ্রেম আর কঠোর পরিশ্রমের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিলেন তিনি।

১৯৮১ সালের ৩০ মে তার পিতা যখন কতিপয় বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার হাতে শাহাদাৎ বরণ করলেন তখন তারেক রহমান ১৫ বছরের এক কিশোর মাত্র। ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন প্রাণপ্রিয় পিতাকে অকালে হারিয়ে। পিতার লাশের ওপর মায়ের আছড়ে পড়া কান্না আর অনুজ কোকোর চিৎকার করে কান্না তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল সেই কৈশোরে। পিতার জানাজায় সমবেত লাখ লাখ লোকের অশ্রু বিসর্জন তাকে আবেগাপ্লুত করে তুলেছিল। ক্রন্দনরত মায়ের কাছে শুনেছিলেন তৎকালীন সেনাপ্রধান এরশাদ তার পিতার হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য ষড়যন্ত্রকারী। প্রমাণ দেখতে পেলেন পরের বছরই যখন এরশাদ তার পিতার গড়া দলকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করল।

স্বৈরাচারী এরশাদ তার পিতার গড়া দলকে ভেঙেচুরে নিঃশেষ করে দেয়ার উপক্রম করলে একপর্যায়ে মা বেগম খালেদা জিয়া ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দলটিকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সে সময়ে গৃহবধূ মায়ের পিঠে হাত রেখে কিছুটা সাহস কি জুগিয়েছিলেন তারেক রহমান? শহীদ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার মা দেশকে আর দেশের মানুষকে ভালোবেসে নিজের আরাম-আয়েশ এবং স্বাভাবিক সংসার জীবন তুচ্ছ করে রাজপথের আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আর স্বৈরাচারী এরশাদকে উৎখাতের লক্ষ্যে। দীর্ঘ ৯ বছরের আপসহীন আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বৈরাচারী এরশাদের পতন ঘটল, তার মা বেগম খালেদা জিয়া হয়ে উঠলেন এক পরিণত রাজনৈতিক নেত্রী। দেশের মানুষ তার মাকে ভালোবেসে দেশনেত্রী উপাধিতে ভূষিত করল এবং ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিপুলভাবে বিজয়ী করল। বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

www.pathagar.com

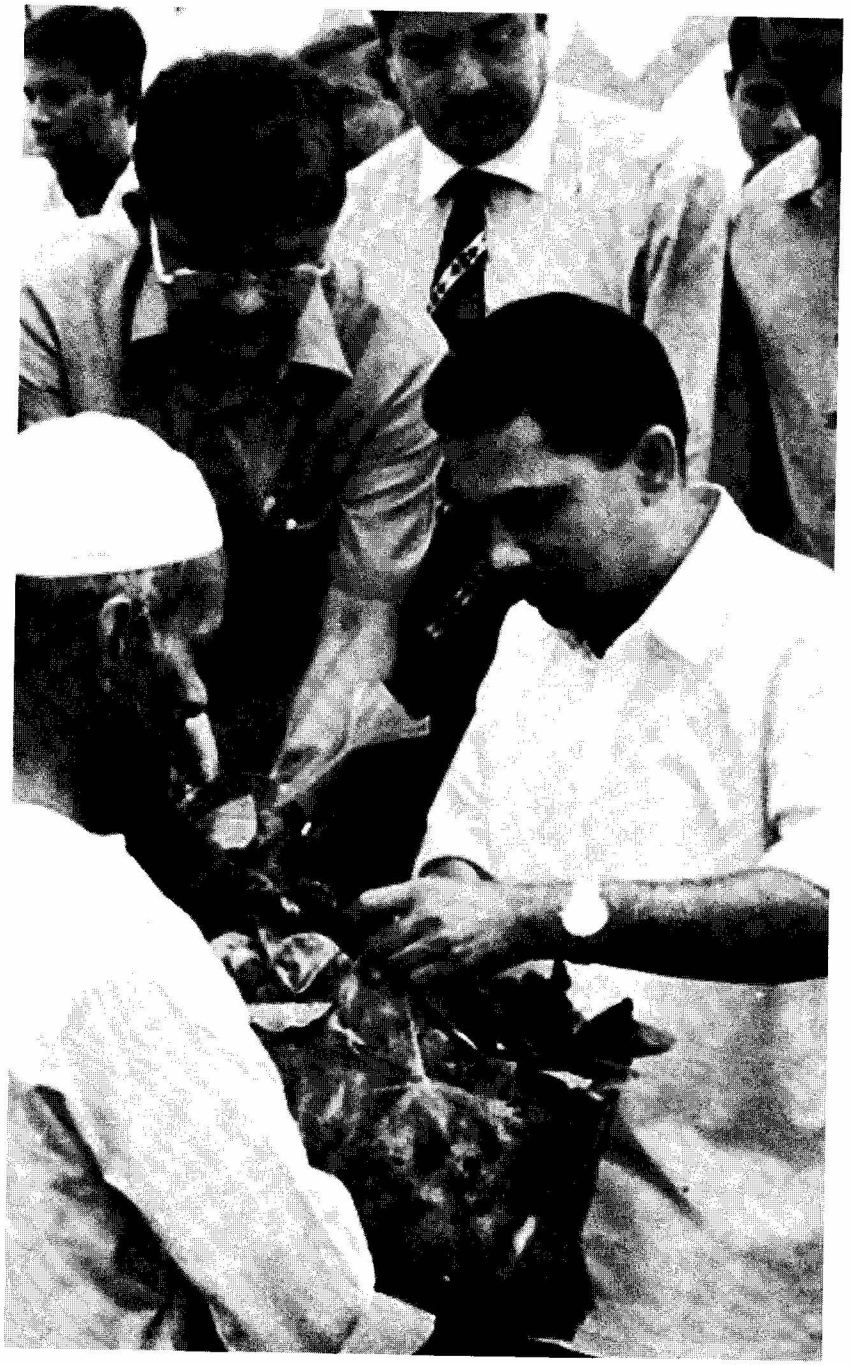

www.pathagar.com

পিতা যখন রাষ্ট্রনায়ক তখন তারেক রহমানের বয়স অনেক কম ছিল বলে অনেক কিছু বোঝেননি। কিন্তু মা যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন তখন তিনি ২৫ বছরের যুবক হিসেবে অনেকটাই পরিণত হয়েছেন। অনেক কিছু তিনি দেখেন, দেখে দেখে শেখেন আর কিছু কিছু নিজে থেকে বোঝেনও। মা খালেদা জিয়া এ সময়টাতে খুব ভালো কিছু কাজ করলেন। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করা, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, দশম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের জন্য বিনা বেতনে পড়ার সুযোগসহ উপবৃত্তি চালু করা প্রভৃতি এ সময়ে তার মায়ের অনেক ভালো কাজের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তারেক রহমান বেশ কাছ থেকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করলেন মায়ের ১৯৯১ - ৯৬ সময়ের শাসনকাল। এ সময়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আওয়ামী লীগসহ অন্য বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার সরকার যখন একঘরে হয়ে পড়ে তাও তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। রাজনীতির মাঠের সুবাতাসের পাশাপাশি বৈরী ঝড়ো হাওয়ার দাপটও দেখলেন, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে আরও পরিণত হলেন তারেক রহমান।

১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে বিএনপি বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সরকারি দলের অভিজ্ঞতা হয়েছিল ১৯৯১ - ৯৬ সময়কালে, বিপরীতে বিরোধী দলের ভূমিকা কেমন হতে পারে তার ধারণা পেলেন ১৯৯৬ - ২০০১ সময়কালে। তার মা বেগম খালেদা জিয়া এ সময়টাতে সংসদে এবং রাজপথে যুগপৎ আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলেন আওয়ামী অপশাসনের বিরুদ্ধে। ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় ঐক্যজোট দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিজয়ী হয় এবং সরকার গঠন করে। ৩৫ বছরের যুবক তারেক রহমান এই অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার কাজে কাছাকাছি থেকে অনেক কিছু শেখেন, বিশেষ করে নির্বাচনের প্রচারণা কার্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার কর্মকুশলতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও নির্বাচনী প্রচার কার্যে অভিনবত্ব ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয় সর্বমহলে এবং দলের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে তিনি এ সময়েই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপিতে ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে জিয়া পরিবার। ১৯৮১ সালে দলটির প্রতিষ্ঠাতার অস্বাভাবিক প্রয়াণের পর তার গৃহবধূ স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভাঙনে বিপর্যস্ত দলের হাল ধরেছিলেন এবং দলে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রীতিমত এক নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন। তেমনিভাবে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষায় তারেক রহমানের আগমন বার্তাও ছিল এক অতীব সুসংবাদস্বরূপ। কিন্তু

www.pathagar.com

দুর্ভাগ্যজনকভাবে নতুন প্রজন্মের প্রতীক তারেক রহমানের সম্ভাব্য উত্থান বিরোধী রাজনীতির খেলোয়াড়দের ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে। পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তিগুলো যারা বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধারাকে ভয় পায় বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ধ্বংস করতে চায়, তারাও বেশ নড়েচড়ে বসে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সবচেয়ে সম্ভাবনাময় নেতা তারেক রহমানকে তাই দেশি-বিদেশি কুচক্রী শক্তি তাদের অভিন্ন স্বার্থ হাসিলের প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে আক্রমণের মূল লক্ষ্যে পরিণত করে। নানা ভিত্তিহীন অপবাদ দিয়ে তার নিষ্কলুষ চরিত্রে কালিমা লেপন করার অব্যাহত অপচেষ্টা চলতে থাকে।

নানাবিধ দায়িত্বজ্ঞানহীন অপপ্রচারে লিপ্ত হয় দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিভূ চিহ্নিত কিছু গণমাধ্যমসহ জাতীয়তাবাদবিরোধী রাজনৈতিক শত্রুরা। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির বায়বীয় গল্প ছড়ানো হয় একের পর এক, যদিও আজ পর্যন্ত কোন একটি ক্ষেত্রেও তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোন অভিযোগই প্রমাণ করা যায়নি। ষড়যন্ত্রের একপর্যায়ে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সৃষ্টি করা হয় পরিকল্পিতভাবে, যার মাধ্যমে জিয়া পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়। তারেক রহমানকে গ্রেফতার করে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে তার মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে দেয়া হয় এবং তার বিরুদ্ধে নানা ভিত্তিহীন মামলা রুজু করা হয়। তার মা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করে সপরিবারে দেশত্যাগের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হলেও দেশনেত্রী নিজে দেশত্যাগের চাপকে অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তারেক রহমানকে চিকিৎসার জন্য ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে লন্ডনে পাঠানো হয়। এখনও তিনি সেখানে তার মেরুদণ্ডের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা গ্রহণ করছেন।

তার অনুপস্থিতিতেই বিগত জাতীয় কাউন্সিলে দলের কাউন্সিলররা তাকে দলের দ্বিতীয় শীর্ষ পদে নির্বাচিত করেন। অতিসম্প্রতি ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় তাকে জড়ানো হয়েছে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে। উদ্দেশ্য একটাই, রাজনীতির মাঠ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা।

৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে তারেক রহমানের তৃতীয় কারামুক্তি দিবস। দলের সব নেতাকর্মী তাকে আগামী দিনে শীর্ষ নেতৃত্বের আসনটিতে বরণ করে নেয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। কারণ তিনিই তো দলের ঐক্যের প্রতীক, ভবিষ্যৎ কাণ্ডারি ও আগামী দিনের আলোর দিশা। যার বাবা মহান স্বাধীনতার ঘোষক ও বাংলাদেশের জনপ্রিয়তম রাষ্ট্রনায়ক, যার মা ছিলেন তিন-তিনবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, স্বাভাবিকভাবেই তার সুযোগ্য নেতৃত্বের পূর্ণাঙ্গ স্বাদ পাওয়ার অপেক্ষায় আছে এই দেশের আপামর জনসাধারণ।

৪৫ বছরের ঘটনাবহুল জীবনের ধাপে ধাপে যে অমূল্য শিক্ষা ও অম্ল-মধুর-তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন, তা হোক তার আগামী দিনগুলোতে পথ চলার

www.pathagar.com

পাথেয়। যে ত্যাগ-তিতিক্ষা তিনি স্বীকার করেছেন রাজনীতিতে পিতা-মাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তা তাকে এরই মধ্যে সাচ্চা রাজনীতিবিদে পরিণত করেছে। এখন প্রতীক্ষা সবার, কবে তিনি হয়ে উঠবেন বাংলাদেশের আগামী প্রজন্মের রাষ্ট্রনায়ক। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে তিনি যথাশিগগির ফিরে আসুন দেশের মাটিতে। রাজনীতির মাপকাঠিতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার যোগ্যতা ও সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি আর কার আছে?

বিএনপি'র সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের ৩য় কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে আমার দেশ, নয়াদিগন্ত, যুগান্তর, দিনকাল, সংগ্রাম প্রভৃতি জাতীয় দৈনিকে বিএনপি কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে ছাপা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে

www.pathagar.com

তাঁতশিল্পের সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা

ভূমিকা : আমরা সবাই জানি, কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবেই তাঁতপ্রধান দেশও বটে। আবহমান কাল ধরে কৃষির বাইরে শিল্প বলতে তাঁতশিল্পই ছিল এদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি অর্থনৈতিক খাত। তাঁতশিল্পের উৎকর্ষ এদেশে এতটাই ঘটেছিল যে, এর সুনাম উপমহাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐতিহ্যবাহী অনন্য তাঁতজাত পণ্য মসলিনের জগৎজোড়া খ্যাতি আমরা আজও গর্বভরে স্মরণ করে থাকি। তৎকালের বাংলার স্থানীয় গুণী তাঁতীদের সৃষ্টি মসলিন কাপড় নাকি এতটাই সূক্ষ্মভাবে বোনা হত যে, একটি সম্পূর্ণ মসলিন শাড়ি একটি ক্ষুদ্র ম্যাচ বাক্সে পুরে ফেলা যেত বলে কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। পরে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের বেনিয়া স্বার্থে টেক্সটাইল মিলে উৎপাদিত কাপড় দিয়ে বাজার দখলের চেষ্টায় আমাদের গুণী তাঁতীদের নানাভাবে নিপীড়ন-নির্যাতনসহ তাদের আঙ্গুল কেটে নেয়ার কথাও ইতিহাসে বর্ণিত শুনতে পাই।

অতএব ব্রিটিশ আমল থেকেই আমাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প সরকারের কাছ থেকে আনুকূল্যের বদলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিকূলতাই উপহার হিসেবে পেয়ে এসেছে। নানা যুগে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা ছাড়াও সরকার এবং রাষ্ট্রসৃষ্ট নানা ধরনের প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে আমাদের সংগ্রামী তাঁতী ভাই ও বোনেরা এই তাঁতশিল্পকে টিকিয়ে রেখেছেন আজ পর্যন্ত। দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে এমনকি বিদেশে রফতানিও করছেন তাঁতজাত পণ্য। তাঁতশিল্পের এই ঐতিহ্যের হাত ধরেই হয়ত বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের শেষভাগে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছিল গার্মেন্ট শিল্প। হাঁটি হাঁটি পা পা করে যা আজ সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশের প্রধান রফতানি পণ্যে পরিণত হয়েছে।

গার্মেন্ট শিল্পের রফতানি বাজার দখলের বিপরীতে সরকার এবং রাষ্ট্র থেকে যে পরিমাণ নীতি-সহায়তা দেয়া হয়ে থাকে, তার ভগ্নাংশও পায় না আমাদের তৃণমূল পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত দেশীয় তাঁতশিল্প। আমাদের তাঁতশিল্প মূলত দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদা পূরণে কাজ করে থাকে আবহমান কাল থেকে। বাংলার আপামর জনসাধারণের পরনের লুঙ্গি, ফতুয়া, শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, গামছা, তোয়ালে, বিছানার চাদর, গায়ের চাদর ইত্যাদি এখনও আমাদের

www.pathagar.com

এই তাঁত শিল্প থেকেই সরবরাহ হয়ে থাকে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা— এই পাঁচটি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের অন্যতম বস্ত্র সরবরাহকারী খাত তাঁতশিল্পের প্রতি বর্তমান সরকারের অব্যাহত অবহেলা এই শিল্পের অস্তিত্বকেই আজ সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছে।

তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা : বাংলাদেশের তাঁতশিল্পকে দেখভাল করার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড। ২০০৩ সালে করা সর্বশেষ তাঁতশুমারি অনুযায়ী সারাদেশে ছোট-বড় মিলিয়ে তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ লাখ ৮৩ হাজার ৫১২টি। তাঁতের সংখ্যা ৫ লাখ ৫ হাজার ৫৫৬টি। যার মধ্যে চালু তাঁতের সংখ্যা ৩ লাখ ১৩ হাজার ২৪৫টি এবং বন্ধ তাঁতের সংখ্যা ১ লাখ ৯২ হাজার ৩১১টি। অর্থাৎ শতকরা ৩৮ ভাগ তাঁত বন্ধ সরকারিভাবে করা ২০০৩ সালের তাঁতশুমারি অনুযায়ীই। একই শুমারি অনুযায়ী সারাদেশে তাঁতীর সংখ্যা সে সময়ে ছিল ৮ লাখ ৮৮ হাজার ১১৫ জন। যার মধ্যে পুরুষ তাঁতীর সংখ্যা ৪ লাখ ৭২ হাজার ৩৬৭ জন এবং মহিলা তাঁতীর সংখ্যা ৪ লাখ ১৫ হাজার ৭৪৮ জন। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সংজ্ঞা অনুসারে ২০টির অধিকসংখ্যক তাঁত যে প্রতিষ্ঠানে রয়েছে, তাকে তাঁতশিল্প কারখানা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এমন ২৪৬টি তাঁতশিল্প কারখানা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডে হালনাগাদ নিবন্ধিত রয়েছে বলে তাঁত বোর্ডের ওয়েবসাইট সূত্রে জানা যায়।

তাঁতী ও তাঁতশিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে ১ হাজার ৩১৪টি প্রাথমিক (প্রাইমারি) তাঁতী সমিতি রয়েছে। এছাড়া ৫৮টি মাধ্যমিক (সেকেন্ডারি) তাঁতী সমিতি রয়েছে। আর এদের সবার সমন্বয়ের জন্য রয়েছে একটি শীর্ষ (এপেক্স) তাঁতী সমিতি, যার নাম জাতীয় তাঁতী সমিতি। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী, দেশীয় তাঁতশিল্প অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার ৪০ ভাগ জোগান দিয়ে থাকে। এ শিল্পের বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৮৩ কোটি মিটার। জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বেশি বলে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটিতে প্রদত্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। তাদের হিসাবমতে, তাঁতশিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লাখ লোক কর্মরত রয়েছে। তাদের মতে, গ্রামীণ কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে কৃষির পরেই তাঁতশিল্পের স্থান। অভ্যন্তরীণ চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ মেটানোর পরও তাঁতজাত পণ্য রফতানি হচ্ছে বলে এই সরকারি প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে, যার পরিমাণ ২০০৯ এবং ২০১০ এই দুই বছরে ৬৮ লাখ মার্কিন ডলারেরও বেশি।

তাঁতশিল্পের অন্যতম প্রধান আরেকটি খাত হচ্ছে রেশম শিল্প, যার দেখভালের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলাদেশ রেশম বোর্ড। রেশম বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, বেসরকারি খাতে রেশম তাঁত কারখানা রয়েছে বর্তমানে ৭০টি এবং সরকারি মালিকানায় রাজশাহীতে ১টি ও ঠাকুরগাঁওয়ে ১টি মোট ২টি রেশম

www.pathagar.com

কারখানা রয়েছে। সরকারি রেশম কারখানা ২টিই বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। একই সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, বর্তমানে রেশম খাতে কর্মসংস্থানের সংখ্যা মোট ৭ লাখ, যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২ লাখ ১০ হাজার এবং মহিলার সংখ্যা ৪ লাখ ৯০ হাজার। একই তথ্যমতে, বর্তমানে দেশের ১৬৭টি উপজেলায় রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ হয়েছে। রেশম শিল্পের দুটি খাত—একটি হচ্ছে রেশম চাষ এবং দ্বিতীয়টি হল রেশম সুতা উৎপাদন করে কাপড় তৈরি করা। রেশম চাষ এবং রেশম বুনন করে দেশজুড়ে ব্যাপক কর্মসংস্থান সম্ভব হলেও যথাযথ সরকারি উদ্যোগের অভাবে এই খাতটির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি এখন পর্যন্ত।

সরকারি তথ্য হালনাগাদ নয় বলে আমাদের তাঁতী দলের নিজ উদ্যোগে আমরা দেশজুড়ে তাঁতশিল্পের তথ্য সংগ্রহ ও হালনাগাদ করেছি। আমাদের তথ্যমতে, বর্তমানে সারাদেশে ৮ লাখ হস্তচালিত এবং ৫ লাখ বিদ্যুৎচালিত মোট ১৩ লাখ তাঁত রয়েছে। এর মধ্যে অর্ধেক তাঁত অর্থাৎ ৬ লাখ ৫০ হাজার তাঁতই বন্ধ রয়েছে। তুলাজাত তাঁত ও রেশম উভয় খাত মিলে প্রত্যক্ষভাবে ৭৫ লাখ তাঁতী কর্মরত রয়েছে। এর মধ্যে রেশম খাতে ১০ লাখ এবং তুলাজাত তাঁতে ৬৫ লাখ পুরুষ ও মহিলা কর্মরত আছেন সারাদেশে। এ সংক্রান্ত তথ্য সরকারিভাবে হালনাগাদ করার জন্য অনতিবিলম্বে জাতীয় পর্যায়ে একটি তাঁতশুমারি পরিচালনা করা জরুরি বলে আমরা মনে করি। আমাদের তথ্যমতে, দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার শতকরা ৬৫ ভাগই দেশীয় তাঁতশিল্প জোগান দিয়ে থাকে। তাঁত মালিক, শ্রমিক, বিনিয়োগকারী, মধ্যস্বত্বভোগী, সরবরাহকারী, বিপণনকারী ও তাদের নিজ নিজ পরিবারের সদস্যসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁতশিল্পের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন আমাদের হিসাবমতে কমপক্ষে ২ কোটি ৭৫ লাখ জন। অর্থাৎ আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২০ ভাগ লোক এ শিল্পের সঙ্গে জীবন-জীবিকায় নানাভাবে জড়িয়ে আছেন।

বাংলাদেশের তাঁতশিল্প মূলত ছড়িয়ে আছে নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, পাবনা, ঢাকা, কুমিল্লা, কক্সবাজার, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান প্রভৃতি জেলায়। তাঁতবহুল এই জেলাগুলো ছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে তাঁতশিল্প রয়েছে আরও কিছু জেলার কিছু কিছু অংশে—যেমন নওগাঁ, গোপালগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বগুড়া, সিলেট, রাজবাড়ী, চুয়াডাঙ্গা, শরীয়তপুর, বাগেরহাট, জয়পুরহাট, শেরপুর, মানিকগঞ্জ, জামালপুর, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও যশোর।

তাঁতশিল্পকে সহায়ক সুবিধা দেয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের রয়েছে ৩০টি বেসিক সেন্টার। এছাড়া কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ১টি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে ১টি মোট ২টি সার্ভিস ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে ১টি টেক্সটাইল প্রসেসিং সেন্টার, নরসিংদীর মাধবদীতে ১টি ক্লথ প্রসেসিং সেন্টার রয়েছে, যেখান থেকে দেশীয় তাঁতশিল্পকে প্রযুক্তিগত ও কারিগরি

www.pathagar.com

সেবা—যেমন ডাইং, প্রিন্টিং, ওয়াশিং, ক্যালেন্ডারিং, টুইস্টিং, সাইজিং ইত্যাকার নানা ধরনের সেবা দেয়ার কথা থাকলেও অব্যবস্থাপনা, বন্ধ থাকা, জনবলের অভাব, বাজেট বরাদ্দ না পাওয়া, যন্ত্রপাতি নষ্ট থাকা প্রভৃতি কারণে যথাযথ সেবা পাওয়া যায় না বলে তাঁতীরা অভিযোগ করে থাকেন। আরও রয়েছে নরসিংদীতে, পাবনার বেড়ায় এবং সিলেটের খাদিমনগরে ১টি করে মোট ৩টি তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যেগুলো থেকে তাঁতীদের নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে আরও দক্ষ ও হালনাগাদ প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করে তোলার কথা। কিন্তু তাঁতশিল্পে সহায়ক সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রদত্ত উপরে বর্ণিত সব সহায়তা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল, অনিয়মিত এবং অনাধুনিক বা পুরনো ধাঁচের হওয়ায় তাঁতশিল্প এগুলো থেকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উপকৃত হতে পারছে না।

অন্যদিকে, দেশজুড়ে বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের ৫টি আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ৭টি জেলা রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ১০টি রেশম বীজাগার, ৭টি তুঁত বাগান, ২টি গ্রেনেজ, ৪০টি উপজেলা রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামপর্যায়ে ১৬৪টি রেশম সম্প্রসারণ পরিদর্শকের কার্যালয় এবং ১২টি মিনিফিলেচার কেন্দ্র রয়েছে। অথচ রেশমচাষী ও রেশম শিল্পে জড়িত তাঁতীদের অভিযোগের অন্ত নেই। সরকারের তরফ থেকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, উদ্যোগ, প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ এবং সদিচ্ছার অভাবে কোনরকম কার্যকর সাহায্য-সহযোগিতা তারা দীর্ঘদিন ধরে পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে।

তাঁতশিল্পের মূল কাঁচামাল সুতা এবং রঙ। এই সুতা-রঙসহ নানা তাঁত উপকরণের ঘাটতি এবং উচ্চমূল্য এই শিল্পের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে চিহ্নিত হয়ে আছে। দেশীয় সুতা উৎপাদনকারী স্পিনিং মিলগুলোর কাছ থেকে সুতা কিনতে প্রতিনিয়ত উচ্চমূল্য ও সরবরাহে ঘাটতিজনিত অসুবিধা সত্ত্বেও আমদানি করা সুতার দুষ্প্রাপ্যতা তাঁতশিল্পে জড়িতরা সবসময় বলে আসছেন। বিশ্ববাজারে তুলার মূল্যবৃদ্ধি, স্থানীয় পর্যায়ে গ্যাস-বিদ্যুতের ঘাটতিসহ নানা যৌক্তিক ও অযৌক্তিক অজুহাতে স্পিনিং মিলগুলোর দফায় দফায় মূল্যবৃদ্ধি তাঁতী সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে ব্যাপকভাবে। দেশীয় তাঁতশিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন কাউন্টের সুতার মূল্য বিগত বিএনপি সরকারের আমলের তুলনায় ১৭০% থেকে ২৫০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া তাঁতশিল্পে প্রয়োজনীয় ডাই কেমিক্যালস বা রঙ রসায়নের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যে ডাই কেমিক্যালস বা রঙ রসায়ন ২০০১ থেকে ২০০৬ সময়কালে কেনা যেত মাত্র ৮৬০ টাকা কেজি দরে, তা এখন কিনতে হয় ২ হাজার ২৩৬ টাকা কেজি দরে। অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় ১৬০% হারে। আবার যে ডাই কেমিক্যালস বা রঙ রসায়ন

www.pathagar.com

২০০১ থেকে ২০০৬ সময়কালে কেনা যেত মাত্র ১ হাজার ৭২০ টাকা কেজি দরে, তা এখন কিনতে হয় ৫ হাজার ১৬০ টাকা কেজি দরে। অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় ২০০% হারে। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে, শাড়ি এবং লুঙ্গিতে মাড় দেয়ার জন্য ব্যবহার করা অ্যারারুটের মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কথা। ২০০১ থেকে ২০০৬ সময়কালে অ্যারারুটের ৫০ কেজির মূল্য ছিল যেখানে সর্বোচ্চ ৪০০ টাকা, তা এখন একজন তাঁতীকে কিনতে হয় প্রায় ১ হাজার ৫০০ টাকা দরে। অর্থাৎ অ্যারারুটের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ২৭৫%।

আওয়ামী মহাজোট সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় এবং লুটপাটের মানসিকতার কারণে সৃষ্ট প্রকট বিদ্যুৎ সমস্যায় আজ সারাদেশের সবাই ভুক্তভোগী। তাঁতশিল্প এবং তাঁতী ভাই-বোনেরা এই অভূতপূর্ব ভয়াবহ বিদ্যুৎ সঙ্কটে দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। একদিকে বিদ্যুতের অব্যাহত লোডশেডিংয়ের ফলে উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে করা সম্ভব হচ্ছে না; আবার অন্যদিকে বিদ্যুতের মূল্য দফায় দফায় বাড়ানো হয়েছে এবং পুনরায় বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলছে। বিএনপি সরকারের আমলে চালু করা বিদ্যুৎচালিত তাঁতের জন্য বিদ্যুৎ বিলের ওপর ৭.৫% রিবেট বা ভর্তুকিও এই সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এছাড়া স্থায়ী ও চলতি মূলধনের অভাব এবং বিপণনে অদক্ষতা-অসুবিধা এই শিল্পের উৎপাদনশীলতাকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারছে না। সীমান্ত দিয়ে অবাধে চোরাচালান হয়ে আসছে ভারতীয় শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, চাদর প্রভৃতি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি নতজানু এই পদলেহী সরকার সীমান্তের চোরাচালান ঠেকানোর কোন কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে তাঁতীদের অসম প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দিচ্ছে এবং দেশকে ভারতীয় কাপড়ের অবাধ বাজারে পরিণত করেছে।

এর ওপর রয়েছে ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজির অত্যাচার-অনাচার। সারাদেশের বন্ধ তাঁতগুলো চালু করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের উদ্যোগ নেয়া তো দূরের কথা, বর্তমানে কোনরকমে চালু থাকা তাঁতগুলো যেন বন্ধ না হয়ে যায় সেদিকেও ভ্রূক্ষেপ করছে না এই গণবিরোধী সরকার। খোদ আওয়ামী তাঁতী লীগের নেতারাই ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁতীদের উন্নয়নে কোন কাজ করেনি।' দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, বিগত স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তাঁতী লীগ আয়োজিত অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে তাঁতী লীগ নেতারা এ বিষয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সত্য কথাটি স্বীকার করে নেন। দেশজুড়ে আজ লাখ লাখ তাঁতী বেকারত্ব বরণ করে নিয়েছেন কিংবা পেটের দায়ে পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। যে তাঁত পাড়াগুলোতে আগে ছিল ঐতিহ্যবাহী ঠক্‌ঠক্ শব্দের ছন্দময় কর্মচাঞ্চল্য, আজ সেখানে সুনসান নীরবতা ভয়াবহ অর্থনৈতিক ও মানবিক সঙ্কটের সঙ্কেত দিচ্ছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সরকারের তরফ থেকে যথাযথ নীতিসুবিধা থেকেও বঞ্চিত তৃণমূল পর্যায়ের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী এই তাঁতশিল্প। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে এমন কোন যোগ্য নেতৃত্ব আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি, যারা সরকারের বা রাষ্ট্রের কাঠামোতে যথাযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের স্বার্থ আদায় করে নিতে পারেন। তারা তাই প্রকৃত অর্থেই রয়ে গেছেন অভিভাবকহীন, শুভানুধ্যায়ীবিহীন যুগ যুগ ধরে। তাদের প্রকৃত সুবিধা হয় এমন পদক্ষেপগুলো তাই সরকারের নীতিনির্ধারকদের এখনও সেভাবে ভাবিয়ে তোলেনি।

বিএনপি সরকারের আমলে তাঁতশিল্পে সমর্থন ও সহযোগিতা : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাঁতশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রকৃত অর্থে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনিই তাঁতীদের কল্যাণে নানা কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে একটি অধ্যাদেশ (৬৩ নং অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ সাল) জারি করে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড গঠন করেছিলেন। আবার তিনিই রেশম শিল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালেই আরেকটি অধ্যাদেশ (৭২ নং অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ সাল) জারি করে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

আর সারাদেশের তাঁতীদের সুসংগঠিত করে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সরব করার লক্ষ্যে শহীদ জিয়াই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী তাঁতী দল, যা প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজও আপামর তাঁতীসমাজের বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে তাদের পাশে আছে সবসময়। শহীদ জিয়ার দূরদর্শিতা এবং তাঁতীদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা সারাদেশের তাঁতীসমাজ আজও স্মরণ করে কৃতজ্ঞচিত্তে। তাঁতশিল্পের স্থানীয় পর্যায়ে প্রযুক্তিগত ও প্রশিক্ষণ সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে তার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁতবহুল জেলাগুলোতে সার্ভিস ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, টেক্সটাইল প্রসেসিং সেন্টার, ক্লথ প্রসেসিং সেন্টার ও ট্রেনিং সেন্টারগুলো। হস্তচালিত তাঁতের পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিদ্যুৎচালিত তাঁতের প্রচলন শুরু করেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানই। এজন্য নানা ধরনের প্রণোদনা দেয়াসহ কারিগরি ও মূলধনী সমর্থনেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তিনিই।

পরে শহীদ জিয়ার উত্তরসূরি হিসেবে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া একইভাবে তাঁতশিল্প এবং তাঁতীসমাজের কল্যাণে ও তাদের সমস্যাগুলো সমাধানে নানা ইতিবাচক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন তিন দফায় তার রাষ্ট্র পরিচালনার সময়কালে। ১৯৯১ - ৯৬ শাসনামলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত তাঁতীদের দুর্ভোগ নিরসনে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাদের ঋণের সুদ এবং দণ্ডসুদ মওকুফ করে দিয়েছিলেন আর ঋণের আসলটুকু ১৬ কিস্তিতে পরিশোধের সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ২০০১ - ০৬ শাসনামলে আরও যুগান্তকারী কিছু স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁতশিল্প এবং তাঁতীদের সামগ্রিক কল্যাণ ও টেকসই

www.pathagar.com

উন্নয়নের লক্ষ্যে। ২০০৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত তাঁতীদের মধ্যে এক তাঁতে ৩ হাজার, দুই তাঁতে ৫ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে বিপর্যস্ত তাঁতীরা পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে পারেন। এমনকি ওই বন্যা চলাকালীন বন্যাকবলিত দুস্থ তাঁতীদের অনাহার থেকে রক্ষা করতে ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে মাসিক ১৫ কেজি করে চাল দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তিন মাস পর্যন্ত। বিদ্যুৎচালিত তাঁতের প্রতি তাঁতীদের আরও আকৃষ্ট করে তোলার জন্য বিদ্যুৎ বিলের ওপর ৭.৫% হারে রিবেট বা রেয়াত দেয়ার ব্যবস্থাও চালু করা হয় এ সময়ে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি রফতানি সম্ভাবনা তৈরি করার লক্ষ্যে রফতানিযোগ্য শাড়ির ওপর ২৫% রফতানি ইনসেনটিভ ঘোষণাও করা হয়। কাস্টমস কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আটক কিংবা বাজেয়াপ্ত করা সুতা ও রঙসহ নানা উপকরণ তাঁতী সমিতিগুলোর মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে প্রান্তিক তাঁতীদের মধ্যে বিতরণ করার নির্দেশনাও দেয়া হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী তাঁতী দল সবসময়ই তাঁতীসমাজের সমস্যা সমাধানে তাদের পাশে থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে। বর্তমান সরকারের নির্লিপ্ততা ও বৈরী আচরণের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে তাঁতশিল্পের সমস্যা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাঁতীসমাজের অস্তিত্ব রক্ষাই আজ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় বরাবরের মতই জাতীয়তাবাদী তাঁতী দল পুনরায় তাঁতীসমাজ তথা তাঁতশিল্পের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তাঁতশিল্পে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে ১১-দফা দাবি উত্থাপন করেছে সরকারের উদ্দেশে অনতিবিলম্বে দাবিগুলো পূরণের আহ্বান জানিয়ে। তাঁতীসমাজের স্বার্থে তাঁতী দল উত্থাপিত ১১-দফা দাবি নিম্নরূপ :

১. সুতা ও রঙের ওপর আরোপিত সব শুল্ক প্রত্যাহার করে সুতা ও রঙের দাম কমাতে হবে।
২. তাঁত উপকরণসহ সব কাঁচামালের দাম কমাতে হবে।
৩. অসাধু সুতা ব্যবসায়ীদের সিণ্ডিকেট ও নিয়ন্ত্রণ থেকে সুতার বাজার মুক্ত করতে হবে।
৪. তাঁতীদের জন্য তাঁত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৫. তাঁতীদের জন্য সুদবিহীন ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. বিদ্যুৎ বিলের ওপর ৭.৫০% রেয়াত পুনরায় চালু করতে হবে।
৭. বন্ধ তাঁত মিলগুলো পুনরায় চালু করার জন্য সরকার কর্তৃক আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৮. সুতার মিলগুলো থেকে শতকরা ৩৫ ভাগ সুতা তাঁতী ও প্রান্তিক তাঁতীদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. তাঁতী ও প্রান্তিক তাঁতীদের বকেয়া ঋণ এবং সুদের টাকা মওকুফ করতে হবে।
১০. রফতানিযোগ্য শাড়ির ওপর ভর্তুকি পুনর্বহাল করতে হবে।
১১. ভারতীয় শাড়ি, লুঙ্গি, সালোয়ার-কামিজ চোরাপথে আসা বন্ধ করতে হবে।

www.pathagar.com

উপসংহার : সারাদেশের নানা ক্ষেত্রে বিবিধ সঙ্কট ও সমস্যার মধ্যে তাঁতীসমাজও আজ সমস্যার ভারে দারুণভাবে জর্জরিত। শহীদ জিয়ার নিজ হাতে গড়া জাতীয়তাবাদী তাঁতী দল এ অবস্থায় নিষ্ক্রিয় বসে থাকতে পারে না। তাই তাঁতীসমাজের সমস্যাগুলোর সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাঁতী ও তাঁতশিল্প সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ন্যায্য ১১-দফা দাবি প্রণয়ন করে তা ইতোমধ্যে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, এই লুটেরা গণবিরোধী সরকার দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী তাঁতশিল্পের স্বার্থসংশ্লিষ্ট উপরোক্ত ১১-দফা দাবি পূরণে কোনো কর্ণপাত করছে না। তাঁতীসমাজের প্রাণের দাবি ১১-দফা পূরণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতীয়তাবাদী তাঁতীদল আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় ১২ মে ২০১১ তারিখে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে দৈনিক আমার দেশ-এ ১৪ মে ২০১১ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

আড়িয়ল বিল থেকে পদ্মার ওপার : অতঃপর?

গত মাসে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের দুই বছর পূর্তি পালিত হয়েছে সাড়ম্বরে। আড়ম্বর করে সাফল্যগাঁথা বর্ণনা করেছে সরকার, সরকারি দল ও তার সহযোগীরা। পক্ষান্তরে মহাজোট সরকারের দেয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের চুলচেরা হিসাব-নিকাশ করেছে বিরোধী দলসহ আমজনতা বেশ জোরেশোরেই। এরই মধ্যে দেশজুড়ে পৌরসভা নির্বাচনসহ দুটি সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে মহাজোট সরকারের দুই বছর পূর্তি উদযাপনকালের কাছাকাছি সময়ে। এই নির্বাচনগুলোর ফলাফল থেকে কোন সঙ্কীর্ণ দলবাজির পক্ষপাত না করেও মোটাদাগে বলে দেয়া চলে সামগ্রিকভাবে সরকার ও সরকারি দলের জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। জনগণ বেশ খানিকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এই ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়ায় জনগণ বিরোধী দলকেও ঘুরে দাঁড় করিয়েছে উপরোক্ত নির্বাচনগুলোতে। এই যে জনগণের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া, তা নিয়ে সরব আলোচনা-সমালোচনার মাঝপথেই সবকিছু ছাপিয়ে উঠে এসেছে আড়িয়ল বিলে উচ্চাভিলাষী নতুন বিমানবন্দর স্থাপন পরিকল্পনা, সরকারের গণবিচ্ছিন্নতা ও চূড়ান্তভাবে স্থানীয় জনগণের বিজয় অর্জনের বিষয়টি।

বাংলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া আরও পাঁচটি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর রয়েছে, যার মধ্যে কক্সবাজার অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরটিকে পর্যটনের উন্নয়নের স্বার্থে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানা যায়। বিশেষজ্ঞদের তথ্যমতে, বিদ্যমান কোন বিমানবন্দরই প্রকৃত ধারণ ও কার্যক্ষমতা সাপেক্ষে শতভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে না। পত্রিকান্তরে দেখেছি, ঢাকার কুর্মিটোলায় স্থাপিত আমাদের প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটির বার্ষিক ধারণ ও কার্যক্ষমতার মাত্র চল্লিশ ভাগ পর্যন্ত ব্যবহার হয়ে থাকে। আর চট্টগ্রাম ও সিলেটে অবস্থিত বাকি দুটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পনের থেকে বিশ ভাগও ব্যবহার হয় না। এ অবস্থায় বিদ্যমান তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সিংহভাগ কার্যক্ষমতা অব্যবহৃত রেখে নতুন আরও একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপনের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণের যৌক্তিকতা কোথায়? যৌক্তিকতার প্রশ্নটি নানা মহল থেকে উত্থাপিত হচ্ছিল বেশ কিছুকাল ধরে যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছিল। কিন্তু সরকার ও সরকারি দল এই বিষয়টিকে একেবারেই আমলে নেয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি। বরং ক্ষমতার

www.pathagar.com

দাপটে তারা এই যৌক্তিকতার প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের সরকারবিরোধী ও ষড়যন্ত্রকারীসহ বিবিধ অবমাননাকর অপবাদ দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবী গাছপাথরখ্যাত কলাম লেখক অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকেও হেলা-অবজ্ঞা করা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে রীতিমত ফৌজদারি মামলার আসামি করা হয়েছে।

প্রশ্ন আসলে এখানে দুটি। প্রথমটি হল, এতগুলো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সিংহভাগ অব্যবহৃত থাকার পরও নতুন উচ্চাভিলাষী বিমানবন্দরের প্রয়োজনীয়তা বা যৌক্তিকতা। দ্বিতীয়টি হল, যৌক্তিক হোক আর অযৌক্তিক হোক—প্রস্তাবিত নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আড়িয়ল বিলে কেন?। প্রথম প্রশ্নটি অস্থানীয় কিংবা বলা যেতে পারে জাতীয় স্বার্থের নীতিগত প্রশ্ন যা উত্থাপন করেছেন জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞগণ, সুধীসমাজ, বুদ্ধিজীবী তথা বিরোধীদলীয় নেত্রীর মাধ্যমে সারাদেশের আমজনতা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিতান্তই স্থানীয় কিংবা সহজভাবে বলা যেতে পারে স্থানীয় জনসাধারণের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার রক্ষার প্রশ্ন; নিজেদের সহায়-সম্পদ, ভিটেমাটি ও কৃষি জমি রক্ষার প্রশ্ন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, প্রথম প্রশ্নের কোনোরকম সুরাহা কিন্তু এখনও হয়নি।

নতুন উচ্চাভিলাষী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপনের যৌক্তিকতা নিয়ে নানা তথ্যভিত্তিক সমালোচনা সত্ত্বেও সরকার এ বিষয়ে এখনও অনড় অবস্থানে রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয় প্রশ্নটির সুরাহা হয়ত একরকম হয়েছে স্থানীয় জনগণের দলমত নির্বিশেষে আপসহীন আন্দোলনের মাধ্যমে। ৩১ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে আড়িয়ল বিলের স্থানীয় জনগণ তাদের গৃহহীন ও উদ্বাস্তু করার অমানবিক অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসে, প্রশাসনের নিপীড়ন-নির্যাতনের মুখেও অটল থেকে সরকারকে পিছু হটতে বাধ্য করে এবং সামগ্রিকভাবে এক অনন্য গণবিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়।

আড়িয়ল বিলে কোন বিমানবন্দর না করার ঘোষণা দিলেও সরকার কপটতার আশ্রয় নিয়ে স্থানীয় হাজার হাজার জনতাকে আসামি করে মামলা দিয়ে হয়রানি অব্যাহত রেখেছে, আড়িয়ল বিল রক্ষা কমিটির স্থানীয় নেতাকে গ্রেফতার করে নির্যাতন করছে এবং বিরোধীদলীয় নেত্রীকে প্রধান আসামি বা হুকুমের আসামি করে মামলা রুজু করিয়েছে। অনতিবিলম্বে এসব হয়রানিমূলক মামলার অবসান হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু সরকার আড়িয়ল বিল এলাকার গণদাবি মেনে নিয়ে সেখানে নতুন বিমানবন্দর স্থাপন না করার ঘোষণা দিয়েছে সেহেতু এ সংক্রান্ত কোনো মামলা-হয়রানি অব্যাহত রাখার কোন যৌক্তিক প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে সুবিবেচনাপ্রসূত সরকারি সিদ্ধান্ত সবার জন্যই মঙ্গলজনক হবে।

আগেই বলেছি, আড়িয়ল বিলে না হলেও দেশে আরেকটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপনের যৌক্তিকতার প্রশ্নটির এখনও কোন সুরাহা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী রাজনীতি– ৭

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা নিজেই আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, প্রয়োজনে পদ্মা নদীর ওপারে নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপন করবেন। পক্ষান্তরে বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, নতুন কোন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপনের প্রয়োজন নেই। লক্ষণীয় যে, নতুন বিমানবন্দর স্থাপনের যৌক্তিকতার প্রশ্নে দেশের দুই প্রধান নেত্রী সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিয়েছেন। এহেন অবস্থায় যৌক্তিকতার প্রশ্নটিতে নির্জলা যুক্তির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে সর্বজনগ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সরকার—এই প্রত্যাশা কি করা যায়?

আমার এক বাল্যবন্ধু পারিবারিকভাবে বিমান পরিবহন ব্যবসায় জড়িত বেশ বড় আকারেই। তার কাছে নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম নির্মোহ পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উত্তর জানার জন্য। তার মতে, এ মুহূর্তে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোর ক্ষমতার সিংহভাগই অব্যবহৃত রয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজনের আলোকে বিদ্যমান বিমানবন্দরগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন করেই দৃশ্যমান ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব।

আলোচনার একপর্যায়ে নাম না প্রকাশ করার শর্তে সে হাসতে হাসতেই বলল, ঢাকার কুর্মিটোলায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটির নাম সবাই মিলে পুনরায় পাল্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করার সুযোগ করে দিলেই চলমান সমস্যার সাশ্রয়ী সমাধান হয়ে যায়। জাতির ৫০ হাজার কোটি টাকা বেঁচে যায় বা সাশ্রয় হয়। আড়িয়ল বিলের মত পদ্মার ওপারের নতুন কোন জনপদ সরকারি নিপীড়নমূলক অধিগ্রহণের থাবায় আক্রান্ত হয় না। সরকারও তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের জরুরি কাজে মনোনিবেশ করার সুযোগ পায়।

হাস্যরসাচ্ছলে বলা আমার এই বন্ধুর বক্তব্য হালকা মেজাজে নেয়ার বদলে গুরুত্বসহকারে ভাবনা-চিন্তার দাবি রাখে। বিগত সংসদ নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দেয়া আমার এই বন্ধুটির মতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পিতার নামে বাংলাদেশে এতকিছু আছে অথচ কোন বিমানবন্দর নেই—এই নির্মম সত্য তার পক্ষে মেনে নেয়া সত্যিই কঠিন! আর প্রধানমন্ত্রীর পিতার নামে বিমানবন্দর নামকরণ করতে হলে সেটা অবশ্যই দেশের প্রধানতম বিমানবন্দর হতে হবে। বন্ধুবরের বদ্ধমূল ধারণা হচ্ছে, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম পাল্টানোর সময়েই একটু বুদ্ধি খাটিয়ে আর একটুখানি সাহস করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নাম দিয়ে ফেললেই সমস্ত ল্যাঠা চুকে যেত। বিরোধীদল বিএনপি অল্প কিছুদিন শোরগোল করে যথাবিহিত চুপ মেরে যেত। এখন একবার হযরত শাহজালাল (র.)-এর মতো পরম শ্রদ্ধেয় আউলিয়ার নামে নামকরণ করে ফেলবার পর পুনরায় সেই নাম পাল্টে বঙ্গবন্ধুর নামে নামকরণ করতে গেলে তীব্র স্পর্শকাতরতা ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ভীতি থেকেই আড়িয়ল বিল থেকে পদ্মার ওপার পর্যন্ত দিশেহারা ছুটোছুটি করতে হচ্ছে সরকারকে।

www.pathagar.com

বাল্যবন্ধুর এই আবেগ উপলব্ধির প্রতিধ্বনি পেলাম আরও একটু ডালপালা ছড়ানো আকারে গত সপ্তাহেই জাতীয় প্রেস ক্লাবের একজন সিনিয়র সাংবাদিক বন্ধুর কাছেও। তার অফিসে চা খেতে খেতে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, পিতার নামে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরই শুধু নয়—বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজধানীও ঢাকা থেকে সরিয়ে মুজিবনগর নামে পদ্মার ওপারে স্থানান্তরের গোপন পরিকল্পনা নাকি রয়েছে এ সরকারের। জানি না সাংবাদিক বন্ধুর কাছে শোনা পদ্মার ওপারে রাজধানী স্থানান্তরের গোপন পরিকল্পনার গুজব কতটুকু সত্য! শুধু নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপনের উচ্চাভিলাষ নিয়ে এত হৈচৈ এবং যৌক্তিকতা খুঁজে বেড়ানো সমালোচকবৃন্দের জন্য সেক্ষেত্রে নতুন বিস্ময়কর গবেষণার বিষয় হতে যাচ্ছে পদ্মার ওপারে মুজিবনগর নামে নতুন রাজধানী স্থাপনের যৌক্তিকতা। ৫০ হাজার কোটি টাকা বাজেটের নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর গ্রহণযোগ্য না হলে পদ্মার ওপারে গুজব-কল্পিত নতুন রাজধানীর সম্ভাব্য বাজেট কত হতে পারে, সেই হিসাব-নিকাশ এবার তবে চলতে থাকুক! নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি সমস্যার সমাধান, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, বিনামূল্যে সার, ঘরে-ঘরে কর্মসংস্থান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তার সময় কোথায় কারোর? আড়িয়ল বিলের কূলভাঙা ঢেউয়ের চোটে পদ্মা পাড়ি তো দেয়া হয়ে গেল। তারপর?

দৈনিক আমার দেশ-এ ছাপা হয়েছে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে

www.pathagar.com

ফেলানীকে ফেলেই দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী?

একটি নিরীহ বাঙালি কিশোরী, দরিদ্র পরিবারে জন্ম, সীমান্তবর্তী গ্রামে। নাম ছিল তার ফেলানী। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে মৃত্যুবরণ করেছিল সে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে প্রতি বছর নির্বিচার গুলিতে নিহত অন্য অনেক নিরীহ, নিরস্ত্র বেসামরিক বাংলাদেশী নাগরিকের মত তার নামটিও চাপা পড়ে যায়নি, কারণ তার লাশটি সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলছিল। সেই ঝুলন্ত লাশের ছবি দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তা সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে আলোড়ন তোলে। মর্মান্তিক ছবিটি দেখে বাংলাদেশের মানুষ দলমত নির্বিশেষে থমকে দাঁড়ায়। প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, এ কেমন বর্বরতা? পরদিন থেকে অন্য সব পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলেও বিষয়টি উঠে আসে। নিন্দার ঝড় বয়ে যায় দেশজুড়ে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে ফেলানীর কাঁটাতারে ঝুলন্ত লাশের প্রসঙ্গটি আবেগমিশ্রিত স্বরে তুলে আনতে থাকেন। আগ বাড়িয়ে এসে কোন কোন সংগঠন ফেলানীর ঝুলন্ত লাশের ছবিটি দিয়ে পোস্টার ছাপিয়ে সারাদেশে সেঁটে দেয় জনসমক্ষে।

ফলে এই ছবিটি আর ফেলানীর নামটি ভারত-বাংলাদেশ তথাকথিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করে দেয় জনসাধারণের সামনে। জনমতের চাপে বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত করে আমাদের ভারতবান্ধব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি মৃদু প্রতিবাদও পাঠায় ভারত সরকারের কাছে। চারপাশ থেকে সমালোচনার ঝড় উঠলে ভারত সরকারও জন্মাবধি না রাখা অনেক আশ্বাসের মতই বাংলাদেশ সীমান্তে মরণঘাতী বুলেট ব্যবহার না করে বরং আহত করার মত রাবার বুলেট ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দেয় বাংলাদেশ সরকারকে, যা ফলাও করে সব গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়া স্বয়ং ফেলানীর বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছেন বলে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে।

অথচ এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়াই অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন এক অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেছেন যে, ফেলানী নাকি বাংলাদেশের নাগরিকই নয়! পত্রিকায় প্রকাশিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্য পড়ে অতিশয় বিচলিত বোধ করছি। ফেলানী যদি বাংলাদেশের নাগরিকই না হবে তবে তিনি তার বাড়ি অবধি গিয়ে সমবেদনা জানিয়ে এলেন কার কাছে? ভারতীয় সরকারই বা তবে ফেলানী প্রসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ

www.pathagar.com

করে আর কোন সীমান্ত হত্যাকাণ্ড না ঘটাবার প্রতিশ্রুতি দিল কীভাবে? আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ই বা ফেলানীর ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাল কিসের ভিত্তিতে? নাকি ফেলানীর লাশের বোঝা এতটাই ভারি হয়ে গেল যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে আর বইতে রাজি রইলেন না? ফেলেই দিলেন ফেলানীকে ভারতের ভাগে। এ কেমন নিষ্ঠুর রসিকতা হতভাগিনী ফেলানীর সঙ্গে?

আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পরিবারগুলোতে কোন কোন রুগ্ন শিশুকে ফেলানী, পচা, গ্যাদা প্রভৃতি ধরনের তুচ্ছ নাম দেয়ার রেওয়াজ রয়েছে। পুরনোপন্থী মুরুব্বীদের ধারণা এতে তাদের আদরের ধনেরা আজরাইলের বা যমের কুনজর থেকে হয়ত রেহাই পাবে। নাম যতই তুচ্ছ করে রাখা হোক না কেন মায়ের এবং বাবার স্নেহ সেসব তুচ্ছ নামের শিশুদের প্রতি কম তো নয়ই বরং একটু বেশিই বটে। তাই ফেলানী ধরনের ফেলনা নাম রাখলেও শত অভাবের মাঝেও তাকে ফেলে তো দেয়নি তার স্নেহময়ী বাবা-মা। তার নির্মম মৃত্যুতে সরব আহাজারিতে বাতাস ভারি করে ফেলেছিল ভাগ্যগুণে বেঁচে যাওয়া তার হতভাগ্য বাবা। কিন্তু আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়া কী ভেবে অবশেষে তাকে ফেলেই দিলেন। বলে দিলেন ফেলানী তো বাংলাদেশের নাগরিকই নয়।

আহারে কী দুর্ভাগা দেশ আর তার দুর্ভাগা নাগরিক! ফেলানীর মত আর কারও ভাগ্যে যেন এমন বিড়ম্বনা না জোটে। এখানে উল্লেখ্য, ফেলানী হত্যাকাণ্ডের পর ভারতের দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সীমান্তে বেসামরিক বাংলাদেশী নাগরিক হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়নি। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সাম্প্রতিক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বিগত মে মাসেও পাঁচজন নিরীহ বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হয়েছেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের গুলিতে, নির্যাতনে আহত হয়েছেন ছয়জন এবং অপহৃত হয়েছেন একজন। এই ধারাবাহিক নির্বিচার হত্যাকাণ্ডকে দায়িত্বজ্ঞানহীন, বেপরোয়া এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছেন বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং ভারতকে বাংলাদেশ সীমান্তে নিরীহ বাংলাদেশী নাগরিক হত্যাকাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। অথচ আমাদের তথাকথিত ভারতবান্ধব সরকার ফেলানী হত্যাকাণ্ডের পর ঘটে যাওয়া একটি হত্যাকাণ্ডেরও কোন প্রতিবাদ জানিয়েছে বলে জানা যায়নি।

মৃদুস্বরেও বলেনি যে তোমরা তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আর কোন হত্যাকাণ্ড ঘটাবে না সীমান্তে। তোমাদের কথা অনুযায়ী তোমরা এই নির্বিচার হত্যাকাণ্ড বন্ধ কর, নইলে আমরা এর পাল্টা যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব। একতরফা নিঃশর্ত বন্ধুত্বের নামে এমন এক পররাষ্ট্রনীতির চর্চা চলছে যে, আমাদের নাগরিকদের নিয়মিত বিনা বিচারে পাখির মত গুলি করে মারার পরেও টু শব্দটি উচ্চারণ করছে না এই সরকার। একি প্রকৃত অর্থে বন্ধুত্বের পররাষ্ট্রনীতি? নাকি নতজানু পদলেহী মানসিকতার পরিচায়ক? বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি উভয়ই এ ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমত, নাগরিকদের বিপন্ন জীবন রক্ষা করতে; দ্বিতীয়ত, জীবনহানির পর তার প্রতিকার করতে বা সুবিচার আদায় করতে এবং তৃতীয়ত, এমনতর নির্মম ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে। ফেলানীর হত্যাকাণ্ড আজ আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছে আমাদের স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতি ও কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা নিয়ে। এই প্রশ্নটি আজ গভীরভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে। ফেলানীর ঝুলন্ত লাশ ছুঁয়ে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে আন্তরিকভাবে ভাবতে হবে কেমন করে এই মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞ চিরতরে বন্ধ করা যায়। যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করে না অথচ প্রতিমাসে সীমান্তে নিরীহ-নিরস্ত্র নাগরিক হত্যাকাণ্ড চলছে এমনটি সভ্য দুনিয়ার মানচিত্রে নজিরবিহীন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর ডিসেম্বর, ২০১০ সালে প্রকাশিত 'ট্রিগার হ্যাপি : এক্সেসিভ ইউজ অব ফোর্স বাই ইন্ডিয়ান ট্রুপস এট দ্য বাংলাদেশ বর্ডার' বা 'গুলি ফোটানোর সুখ : বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ' শিরোনামের প্রতিবেদনে গত এক দশকে ৯০০ বাংলাদেশী নাগরিকের হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে উল্লেখ হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয় যে, এই ৯০০ জন নিহত বাংলাদেশীর মধ্যে রয়েছে দরিদ্র কৃষক কিংবা শ্রমিক যারা হয়তবা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অনানুষ্ঠানিকভাবে গরু নিয়ে আসছিল সীমান্ত পেরিয়ে, কেউবা উদ্দেশ্যহীন গোলাগুলির শিকার, আবার কেউ হয়ত কোন যথোপযুক্ত কারণ ছাড়াই খুন হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে আব্দুর রকিব নামে বাংলাদেশী এক ১৩ বছরের বালকের কথা বলা হয়েছে, যে কিনা বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরেই পুকুরে মাছ ধরার সময় নিহত হয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, সীমান্ত এলাকার অগণিত জনসাধারণ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মৌখিক হয়রানি বা দুর্ব্যবহার, শারীরিক প্রহার বা নির্যাতন এমনকি হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। একই প্রতিবেদনেই মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না থাকায় এমনকি হত্যাকাণ্ডের মত গুরুতর অত্যাচারও বিনা বাধায় চলতে পারছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে, এর মাধ্যমে এই বার্তাই পরিষ্কার হয় যে, ভারতীয় সরকার এসব অমানবিক অত্যাচারকে গ্রহণযোগ্য মনে করছে। একই প্রতিবেদনে ভারতীয় সরকারকে আহ্বান জানানো হয়েছে যেন তারা তাদের সীমান্তরক্ষীদের শক্তি ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে জাতিসংঘ নির্ধারিত নীতিমালা মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক পরিচালকের একটি মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য—'শান্তিকালীন মিশনে বেআইনি কার্যক্রম প্রতিরোধ করার কাজে নিয়োজিত (ভারতীয়) সীমান্তরক্ষী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাহিনী এমন ভাব করছে যেন তারা একটি যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছে এবং নিরীহ স্থানীয় জনসাধারণকে অত্যাচার ও হত্যা করে চলেছে।'

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ ছাড়াও পাঁচটি দেশ যথা পাকিস্তান, চীন, মিয়ানমার, নেপাল এবং ভুটানের স্থল সীমান্ত এবং আরও একটি দ্বীপ দেশ শ্রীলঙ্কার সমুদ্রসীমা রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত অত্যাচার এবং হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতা কেবল বাংলাদেশ সীমান্তেই ঘটিয়ে থাকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। অথচ একই সীমান্তে বাংলাদেশী সীমান্তরক্ষীর গুলিতে ভারতীয় কোন বেসামরিক নাগরিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পুরনো পত্রিকায় কিংবা ওয়েবসাইটে খুঁজে পাইনি। আর পাকিস্তান, চীন, মিয়ানমার, নেপাল, ভুটান কিংবা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে স্থল কিংবা সমুদ্রসীমা বরাবর ওইসব দেশের কোন বেসামরিক নাগরিক ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর গুলিতে নিহত হওয়ার কোন ঘটনা আমার পক্ষে অনুসন্ধান করে নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়নি।

অর্থাৎ বাংলাদেশ সীমান্তে নিরীহ নিরস্ত্র বাংলাদেশী বেসামরিক নাগরিকদের অব্যাহত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নজিরবিহীন অনাচার এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ভারতের অতি নিকটবর্তী সাতটি সীমান্তবর্তী দেশের মধ্যে শুধু বাংলাদেশ সীমান্তে এই বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ চলছে বছরের পর বছর ধরে। অন্য ছয়টি দেশের সঙ্গে সীমান্ত বরাবর এমনটি কখনোই ঘটে না। এর কারণ কী? সামরিক দিক দিয়ে আমরা ভারতের চেয়ে দুর্বল বলে কি ভারত আমাদের সীমান্তেই শুধু এমনটি ঘটিয়ে চলার সাহস পাচ্ছে? আমার ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনায় তা মনে হয় না। কারণ, ভারতের সীমান্তবর্তী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সামরিক ক্ষেত্রে চীন, পাকিস্তান ও মিয়ানমারের চেয়ে দুর্বল হলেও শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটানের চেয়ে দুর্বল নয় বলেই জানি। অতএব, কেবল ভারতের চেয়ে তুলনামূলক সামরিক দুর্বলতার কারণে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা বাংলাদেশ সীমান্তে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে তা যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয় না।

হতে পারে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে ছোট দেশ ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে, দুর্বল সামরিক শক্তিমত্তার দিক থেকে, অর্থনৈতিকভাবে তুলনামূলক আকারেও পেছনে, বিশ্বব্যাপী পরিচিতি ও প্রভাবের দিক থেকেও পিছিয়ে। কিন্তু এ কথাটি তো সত্য যে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। নিজস্ব সামর্থ্য ও স্বকীয়তা নিয়ে বাংলাদেশ বেড়ে উঠছে ধীরে ধীরে নিজের তুলনামূলক সুবিধাগুলোকে যতটা সম্ভব কাজে লাগিয়ে।

বংলাদেশী জনগণ শত সীমাবদ্ধতা আর প্রতিকূলতার মাঝেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে পাঠকবৃন্দ, সবাই আশা করি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, বাংলাদেশ ভরণপোষণ বা নিরাপত্তার জন্য বড়ভাই দেশ ভারতের মুখাপেক্ষীও নয়। তাই

www.pathagar.com

সদিচ্ছা থাকলে ভারতের সাথে আমাদের সীমান্তে নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা অসম্ভব নয় মোটেই।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কাছ থেকে আজ পুনরায় শিক্ষা বা লেসন গ্রহণের সময় এসেছে। নিজের নিরাপত্তা নিজেকেই নিশ্চিত করতে হবে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে, কারও সঙ্গে আগ বাড়িয়ে ঝগড়া না বাধিয়েও। প্রথমত, আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশী সীমান্তরক্ষী বাহিনী পুরনো নামের বিডিআর বা নতুন নামের বিজিবিকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত ও সক্ষম করে গড়ে তুলে সীমান্তে নিয়োজিত করতে হবে দেশের ভৌগোলিক সীমানা সুরক্ষা ও সীমান্তবর্তী স্থানীয় জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জীবনপণ দায়িত্বে। দ্বিতীয়ত, আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে আনতে হবে শহীদ জিয়া প্রবর্তিত 'প্রভু নয় বন্ধু চাই' নীতির প্রকৃত প্রতিফলন। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। ভারত অন্য সব প্রতিবেশীর সীমান্তে যেমন কোন নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ঘটায় না তেমনি আমাদের সীমান্তেও যেন কোন নিরীহ নিরস্ত্র ফেলানীকে হত্যা করার প্রবণতা থেকে সর্বসময় নিবৃত্ত থাকে।

আদর করে বাংলাদেশের কোন কোন মা-বাবা তাদের কারও কারও সন্তানের নাম সংস্কারবশত: ফেলানী রাখলেও বাংলাদেশের কোন নাগরিককেই ফেলনা বা তুচ্ছ জ্ঞান করা সাংবিধানিকভাবে কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ভারত উন্নাসিকতাবশতই হোক আর শক্তিমদমত্ততার কারণেই হোক আমাদের মত ফেলানীদের নিপীড়ন করলে, হত্যা করলে কিংবা তুচ্ছ করলে আমাদের সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের এগিয়ে এসে রক্ষা করার কথা, রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে প্রতিবাদ করার কথা এবং প্রয়োজনে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের চেষ্টা করার কথা। যদি তা করতে ব্যর্থই হবেন তারা, তবে কেন ক্ষমতায় থেকে নিষ্ঠুর অসহ্য তামাশা করা? সারা বাংলাদেশের হৃদয় স্তব্ধ করে দেয়া নিহত ফেলানী এখনও কথা বলতে পারলে হয়ত এই কথাটিই বলত চিৎকার করে। নিষ্পাপ ফেলানীর রুহের মাগফেরাত কামনা করে আজকের লেখা এখানেই শেষ করছি।

দৈনিক আমার দেশ-এ ৪ জুন ২০১১ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

লিমনরা কেমন আছে?

লিমন নামের একটি ক্রন্দনরত কিশোর সম্প্রতি দেশের সব গণমাধ্যমের শিরোনাম দখল করে নিয়েছে। অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীগুলোর মধ্যে এলিটতম ফোর্স র‍্যাব কর্তৃক বিনা অপরাধে তার পায়ে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে গুলি করার অভিযোগ উঠেছে। তার গুলিবিদ্ধ পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে চিকিৎসকদের এবং লিমনকে এই উঠতি বয়সেই পঙ্গুত্ব বরণ করে নিতে হয়েছে। পা হারানো লিমনের অসহায় করুণ ছবি ঘুরেফিরে সব জাতীয় দৈনিকে বার বার প্রকাশিত হওয়ায় জনমনে তার প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার পরপর নিরীহ লিমনের প্রতি এই অমানবিক আচরণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে র‍্যাবের মহাপরিচালক মহোদয় সংবাদ মাধ্যমে বলেছিলেন, 'লিমন পরিস্থিতির শিকার'। কী সেই পরিস্থিতি যে পরিস্থিতিতে লিমনের মত একজন নিরীহ নির্বিবাদী নাগরিক পঙ্গুত্ব বরণ করে নিতে বাধ্য হয়? লিমনকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করে সেই পরিস্থিতিটা কিঞ্চিৎ অনুধাবনের চেষ্টা করা যাক।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী লিমনের বয়স মাত্র ১৬ বছর। আইনের ভাষায় প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠেনি সে এখনও। কাঁঠালিয়া পিজিএস কারিগরি কলেজের ছাত্র সে এবং সদ্যগত এইচএসসি পরীক্ষায় একজন নিয়মিত পরীক্ষার্থী ছিল, যে পরীক্ষা আর দেয়া হয়ে ওঠেনি এই দুঃখজনক পরিস্থিতির দরুণ। বাবা তোফাজ্জল হোসেন এক হতদরিদ্র দিনমজুর। ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাতুরিয়া নামক গ্রামে লিমনদের বাড়ি। গত ২৩ মার্চ ২০১১ গরু আনতে মাঠে যাওয়া লিমন পথিমধ্যে জীবনে প্রথমবারের মত সশস্ত্র র‍্যাবের মুখোমুখি হয়। স্বনামধন্য মানবাধিকার সংগঠন অধিকার-এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন অনুযায়ী র‍্যাব-৮ এর একটি দল উপ-সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে ওই দিন স্থানীয় জনৈক জমাদ্দারের বাড়ির সামনে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযান পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছিল।

সেসময় ওই রাস্তায় গমনকারী বেচারা লিমনকে শার্টের কলার চেপে পরিচয় জানতে চায় র‍্যাবের উপরোক্ত দল। লিমন নিজেকে একজন ছাত্র বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু পরিচয় পাওয়ার পরও কোন এক অজ্ঞাত কারণে র‍্যাব সদস্যরা লিমনের বাম পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ লিমনকে রক্তাক্ত অবস্থায় চরম অবহেলাভরে কাঁথাচাপা দিয়ে ফেলে রাখা হয় ঘটনাস্থলেই দুই থেকে তিন ঘণ্টা। পরে বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং অবস্থার অবনতি ঘটলে ঢাকার

www.pathagar.com

পঙ্গু হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় লিমনকে। চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে পঙ্গু হাসপাতালেই নিষ্পাপ লিমনের গুলিবিদ্ধ বাম পা কেটে বাদ দিতে হয় বলে অধিকার-এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঘটনাটি খুবই সাদামাটা। সশস্ত্র কালো পোশাক পরিহিত র‍্যাব কর্তৃক একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক নিরস্ত্র নাগরিককে বিনা বিচারে গুলি করে পঙ্গু করে দেয়ার ঘটনা। এমন ঘটনা বাংলাদেশে এই প্রথম ঘটেছে তা কিন্তু নয়। বরং বাংলাদেশে ক্রসফায়ারের বা এনকাউন্টারের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যা বা নিপীড়ন ক্রমবর্ধমান হারে চলছে বলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো বহুবছর ধরেই হৈ চৈ করে যাচ্ছে। সরকার তাতে কখনোই কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করেনি বরং এ ব্যাপারে বিধি বা আইন ভঙ্গকারী বাহিনীগুলোকে বিশেষ রকম প্রশ্রয় দিয়ে সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে বলে বরাবর সার্টিফিকেট দিয়ে যাচ্ছে।

আর তা করতে গিয়ে সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রীবর্গকেও রীতিমত বাস্তবতাকে অস্বীকার করে অনৈতিকভাবে মিথ্যাচার চালাতে দেখা গেছে। তার ফল কিন্তু ভালো হয়নি মোটেও। যে সমস্যাটি প্রশ্রয় না দিয়ে একটু সতর্কভাবে তদন্ত করে দেখলে সেরে যেতে পারত বা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকতে পারত, তা আজ নীতিহীন অপরিণামদর্শী প্রশ্রয় পেয়ে এমন এক ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কোনভাবেই যেন তাকে আর নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। বরং খোঁজখবর নিতে গেলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে মানবাধিকার সংস্থা বা গণমাধ্যম এমনকি খোদ সরকারের কর্তাব্যক্তিদেরও।

যেভাবে লিমনের ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে এবং পরে যেভাবে তাকে অবহেলা বা হেনস্থা করা হয়েছে, তা বেশকিছু গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হলে লিমন জনগণের নজর কাড়তে সক্ষম হয় বিশেষভাবে। কঠোর সমালোচনার মুখে র‍্যাব মহাপরিচালক প্রথমে আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গিতে লিমনকে পরিস্থিতির শিকার বলে বক্তব্য দিলেও পরে র‍্যাবের পক্ষ থেকে লিমনকে একজন সন্ত্রাসী হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করা হতে থাকে। এক পর্যায়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান বিচলিত হয়ে লিমনকে দেখতে হাসপাতালে যান এবং এ ব্যাপারে দায়ী র‍্যাব সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। তিনি আগ বাড়িয়ে ঝালকাঠির পুলিশ সুপারের কাছে লিমন সংক্রান্ত সব কাগজপত্র চেয়ে পাঠান এবং এ ব্যাপারে পুলিশ মামলা না নিলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিজেই আইনগত ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়ে দেন।

তার এই উদ্যোগী জনপ্রিয় ভূমিকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিরক্ত বা বিব্রত হয়ে পুলিশ ও র‍্যাবের ব্যাপারে তাকে নিজ এখতিয়ারের বাইরে না যেতে সতর্ক করে দিয়েছে বলে দি ডেইলি সান নামের ইংরেজি দৈনিকে ৫ মে ২০১১ তারিখে সংবাদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশিত হয়েছে। হায়রে বেচারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আর তার ক্ষমতাহীন চেয়ারম্যান! লিমনের ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে একটুখানি খোঁজখবর নিতে গিয়ে এমনতর হেনস্তা হতে হল খোদ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়কেই!

লিমনের ব্যাপারে নিষ্ঠুরতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে যখন দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড়ে র‍্যাব মোটামুটি কোণঠাসা অবস্থায়, তখন এগিয়ে এলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারেক সিদ্দিকী। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১৯ মে ২০১১ তারিখে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জেনারেল তারেক সিদ্দিকী বললেন, 'দুর্বৃত্ত মোরশেদ জমাদ্দারের সঙ্গে লিমন ও তার বাবা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। র‍্যাব লিমনকে ধরে পায়ে গুলি করেছে এমন অভিযোগ সঠিক নয়। দুর্বৃত্ত মোরশেদ জমাদ্দারকে ধরার সময় লিমন পালাচ্ছিল। তখন র‍্যাব তার পায়ে গুলি করে।' প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা এখানেই থামলেন না। বরং নাম উল্লেখ না করে একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদককে লিমন বিষয়ে সংবাদ ও তার ফলোআপ বিরতিহীনভাবে প্রচারের দায়ে অভিযুক্ত করে সেই সম্পাদক মহোদয়কে সরকার চাইলে যে কোন সময় জঙ্গি সংশ্লিষ্টতায় গ্রেফতার করা যায় বলে প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিলেন। প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা মহোদয় দৈনিক পত্রিকাটির নাম ও তার সম্পাদকের নাম উল্লেখ না করলেও অনেক বুদ্ধিমান পাঠকই দুই-দুই চার মিলিয়ে আন্দাজ করে নিয়েছেন যে, এটি দেশের শীর্ষ দৈনিক ও তার প্রভাবশালী সম্পাদক মহোদয়কে উদ্দেশ করেই বলা।

এর দুই দিন বাদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনোরকম রাখঢাক না করে এক কথায় বলে দিলেন, লিমনের বিষয়ে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার বক্তব্যই সরকারের বক্তব্য। তার পরদিন ২৩ মে ২০১১ তারিখে র‍্যাব সদর দফতরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাবের গণমাধ্যম শাখার পরিচালক মহোদয় জানালেন, লিমন বিষয়ে র‍্যাব কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন তাদের হাতে এসেছে এবং সে অনুসারে শুধু লিমন নয়, লিমনের বাবা-মা, ভাই-বোন সবার সঙ্গে সন্ত্রাসী মোরশেদ জমাদ্দার, তার বাহিনী ও তার স্ত্রীর যোগাযোগ আছে। যার বিরুদ্ধে লিমনকে বিনা দোষে গুলি করে পঙ্গু করে ফেলার অভিযোগ, সেই র‍্যাব কর্তৃক বিভাগীয় তদন্ত করার উদ্যোগ ইতিবাচক হিসেবে দেখা যেত যদি তদন্ত চলাকালীন র‍্যাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ নিরপেক্ষ পেশাদার ভূমিকা নিতে পারতেন।

যদি তারা তদন্ত প্রতিবেদন তৈরির আগেই লিমনকে সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসীর সহযোগী হিসেবে আখ্যায়িত না করতেন তা পেশাগতভাবে র‍্যাবের জন্য শুভ ফল বয়ে আনতে পারত। একটি পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী যারা অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে, তাদের কখনও-সখনও অভ্যন্তরীণ অনাচার বা অনিচ্ছাকৃত ভুল হতেই পারে। কিন্তু অনাচার বা ভুল হলে তা সঠিকভাবে

www.pathagar.com

মূল্যায়ন করে স্বীকার করে নেয়ার মধ্যে এবং নিরীহ ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনাসহ প্রয়োজনে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়ার মত মানবিক আচরণ করার মধ্যে দোষ কোথায়? অনাচার বা ভুল হওয়ার পরও অনাচার বা ভুল হয়নি বলে ক্ষতিগ্রস্ত নিরীহ নাগরিককে উল্টো দোষী সাব্যস্ত করার বিপজ্জনক প্রবণতা দেশের এবং সমাজের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর নজির সৃষ্টি করছে।

ক্ষতিকর নজির যে সৃষ্টি হচ্ছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকবে না যদি চলমান অনাচারের উদ্বেগজনক সংখ্যাগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখা যায়। ২০১০ সালে বাংলাদেশে ১২৭টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে মানবাধিকার সংস্থা অধিকার-এর প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনের তথ্যমতে, প্রতি তিন দিনে একটি করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ২০১০ সালে যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই ১২৭ জনের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৬৮ জনই নিহত হয়েছে এলিট ফোর্স র‍্যাবের হাতে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক ৪৩ জন জনগণের বন্ধু পুলিশের হাতে, ৯ জন র‍্যাব-পুলিশ যৌথ বাহিনীর হাতে, ৩ জন র‍্যাব-কোস্টগার্ড যৌথ বাহিনীর হাতে, ৩ জন র‍্যাব-কোস্টগার্ড-পুলিশ যৌথ বাহিনীর হাতে এবং ১ জন বিডিআর বা বিজিবি'র হাতে।

এই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্রসফায়ার বা এনকাউন্টারে হত্যা, নির্যাতন করে হত্যার মত যথাযথ আইনি বা বিচারিক প্রক্রিয়া ছাড়া হত্যাকাণ্ডগুলো। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড একেবারে বন্ধ করার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী সরকার প্রতিশ্রুতি রাখেনি এবং তাদের শাসনামলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বেপরোয়াভাবে চালু থেকেছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে, ১২৭ জন নিহতের মধ্যে ১০১ জনই নিহত হয়েছেন তথাকথিত ক্রসফায়ার বা এনকাউন্টার বা বন্দুকযুদ্ধে। ২০১০ সালে বাংলাদেশের ২২ জন নাগরিক বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে নির্যাতনের কারণে নিহত হয়েছেন। আর ২২ জনের মধ্যে ২০ জনই পুলিশের হাতে নির্যাতনে নিহত হয়েছেন এবং ২ জন নিহত হয়েছেন র‍্যাবের হাতে নির্যাতনে। নিরাপত্তা হেফাজতে মোট ১০৯ জন নাগরিক মৃত্যুবরণ করেছেন ২০১০ সালে, যার মধ্যে ২৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার বলে অনুমিত হয়।

এর মধ্যে র‍্যাবের হেফাজতে থাকাকালীন ক্রসফায়ারে নিহত হন ৫ জন, নির্যাতনে নিহত হন ২ জন, পুলিশের হেফাজতে থাকাকালীন নিহত হন ২০ জন, গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন ১ জন ও ক্রসফায়ারে নিহত হন ১ জন। এছাড়াও অতি সাম্প্রতিককালে চিহ্নিত কোন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের নামে অনানুষ্ঠানিকভাবে অপহরণ করে গুম করে ফেলার নতুন প্রবণতা শুরু হয়েছে। ২৫ জুন ২০১০ তারিখে ঢাকা সিটি করপোরেশনের জনপ্রিয় কাউন্সিলর চৌধুরী আলম র‍্যাবের দ্বারা অপহৃত হন বলে অভিযোগ রয়েছে এবং পরে আজ পর্যন্ত তার আর কোন হদিস পাওয়া

www.pathagar.com

যায়নি। তার ব্যবহৃত গাড়িটি রাস্তায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। পরিবারের সদস্যদের কান্না আর আহাজারি বাতাস ভারি করে তুললেও চৌধুরী আলম আর ফেরেননি। এরকম আরও অনেক গুমের অভিযোগ উঠেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে ২০১০ সালে সারাদেশজুড়ে।

মো. সেলিম, মো. আকবর আলী সরদার, আয়ুব আলী সরদার, আবদুর রহমান, ফোরকান, নজরুল ইসলাম প্রমুখ ২০১০ সালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুমের শিকার কয়েকজনের মধ্যে অন্যতম। কোন মামলায় বা সন্দেহজনক ধারায় গ্রেফতারের পরপর পুলিশ কর্তৃক থানায় নিয়ে বা র‍্যাব কর্তৃক নিজ হেফাজতে নিয়ে বেদম প্রহারসহ অমানবিক দৈহিক নির্যাতন চালানোর ব্যাপারটিকে জনসাধারণ এরই মধ্যে গা-সওয়া স্বাভাবিক ঘটনা বা সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোর আইনগত অধিকার বলেই ধরে নিয়েছে। আর রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে পুলিশ বা র‍্যাব কর্তৃক অমানুষিক ভয়াবহ নির্যাতনের কথাও আজ সবার জানা। অথচ রিমাণ্ডের অপব্যবহার হয় এমনটা জানা থাকা সত্ত্বেও নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রতিনিয়ত বিনা প্রশ্নে রিমাণ্ড মঞ্জুর করার হিড়িক দেখে অসহায় জনগণের আরও বেশি অসহায় বোধ করা ছাড়া আর কিইবা করার আছে?

ক্রসফায়ার বা এনকাউন্টারের সাজানো গল্পের পাণ্ডুলিপি বারবার ব্যবহারের কারণে সাধারণ জনগণ এখন আর একেবারেই তার সত্যতায় বিশ্বাস করে না। ক্রসফায়ার শব্দটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সশস্ত্র আইনি বাহিনীর দ্বারা বেআইনিভাবে একজন নিরস্ত্র নাগরিককে হত্যার নিষ্ঠুর নির্মম এক দৃশ্য। দেশের সাধারণ নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান যাদের পেশাগত দায়িত্ব, তারা যখন লিমনের মত সাধারণ নাগরিকদের রক্ষা না করে বরং নিপীড়ন করে বা হেনস্তা করে বা হত্যা করে, আর তা কোন নিতান্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা না হয়ে ঘটতে থাকে নিয়মিতভাবে, তখন বুঝতে হবে সমস্যা বেশ গুরুতর রূপ ধারণ করেছে। চলতি বছরের এই তো গত মে মাসেও ৭ জন বাংলাদেশী নাগরিক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। এই জুন মাসেই মাত্র ১০ দিন আগে শুভ নামের এক নিতান্ত শিশু স্কুলছাত্রকে গুলি করে হত্যা আর তার ছোট ভাইটিকে আহত করার সচিত্র প্রতিবেদন টেলিভিশনে দেখার সময় ছেলেহারা মায়ের বিলাপ আর জানালায় প্রতিবেশী নারীর নীরবে চোখ মোছা দেখে নিজের চোখও বাধ মানেনি। শুভদের এমন অশুভ পরিণতি কবে থামবে?

এত কথা বলার পর এই লেখার শিরোনামে উল্লিখিত প্রশ্নটির উত্তর দিতে গেলে সামগ্রিকভাবে বলতে হবে—লিমনরা ভালো নেই। আর শুভরা পরিস্থিতির শিকার হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। দেশের নিরীহ সাধারণ নাগরিকেরা সত্যি ভালো নেই। জানমালের নিরাপত্তাহীনতা আজ চরমে। একদিকে দাগী অপরাধী আর লুটেরা

www.pathagar.com

মাস্তানদের ভয়ে যেমন কুঁকড়ে থাকতে হয় তাদের, তেমনি রেহাই মেলে না কোন কোন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দুর্নীতিবাজ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন সদস্যদের হাত থেকেও। এ যেন জলে কুমির আর ডাঙ্গায় বাঘের মত অবস্থা। এই অনাকাঙ্ক্ষিত বৈরী পরিস্থিতির অবসানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে যদি যথাযথ সংস্কারের মাধ্যমে প্রকৃত গণমুখী চরিত্রের করা যেত তবে হয়ত লিমনরা তথা সাধারণ নাগরিকেরা একটুখানি স্বস্তি আর নিরাপত্তাবোধ ফিরে পেত।

দৈনিক আমার দেশ-এ ২৪ জুন ২০১১ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

টোকাই বলে গালি দিলেন প্রতিমন্ত্রী?

দেশে সত্যি এক অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছেন, যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছেন। কোন জবাবদিহিতা যেন নেই। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকার অতি সম্প্রতি একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে মার্কিন কোম্পানি কনোকো ফিলিপসের সঙ্গে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান এবং এর উৎপাদন ভাগাভাগি নিয়ে। চুক্তিটি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়েছে বলে হৈচৈ বাধিয়ে দিয়েছেন দেশের বাম ভাবধারার কিছু লোকজন, যারা জাতীয় তেল-গ্যাস-বন্দর রক্ষা কমিটির নামে কাজ করে যাচ্ছেন অনেক দিন ধরে। তারা রাস্তায় মিছিল করেছেন, সংবাদ সম্মেলন করেছেন এমনকি নিজেদের সীমিত শক্তি নিয়ে সাহস করে ৩ জুলাই ২০১১ তারিখে অর্ধদিবস হরতালও ডেকেছিলেন। হরতালের দিন সরকারি নিপীড়ন ও অত্যাচারের সচিত্র প্রতিবেদন টেলিভিশনে দেখে এদের প্রতি সরকারের হিংস্র মনোভাবের মাত্রা আঁচ করা গেছে। তারা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে কনোকো ফিলিপসের সঙ্গে সম্প্রতি সম্পাদিত চুক্তিটির বেশ কিছু ধারা বিশেষ করে উৎপাদন ভাগাভাগির অংশটুকুসহ রফতানির সুযোগ দেয়ার অংশটুকুতে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে। তারা এ চুক্তিটি জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছেন, জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব করেছেন, চুক্তিটি সম্পূর্ণ বাতিল করে সরকারি প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে শক্তিশালী করে জাতীয় সম্পদ তেল-গ্যাস উত্তোলনের একক দায়িত্ব বাপেক্সকে দেয়ার দাবি করেছেন। আরও এক কাঠি বেড়ে তারা এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাকে প্রমাণিত দুর্নীতিবাজ বলে অভিহিত করে তার অপসারণও দাবি করেছেন। প্রতিক্রিয়ায় ক্ষমতাসীন সরকার যা করার কথা ছিল তা করেনি। চুক্তিটি জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি, জনমত যাচাইয়ের কোন ব্যবস্থা নেয়নি, চুক্তিটি সম্পূর্ণ বাতিল কিংবা চুক্তিতে বিদ্যমান দেশের স্বার্থবিরোধী ধারাগুলো বাতিলের ব্যাপারে কোন উদ্যোগও নেয়নি। বরং যা করার কথা নয় তাই করেছে। হৈচৈ বাধিয়ে দেয়া জাতীয় তেল-গ্যাস-বন্দর রক্ষা কমিটির লোকদের একহাত দেখিয়ে দিয়েছে। তাদের মিছিলে-মানববন্ধনে পুলিশ দিয়ে বেধড়ক পিটুনি দিয়েছে, কমিটির সক্রিয় সদস্যা রাজপথে সরব এক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিকাকে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আর সংসদে সরকারের এক প্রতিমন্ত্রী মহোদয় অশ্লীল ভাষায় এবং ভঙ্গিতে বিষোদগার করেছেন এ কমিটির নেতৃস্থানীয় লোকজনের বিরুদ্ধে ভব্যতার সব সীমারেখা অতিক্রম করে। কেন এমনটি করা হল?

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ একটি ফ্যাসিস্ট চরিত্রের দল যারা ভিন্নমত একেবারেই সহ্য করতে চায় না বা সহ্য করতে পারে না। এ কথাটি যুগে যুগে তারা ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে প্রমাণ করে এসেছে। ক্ষমতায় থাকলে তারা বিরোধী মতকে শুধু যে অগ্রাহ্য করে ক্ষান্ত হয় তা-ই নয়, বরং ভিন্ন মত দলনে তারা হিংস্রতম পথ অবলম্বনেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। ক্ষমতার বাইরে থাকলেও ফ্যাসিস্ট চরিত্রের এ দলটি তার বিরোধী মতবাদকে আমলে নিতে চায় না বরং তাড়া করে, হেনস্তা করে বাগে আনার চেষ্টা করে থাকে। স্বাধীনতা-পরবর্তী আমলে একচ্ছত্র আওয়ামী রাজত্বে বিরোধী মতবাদ হিসেবে জাসদের উত্থান ও সে সময়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ কর্তৃক জাসদ দমনের বেপরোয়া চেষ্টার বৃত্তান্ত প্রয়োজনীয় রেফারেন্স হিসেবে দেখা যেতে পারে। রক্ষীবাহিনী নামক পেটোয়া বাহিনী সৃষ্টি করে জাসদের হাজার হাজার নেতা-কর্মী হত্যা, গণকণ্ঠ নামক জাসদ সমর্থিত জাতীয় দৈনিক অফিসে হামলা করে সম্পাদক কবি আল মাহমুদকে গ্রেফতার, সিরাজ শিকদারকে পুলিশি হেফাজতে গুলি করে হত্যা প্রভৃতি নিকট-ইতিহাসেরই অংশ। পরবর্তী সময়ে বাকশাল কায়েমের মাধ্যমে এ দলটির ফ্যাসিবাদী চরিত্রের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল, যেখানে সব দল ও মতকে বেআইনি ঘোষণা করে এক দল এবং এক মতে শামিল হওয়ার জন্য বাধ্য করার চেষ্টা করা হয়। বাকশালের ধারাবাহিকতার সেই দলটি ঐতিহ্যগতভাবে যে আজও ভিন্ন মত দলন এবং দমনের ব্যাপারে একই নীতিতে অটল রয়েছে তা আবারও প্রমাণিত হল।

জাতীয় সম্পদের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করে জাতীয় উন্নয়ন সাধন আধুনিক রাষ্ট্রের প্রধানতম দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে আজ সর্বমহলে স্বীকৃত। বিশেষ করে আজকের যুগে তেল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের সীমিত মজুতের বাস্তবতায় সারা বিশ্বে রাষ্ট্রগুলো নিজেদের ভূখণ্ডে বিরাজমান এসব প্রাকৃতিক সম্পদের পরিকল্পিত সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আরও বেশি করে আগ্রহী হয়ে উঠছে। বিশ্বজুড়ে তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে গ্যাসের প্রকৃত মজুত নির্ণয় ও নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করে আমাদের অর্থনীতিকে সচল রাখার যে চ্যালেঞ্জ তা মোকাবিলা করা আজ জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

বিদ্যুৎ আর গ্যাসের গভীর সঙ্কটে আজ দেশজুড়ে হাহাকার চলছে। সরবরাহ সঙ্কটের দোহাই দিয়ে আবাসিক বাণিজ্যিকসহ সব ধরনের নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া বন্ধ করে রেখেছে এ সরকার। গ্যাসের নতুন সংযোগ দেয়াও বন্ধ রয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। আবাসন শিল্পে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগের এ অনিশ্চয়তায় সৃষ্টি হয়েছে গভীর হতাশা ও অচলাবস্থা। আবার গ্যাস-বিদ্যুতের সঙ্কটে এবং নতুন সংযোগের অভাবে নতুন শিল্প কারখানায় বিনিয়োগ হচ্ছে না একেবারেই। আমাদের অধিকাংশ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গ্যাসচালিত (৮০% বলে জানা যায়) এবং অধিকাংশ বৃহৎ বা

www.pathagar.com

মাঝারি শিল্প কারখানাই হয় সরাসরি গ্যাসনির্ভর কিংবা নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনে সার্বক্ষণিকভাবে গ্যাস ব্যবহার করে থাকে। এমতাবস্থায় দেশের চালু বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোয় উৎপাদন অব্যাহত রেখে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সামাল দেয়া এবং গ্যাসনির্ভর শিল্প কারখানাগুলোকে চলমান রাখার জন্য নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার ও বিদ্যমান গ্যাসক্ষেত্রগুলোয় নতুন নতুন কূপ খনন করার প্রয়োজন রয়েছে। সেক্ষেত্রে যে বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে তা হয় সরকারি প্রতিষ্ঠান বাপেক্সের মাধ্যমে নিজস্ব উৎস থেকে অথবা বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তির মাধ্যমে সংস্থান করা যেতে পারে।

দেশীয় অথবা বিদেশি যে উৎস থেকেই বিনিয়োগের সংস্থান করা হোক না কেন, এ ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন জাতীয় স্বার্থ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার লাভ করে। প্রশ্ন হল, কনোকো ফিলিপসের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির ক্ষেত্রে কি পূর্ণমাত্রায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা গেছে কিংবা জাতীয় স্বার্থ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার লাভ করেছে? এ প্রশ্নগুলোই মূলত তুলে ধরেছেন নানাভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ অন্য অনেকের মত জাতীয় তেল-গ্যাস-বন্দর রক্ষা কমিটির নেতারা। সরকার ছাড়া সবাই বলছে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়নি এবং জাতীয় স্বার্থও রক্ষা হয়নি। তাহলে চুক্তিটি কেন করা হল? কার স্বার্থ রক্ষা হল? এবং কিসের বিনিময়ে? উত্তর হল সোজা। দুর্নীতি ও লুটপাট করে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে লাভবান করার জন্য দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এ ধরনের চুক্তি করা হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে মার্কিন কোম্পানি কনোকো ফিলিপসকে অধিক হারে উৎপাদন-এর ভাগ দিয়ে লাভবান করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকারের লুটেরা অংশটি। চুক্তিতে আহরিতব্য গ্যাস বা তেল রফতানি করার অধিকার দিয়েও দেশের ও জনগণের স্বার্থকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। আর কারিগরি জটিলতা, স্পর্শকাতরতা ও অন্য নানা কারণ দেখিয়ে চুক্তিটি গোপনে মুসাবিদা ও সম্পাদন করা হয়েছে যেন দেশের মানুষ অন্ধকারেই থাকে এ ব্যাপারে। পরিতাপের বিষয় হল এই যে, দেশের আপামর জনগণের সম্পদ বরাদ্দ বা লিজ বা উৎপাদন ভাগাভাগির চুক্তি করা হয়ে যায় গুটিকয়েক অসৎ আমলা, লুটেরা রাজনীতিবিদ আর বেনিয়া দুর্বৃত্তের যোগসাজশে জাতীয় সম্পদের প্রকৃত মালিক দেশের জনগণকে কিছু না জানিয়েই। এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে কথা বলতে গেলে ক্ষমতাসীন লুটেরা গোষ্ঠীর আঁতে ঘা লেগে যায়, যা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে দেশপ্রেমিক সচেতন সবাইকে এ বিষয়ে অবশ্যই কথা বলতে হবে। জাতীয় সম্পদ নিয়ে যেকোন ধরনের চুক্তি করতে হলে অতি অবশ্যই চুক্তির খসড়া জাতীয় সংসদে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার জন্য উপস্থাপন করতে হবে, প্রকাশ্যে চুক্তির ভালো-মন্দ দিকগুলো নিয়ে জনসাধারণের

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খোলামেলা আলোচনাকে উৎসাহিত করতে হবে, জনমত যাচাই করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সবার মতামত আমলে নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ ধরনের যে কোন চুক্তি করার ব্যাপারে অগ্রসর হতে হবে। কারণ জাতীয় সম্পদের ব্যাপারে মতামত দেয়ার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের। এ অধিকার শুধু মন্ত্রী মহোদয়, উপদেষ্টা মহোদয়, সচিব মহোদয় বা প্রভাবশালী দালালদের কুক্ষিগত করে রাখা দেশের স্বার্থের অনুকূল নয় কোনভাবেই।

যে প্রতিমন্ত্রী মহোদয় জাতীয় তেল-গ্যাস-বন্দর রক্ষা কমিটির নেতাদের গালমন্দ করেছেন জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে, তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী নন। অতএব তেল-গ্যাস অনুসন্ধান বা উৎপাদন ভাগাভাগি সংক্রান্ত চুক্তির ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতাহীন প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের হঠাৎ করে চুক্তির বিরোধিতাকারীদের বিপক্ষে সরব হয়ে ওঠার কোন যুৎসই কারণ আমি অন্তত খুঁজে পাইনি। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বিশ্বজুড়ে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে নিয়োজিত কোম্পানিগুলো তাদের কাজের ধরনের কারণে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে থাকে বলে যে কোন দেশের পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এ জাতীয় কোম্পানিগুলোর খিটিমিটি লেগেই থাকে। অতএব এ চুক্তির ফলে বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশের সম্ভাব্য ক্ষতি ও তার যথোপযুক্ত প্রতিকার নিয়ে প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের যথেষ্ট মাথাব্যথা থাকার কথা ছিল। কিন্তু সংসদে তার দেয়া বক্তব্যের কোথাও পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি নিয়ে মৃদু কোন আপত্তিও তার মুখ থেকে উচ্চারিত হতে শুনিনি।

তার যা করার কথা তিনি তা তো করলেনই না, বরং জাতীয় তেল-গ্যাস-বন্দর রক্ষা কমিটির নিরীহ নেতাদের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই জাতীয় সংসদে তুলাধোনা করলেন অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায়। সেদিনকার সব টেলিভিশন চ্যানেলে প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের এ বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে প্রচারিত হয়েছে। দেখলাম তিনি বলছেন, কোথাকার কোন্ মনু মুহাম্মদ না আনু মুহাম্মদ, এরা আলোচনায় থাকার উদ্দেশ্যে যে কোন কিছু করতে পারে। এমনকি মানুষের মাথায় প্রস্রাব করে হলেও এরা আলোচনার শীর্ষে থাকতে চায় বলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন প্রতিমন্ত্রী মহোদয়। তিনি অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক তেল-গ্যাস চুক্তির কী বোঝেন বলে প্রশ্ন তুললেন ক্ষিপ্ত স্বরে এবং এসব হৈচৈ বাঁধানো তুচ্ছ নেতাদের বিদেশি চর বলেও অপবাদ দিলেন। সবকিছুর পর চরম উত্তেজিত ভঙ্গিতে এদের 'টোকাই' বলে অভিহিত করে তিনি কী বোঝাতে চাইলেন ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কি এদের গালি দিয়ে দিলেন? কী জানি। টোকাই মানে কী? এটা কী গালি হতে পারে?

একজন প্রতিমন্ত্রী বক্তব্য রাখছেন জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে। তার সেদিনকার বক্তব্যে স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধ ও সৌজন্যতার অভাব ছিল বিশেষভাবে

www.pathagar.com

লক্ষ্যণীয়। সরকারি দুর্নীতি ও অনাচারের প্রতিবাদকারী বাংলাদেশের নাগরিকদের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু বিশিষ্ট অংশের নেতাদের বিরুদ্ধে প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের মুখে অশ্লীল শব্দের ব্যবহার রীতিমত অশোভন ঠেকেছে। তার অঙ্গ ও মুখভঙ্গি ছিল তাকে প্রদত্ত পদমর্যাদার সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

যে দেশের সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রী তিনি; সেই দেশেরই নাগরিকদের কাউকে হেয় করে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করে নিজেকে জাহির করার হীন মানসিকতা নিন্দনীয় বলে মনে হয়েছে। সরকারের কর্মরতদের সঙ্গে স্বাধীন দেশে নাগরিকদের নানা বিষয়ে মতের অমিল হতেই পারে এমনকি একই বিষয়ে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে এমন অভব্য আচরণ একজন প্রতিমন্ত্রীর কাছ থেকে গ্রহণযোগ্য নয় কোনমতেই। যাদের তিনি বিদেশের চর বলে অপবাদ দিয়েছেন তারা আবার উল্টো তার সরকারের সম্পাদিত এসব চুক্তিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতজানু হওয়া ও জাতীয় সম্পদ বিকিয়ে দেয়ার শামিল বলে আখ্যায়িত করেছেন। মার্কিন কোম্পানি কনোকো ফিলিপসের সঙ্গে আলোচ্য এ চুক্তিটি নিজের বিদায় গ্রহণের আগেই স্বাক্ষরের ব্যাপারে সদ্য বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন এফ মরিয়ার্টি সাহেবের বিশেষ তদবিরের খবর তো পত্র-পত্রিকার গুণে সবারই জানা। বড়ই জটিল এ পাল্টাপাল্টি অপবাদের অংক। কে কারে চর বলে, কে যে চর কে জানে? আমার মত আমজনতার একজনের পক্ষে প্রকৃত চরের পরিচয় কখনোই জানা সম্ভব নয়।

প্রতিমন্ত্রী মহোদয় যে নিজেকে সম্প্রতি অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হিসেবে গণ্য করেন তা তার বক্তব্য থেকে বেশ বোঝা গেছে। আরও যেটা স্পষ্টতই বোঝা গেছে, যারা তার মত প্রতিমন্ত্রী বা সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত নন তাদের তিনি কী দৃষ্টিতে দেখেন। নিষ্ঠুর বাস্তবতা হলেও সত্য যে, দেশের অধিকাংশ মানুষই আজ টোকাই শ্রেণীভুক্ত। আমার বোধবুদ্ধি অনুযায়ী, টোকাই মানে হল সেই শ্রেণী যারা নিঃস্ব, যারা সর্বস্বান্ত, যারা বাঁচার প্রয়োজনে যেখানে যা পায় সেই খড়কুটা আঁকড়ে ধরে, টুকিয়ে টুকিয়ে বা কুড়িয়ে কুড়িয়ে ন্যূনতম প্রয়োজনের সংস্থান করে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে যায়। রনবী নামের খ্যাতিমান কার্টুনিস্টের সৃষ্ট এই জনপ্রিয় চরিত্রটি যে মায়া আর যে মমতা দিয়ে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতীক হিসেবে গড়ে উঠেছিল, তার বিপরীতে প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের টোকাই বলে দেয়া গালি প্রমাণ করে যে তার হৃদয়ে সে মমতা নেই, সে মায়া নেই। আছে তুচ্ছ করার বিষতুল্য বিদ্বেষ, আছে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণী থেকে বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতি নিক্ষিপ্ত নির্জলা ঘৃণা। আভিজাত্যের গরিমায় উল্লম্ফনরত আওয়ামী প্রতিমন্ত্রীর কাছে অবশেষে এই কি প্রাপ্য ছিল সংখ্যাগুরু হতভাগা দেশবাসীর?

দৈনিক আমার দেশ-এ ৯ জুলাই ২০১১ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

হরতাল, বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ এবং পুলিশি তাণ্ডব

গত ৬ ও ৭ জুলাই ২০১১ তারিখে বিরোধীদল বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে দেশব্যাপী একটানা ৪৮ ঘণ্টা হরতাল পালিত হয়েছে। সেই হরতালকে উপলক্ষ করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার নজিরবিহীন নিপীড়ন-অত্যাচার চালিয়েছে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। হরতালের আগের রাতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সভাপতি সুলতান সালাহউদ্দিন টুকুসহ সারা দেশের অসংখ্য বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে রিমাণ্ডে নিয়েছে অথবা কারাগারে নিক্ষেপ করে হরতাল ঠেকানোর চেষ্টা করেছে ক্ষমতাসীন সরকার। হরতালে টুকু যেন কোন সাংগঠনিক ভূমিকা না রাখতে পারেন সে জন্যই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, রিমাণ্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন করা হয়েছে এবং নানা সাজানো মামলায় নানা অজুহাতে অদ্যাবধি তাকে আটকে রাখা হয়েছে এই ব্যাপারটি সবাই বোঝেন। বিরোধী দলের ডাকা হরতাল ঠেকানোর কৌশল হিসেবে এমন কর্মকাণ্ড বহুকাল ধরেই চালিয়ে যাচ্ছে দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও জনগণের জানমাল রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী ক্ষমতাসীন দলের ইঙ্গিতে, প্রশ্রয়ে এবং অভিভাবকত্বে।

হরতালের দিন সারাদেশে পুলিশ, র‍্যাবসহ আর্মড পুলিশবাহিনী দেশের সর্বত্র বিএনপির কার্যালয়গুলো অবরুদ্ধ করে রাখে যেন কোন নেতাকর্মী সেখানে প্রবেশ করতে না পারে বা সেখান থেকে বেরও না হতে পারে। সরকারের নির্দেশে পুলিশবাহিনী রাস্তায় বিএনপি বা এর অঙ্গসংগঠনগুলোর মিছিল বা অবস্থান দেখামাত্রই তাড়া করেছে, লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে, কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছে এবং নির্বিচারে টেনেহিঁচড়ে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে হরতাল সমর্থকদের। ঢাকায় নয়াপল্টনে অবস্থিত বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশ, র‍্যাব ও আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়নের সংখ্যাধিক্য ছিল চোখে পড়ার মত। বিএনপি নেতাকর্মীরা সরকারের উপরোক্ত বাহিনীগুলো দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকা তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ধারেকাছে ঘেঁষতেই পারেনি। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর র‍্যাব-পুলিশের কড়া নজরদারির মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও যুগ্ম মহাসচিব রিজভী আহমেদকে সঙ্গে করে তার দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের রাস্তায় চেয়ার পেতে অসহায়ভাবে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। সেই অবরুদ্ধ অবস্থায় গণমাধ্যমের

www.pathagar.com

সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনে সরকারের এহেন আচরণকে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেন। আওয়ামী লীগ সরকার এর মাধ্যমে দেশে পুলিশি রাষ্ট্র কায়েম করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। সব টেলিভিশন চ্যানেলেই হরতালের দিনের এই চিত্র সারাদিন ধরে প্রচারিত হয়েছে।

সবকিছু ছাপিয়ে হরতালের দিন আলোচনার শীর্ষে উঠে আসে বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুকের সঙ্গে পুলিশের নজিরবিহীন অসদাচরণ। সংসদ অধিবেশন তখন চলছে। ডান হাতে ব্যাণ্ডেজসহ ঝুলনা বাঁধা অবস্থায় বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মহোদয় নিজ দলীয় কয়েকজন সংসদ সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে ফার্মগেট এলাকার রাস্তায় হরতালের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। এ সময়ে পুলিশ এসে তার সঙ্গে অশোভন আচরণ শুরু করে বলে জানা যায়। তাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকে, এমনকি তার গায়ে হাত দেয়। এমনতর অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তিনি তার সঙ্গী সংসদ সদস্যদের নিয়ে সংসদ এলাকার দিকে ফিরে আসতে থাকেন। উদ্ধত দু'জন পুলিশ কর্মকর্তা তাদের অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মহোদয়ের পিছু নেয়, অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করতে থাকে এবং থাপ্পড় মেরে তার দাঁত ফেলে দেয়ার হুমকি দেয়। তার ওপর চড়াও হয়ে তারা প্রথমে তার আঘাতপ্রাপ্ত হাতের ঝুলনা টেনে খুলে নেয়। এরপর আঘাতপ্রাপ্ত হাতের ব্যাণ্ডেজও নির্মমভাবে খুলে ফেলে। বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মহোদয় পিছু হটতে থাকেন মারমুখী পুলিশের নির্দয় আঘাতবৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচানোর স্বাভাবিক চেষ্টায়। কিন্তু পুলিশ দলটি তাকে অমানবিকভাবে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে এবং গায়ের টি-শার্ট খুলে তাকে অর্ধ উলঙ্গ করে ফেলে। প্রকাশ্য দিবালোকে তাকে মাটিতে ফেলে ক্রমাগত লাঠির আঘাতে, ঘুষিতে এবং বুটের লাথিতে পর্যুদস্ত করে। তার মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে মোটামুটি পুরো ঘটনাটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ হিসেবে প্রচার হতে থাকায় সারা দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায় হরতালের প্রথম দিনে আওয়ামী সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশ বাহিনীর এই অমানবিক কর্মকাণ্ড। হায়রে গণতন্ত্র! হায়রে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরোধীদল আর তার ভূতলে লুটিয়ে পড়া চিফ হুইপ!

লাঞ্ছিত বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মহোদয় পরবর্তী সময়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত এবং গুরুতর আহত অবস্থায় সংসদ সদস্যদের জন্য নির্ধারিত আবাসিক এলাকায় সরে এসেও নিস্তার লাভ করতে পারেননি। সেখানেও পুলিশ বাহিনীর ক্ষ্যাপাটে দলটি তাকে অনুসরণ করে যায় এবং পুনরায় নির্যাতনের উদ্দেশ্যে তাড়া করলে তিনি নিরূপায় হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে দৌড়ে পালাতে থাকেন। বেপরোয়া পুলিশ বাহিনীও তার পিছু পিছু ছুটে গিয়ে ন্যাম ভবনের নিচতলা থেকে টেনে-হিঁচড়ে প্রহার করতে করতে বের করে আনে এবং চ্যাংদোলা অবস্থায় চরম অবমাননাকরভাবে

www.pathagar.com

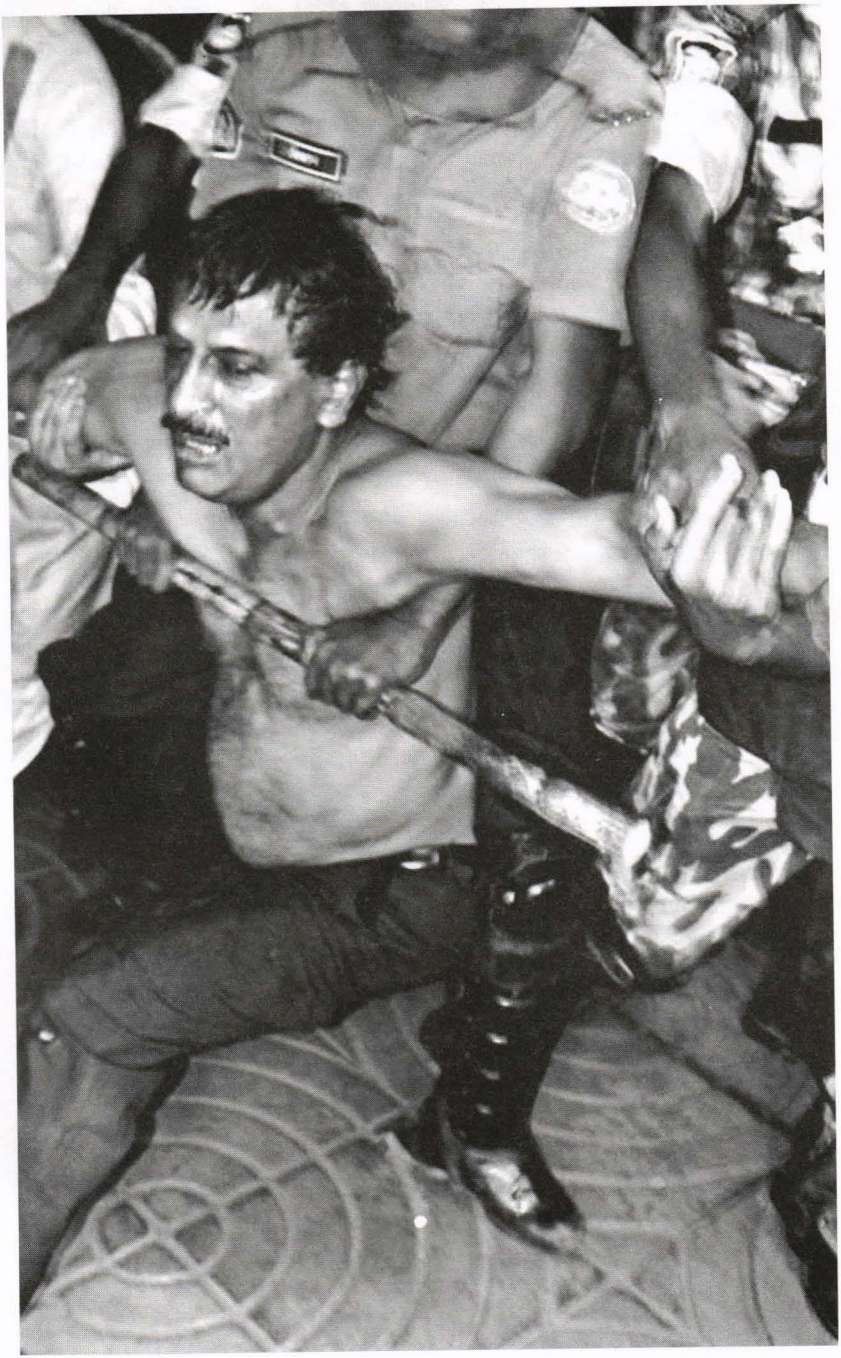

www.pathagar.com

তাকে পুলিশ ভ্যানে তোলে। এই অমানবিক প্রহার এবং হেনস্থায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মহোদয়। সে অবস্থায় কী ভেবে যেন পুলিশের দলটি হঠাৎ তাকে পুলিশ ভ্যান থেকে জড় পদার্থের বস্তার মত ধাক্কা মেরে পিচঢালা শক্ত রাস্তার ওপর ফেলে দেয়। ভীত-সন্ত্রস্ত ছুটোছুটি, চিৎকার-চেঁচামেচি, অসহায় কান্না আর হট্টগোলের মাঝে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে প্রস্থান করে পুলিশ বাহিনীর সেই তাণ্ডবরত দলটি। গুরুতর আহত অবস্থায় বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মহোদয়কে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। টেলিভিশনের পর্দায় ঘটনাটি দেখার সময় গা কাঁটা দিয়ে উঠছিল বার বার। এ কেমন আচরণ স্বাধীন দেশের পুলিশ বাহিনীর? যে কোন সাধারণ নাগরিকের সঙ্গেও তো এমনটি করার কথা নয় তাদের। সেখানে সংসদ অধিবেশন চলা অবস্থায় সংসদের বিরোধী দলীয় চিফ হুইপের সঙ্গে তারা এমন আচরণ করল কীভাবে? এরা কী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর শৃঙ্খলাবদ্ধ কোন সদস্য, নাকি বিশেষ উদ্দেশ্যে লেলিয়ে দেয়া উচ্ছৃঙ্খল কোন দূর্বৃত্ত—এই প্রশ্নটি তাৎক্ষণিকভাবে জেগে উঠছিল মনে।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে হরতাল চলাকালীন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রুটিন ব্রিফিংয়ের সময় সাংবাদিকবৃন্দ এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি উল্টো বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মহোদয়কেই আরও দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মহোদয় বিরোধী দলের চিফ হুইপের ওপর এই আক্রমণকে পুলিশের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে চিত্রিত করলেন এবং তারা বিরোধী দলে থাকাকালীন তাদের দলের কোন্ কোন্ নেতা হেনস্থা হয়েছিলেন তার ফিরিস্তি দিয়ে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করলেন। সংসদে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরাসহ মহাজোটের বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য বিরোধী দলীয় চিফ হুইপের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় কোন রকম নিন্দা বা সমবেদনা জানানো তো দূরের কথা বরং তাকেই দায়ী করে তার শাস্তি দাবি করলেন।

স্পিকার মহোদয় বিরোধী দলীয় চিফ হুইপের ওপর আক্রমণের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে বলবেন বলে যেন নিতান্তই দায় সারলেন। এদিকে দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা দৈনিক প্রথম আলো ঘটনার পরদিন তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি বিভ্রান্তিকর ছবিক্রম ছাপিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করল যে বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ ঢিল ছুঁড়ছিলেন বলে পুলিশ তার সঙ্গে এমন আচরণ করেছে। কিন্তু পরের দিন দৈনিক আমার দেশ-এ সেই একই ভঙ্গির ছবি আরও ক্লোজ করে প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে তিনি আসলে ঢিল ছুঁড়ছিলেন না বরং পুলিশের আক্রমণ থেকে নিজের মোবাইল ফোনটিকে ওপরে তুলে রক্ষার চেষ্টা করছিলেন মাত্র। তার হাতে ঢিল ছিল না, ছিল তার নিজেরই মোবাইল ফোনটি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় সংসদে ৩০০ বিধিতে উপরোক্ত শীর্ষ দৈনিকটির বিভ্রান্তিকর ছবি ও প্রতিবেদন উদ্ধৃত করেই দায়সারা এক বিবৃতি দিলেন।

www.pathagar.com

আশ্চর্যজনকভাবে দুদিন বাদে প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করেছেন বলে টেলিভিশনে স্ক্রল চলতে দেখলাম এবং তার পরদিন সংবাদপত্রে এ সংক্রান্ত খবর ছাপা হতে দেখলাম। ততক্ষণে হয়ত জনমত যে সরকারের মিথ্যা ভাষণে বিভ্রান্ত হয়নি তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে সরকার এবং বিরোধী দলীয় চিফ হুইপের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশ বাহিনীর চালানো নির্যাতন যে জনগণ মোটেও পছন্দ করেনি তার লক্ষণ স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর টকশোতে অংশগ্রহণকারীরা দলমত নির্বিশেষে এর নিন্দা জানাতে থাকেন এবং এমনতর আচরণ অভিপ্রেত নয় বলে বাতাস বেশ কিছুটা গরম করে তোলেন। এর মধ্যে পুলিশের একজন সাবেক আইজি যিনি এক সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাও ছিলেন, তিনি কোন একটি টিভি চ্যানেলে মন্তব্য করেন, যে কোন পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করার প্রশিক্ষণই তো দেয়া হয়ে থাকে পুলিশ সদস্যদের। তার মতে পুলিশের যে সদস্যরা এমন অনিয়ন্ত্রিত আচরণ করেছে তারা সঠিক কাজ করেনি। তামাশার মত শোনালেও সত্য যে, পুলিশ কর্তৃক তাদের কর্তব্য কাজে বাধা দানের অভিযোগে ঘটনার দিনেই নির্যাতিতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় কিন্তু এর বিপরীতে নির্যাতিতের পক্ষ থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে নির্যাতনের মামলা করতে গেলে থানা থেকে তা গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অবশেষে ১০ জুলাই ২০১১ তারিখে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিরোধী দলীয় চিফ হুইপের পক্ষ থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে যা আমলে নিয়ে মাননীয় আদালত ঢাকার পুলিশ কমিশনারকে বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষে প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছেন। দেখা যাক ১০ আগস্ট ২০১১ তারিখে নির্ধারিত শুনানির দিনে আদালতে কী প্রতিবেদন দাখিল করেন ঢাকার পুলিশ কমিশনার।

যে দু'জন পুলিশ কর্মকর্তা সেদিন এই ঘটনা ঘটিয়েছেন তাদের পরিচয় ছাপা হয়েছে পরদিনের পত্রিকায়। একজন এডিসি হারুন অর রশীদ এবং অন্যজন এসি বিপ্লব সরকার। তারা দু'জনই ছাত্রলীগের সাবেক নেতা বলে জানা গেছে প্রকাশিত সংবাদ সূত্রে। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের সাবেক নেতা ছাত্রত্ব শেষে পেশা হিসেবে পুলিশের কর্মকর্তা হবেন এতে দোষের কিছুই দেখি না। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন কেউ পেশা হিসেবে পুলিশের দায়িত্ব নেয়ার পরও পেশাদারিত্বের শপথ বা এই পেশার প্রধান শর্ত শৃঙ্খলাবোধ ভুলে গিয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ রাজনৈতিক কর্মী বা ক্যাডারের মত আচরণ করতে থাকেন। পেশাগত নির্দেশ সূত্র বা চেইন অফ কমান্ড ভেঙে যখন কোন পুলিশ কর্মকর্তার আনুগত্য সমর্পিত হয় নিজের বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বদলে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কোন কোন নেতার অধীনে, তখন সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আর পেশাগত কুশলতা ও কর্মদক্ষতার মূল্যায়ন না হয়ে নিছক রাজনৈতিক আনুগত্যের মাপকাঠিতে যখন চাকরির পদোন্নতি বা পদাবনতি নির্ধারিত হয়, তখন এমনতর উচ্ছৃঙ্খলতা তো প্রকট হয়ে উঠবেই।

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আশীর্বাদপুষ্ট বা স্নেহধন্য এই মহাবলশালী দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে বিভাগীয় শাস্তি দেয়া তো দূরের কথা, তাদের দোষী সাব্যস্ত করতে পারে এমন বুকের পাটা আছে কি তাদের ঊর্ধ্বতন কোন পুলিশ কর্মকর্তার? 'ওদের অন্যায় হয়েছে বা ওরা বাড়াবাড়ি করেছে। অতএব ওদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে'—এমনটি নির্ভয়ে বা নির্দ্বিধায় প্রকাশ্যে বলতে পারেন সেই পেশাগত সৎ সাহস আছে এমন পুলিশ কর্মকর্তা আজ হয়ত সমগ্র পুলিশ বাহিনীতে নিচু থেকে উঁচু কোন পর্যায়েই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। গণহারে দলীয়করণ, আঞ্চলিকীকরণের নামে বহুল প্রচারিত গোপালগঞ্জীকরণ, আর দুর্নীতি ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে পুলিশ বিভাগে পেশাদারিত্বের এই যে গভীর সঙ্কট তৈরি করা হল—কে জানে কবে কীভাবে এর সুরাহা হবে? ঢোক গিলে হলেও আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ জনসম্পৃক্ত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুলিশ বিভাগ আজ নৈতিকতা, শৃঙ্খলা আর পেশাদারিত্বের মানদণ্ডে সর্বনিম্ন এক পর্যায়ে অবস্থান করছে। তাই পুলিশ কর্তৃক বিরোধী দলীয় চিফ হুইপকে অমানুষিক নির্যাতনের ঘটনার তদন্ত করার জন্য সেই পুলিশেরই লোক দিয়ে নামকাওয়াস্তে তদন্ত কমিটি গঠন করার সরকারি ঘোষণা নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কিছুই না। বরং স্পিকার মহোদয়ের উচিত ছিল সংসদের অভিভাবক হিসেবে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠন করে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করা এবং এ ব্যাপারে দায়ীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করা। পরিতাপের কথা যে, তিনিও তা করতে পারলেন না। দলীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারলেন না সব সংসদ সদস্যের কথিত অভিভাবক স্পিকার মহোদয়।

সাম্প্রতিক এই ঘটনাটির ওপর লিখতে বসে একটু বিস্তারিত ধারা বর্ণনা দিয়েছি। একঘেয়েমি মনে হলে পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবে ঘটনার ভয়াবহতা এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সবার স্ব স্ব ভূমিকা যথাসম্ভব তুলে ধরার জন্য এর প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য এক অংশ হতে যাচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তী আমলে বেপরোয়া আওয়ামী সরকারের সীমাহীন নিপীড়নের সঙ্গে ইদানীংকার অমানবিক ঘটনাবলীর মিল খুঁজে পাচ্ছেন অনেকেই। সেই রক্ষীবাহিনী, সেই পুলিশ আর সেই আওয়ামী ক্যাডারদের মিলিত তাণ্ডব! ক্ষমতার দম্ভে মাটিতে পা না ফেলা আওয়ামী গর্জনের বিপরীতে ইদানীং নিরীহ-নিপীড়িত মানুষের গুমোট কান্না শুনতে কি পান কেউ কেউ? এই গুমোট কান্না যে গগনবিদারী হুঙ্কারে পরিণত হয়ে হঠাৎ কখনও অত্যাচারীর মসনদ চুরমার করে দেবে না, সেই ঘুমপাড়ানী নিশ্চয়তা কে কবে কারে দিতে পেরেছে?

দৈনিক আমার দেশ-এ ১২ জুলাই ২০১১ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

বিচারপতি তোমার বিচার...

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখব ভাবতে ভাবতে কৌতূহলী হয়ে সেদিন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা সংক্ষেপে টিআইবি পরিচালিত দেশব্যাপী খানা জরিপ ২০১০-এর প্রতিবেদনটির সার-সংক্ষেপ ইন্টারনেট ঘেঁটে প্রিন্ট নিয়েছিলাম পড়ার জন্য। মনে পড়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর সারাদেশে মোটামুটি শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। শোরগোলের প্রধান কারণ ছিল, অপ্রত্যাশিতভাবে উপরোক্ত প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এর আগের বছরের চ্যাম্পিয়ন পুলিশ বিভাগকে পেছনে ফেলে বিচার বিভাগ ২০১০ সালের প্রতিবেদনে শীর্ষ স্থানটি দখল করে নেয় এই প্রতিবেদন অনুসারে। সততায় বা দক্ষতায় এই অগ্রগতি হলে তো কোন কথা ছিল না। কিন্তু দুর্নীতিতে দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পুলিশ বিভাগকে এভাবে টপকে যাওয়া প্রতিষ্ঠানের নাম বিচার বিভাগ হওয়ার কারণে সবাইকে একটু নড়েচড়ে বসতে হয় বাধ্য হয়েই। সরকারের অন্য কোন বিভাগ এ ব্যাপারে পুলিশ বিভাগকে হারিয়ে দিলে হয়ত এতটা চমকানো প্রতিক্রিয়া হত না সবার। বিচার বিভাগ বলে কথা! দেশের মানুষের সর্বশেষ আশা-ভরসার আশ্রয়স্থল। যেখানেই সমস্যা হোক না কেন বা সরকারের যে বিভাগই নিগৃহীত করুক না কেন, বিচার বিভাগে গিয়ে কোন রকমে পৌঁছাতে পারলে এর যথোপযুক্ত প্রতিকার পাওয়ার এক ধরনের ভরসা মনে মনে লালন করেন দেশের সাধারণ মানুষ। টিআইবি প্রণীত প্রতিবেদনটির সার-সংক্ষেপ মোটামুটি মনযোগ দিয়ে পড়লাম এবং প্রতিবেদনে তুলে ধরা তথ্যকে ভিত্তি করেই মূলত আজকের লেখাটি সাজালাম।

দেশের ১২টি সুনির্দিষ্ট সেবাখাতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছে টিআইবি এই জরিপ পরিচালনা করতে গিয়ে। খাতগুলো হল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা পুলিশ বিভাগ, ভূমি প্রশাসন, কর ও শুল্ক, বিদ্যুৎ, কৃষি, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য, বীমা, ব্যাংক, শিক্ষা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও এবং বিচার বিভাগ। দেশজুড়ে পরিচালিত জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে শতকরা ৮৪ জনই উপরোক্ত খাতগুলোতে সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে দুর্নীতির মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন বলে জানিয়েছেন। সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের খাতওয়ারি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চোখে পড়ে, বিচার বিভাগেই দুর্নীতির মাত্রা সর্বোচ্চ। বিচার বিভাগে সেবা গ্রহণ করেছেন এমন উত্তর দাতাদের মধ্যে শতকরা ৮৮ জনই কোন

www.pathagar.com

না কোনভাবে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা পুলিশের কাছে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন শতকরা ৮০ জন আর ভূমি প্রশাসনের কাছে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন শতকরা ৭১ জন উত্তরদাতা। পুলিশ ও ভূমি প্রশাসন যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রথম স্থানটি অধিকার করে নিলেন বিচার বিভাগ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের বেশ বড় ব্যবধানে পেছনে ফেলে। এমনই এক কৃতিত্ব অর্জন করলেন আমাদের শেষ আশা-ভরসার স্থল বিচার বিভাগ যার উপলক্ষে তাদের অভিনন্দন জানানোও সম্ভব হচ্ছে না। আবার প্রথাসিদ্ধ কোন রকমের সংবর্ধনারও আয়োজন করা যাচ্ছে না। কেবলই লজ্জা, কেবলই হতাশা, কেবলই দীর্ঘশ্বাস! এ কেমন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন আমাদের বিচার বিভাগ?

উল্লেখ্য, টিআইবি পরিচালিত ২০০৫ এবং ২০০৭ সালের খানা জরিপেও বিচার বিভাগ বাংলাদেশের দুর্নীতিগ্রস্ত খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। যথোপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা না নেয়ার কারণে বিচার বিভাগের দুর্নীতিগ্রস্ততা বাড়তে বাড়তে ২০১০ সালে এসে লজ্জাকর এক শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করেছে! প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে, দেশব্যাপী পরিচালিত জরিপে অংশগ্রহণকারী মোট উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ১১ জন বিচার বিভাগে সেবাপ্রার্থী হয়েছিলেন। তার মধ্যে শতকরা ৮৮ জনই দুর্নীতি এবং হয়রানির শিকার হন। বিচার বিভাগে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার নগর এলাকায় তুলনামূলকভাবে বেশি যা শতকরা ৯০ জন এবং বিপরীতে গ্রামীণ এলাকায় শতকরা ৮৬ জন বলে প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে। জরিপে উল্লিখিত বিচার প্রার্থীদের মধ্যে শতকরা ৩১ জন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে, শতকরা ৬০ জন জজকোর্টে এবং শতকরা ৮ জন হাইকোর্টে মামলা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। উদ্বেগের বিষয় হল এই যে, উপরোক্ত সব আদালতের বিচার প্রার্থীদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনকেই বিচার লাভ করতে গিয়ে ঘুষ দিতে হয়েছে। ঘুষ গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিচারিক আদালত হাইকোর্ট অধস্তন নিম্ন আদালতসমূহ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও জজকোর্টকে পেছনে ফেলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। বিচার প্রার্থীদের মধ্যে শতকরা ৭৪ জন হাইকোর্টে, শতকরা ৭০ জন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এবং শতকরা ৫৮ জন জজকোর্টে ঘুষ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। উত্তরদাতা শতকরা ৪১ জন বিচারপ্রার্থী বিচারের প্রক্রিয়ায় অসহনীয় বিলম্ব বা দীর্ঘসূত্রিতা এবং লাল ফিতার দৌরাত্ম্যের কথা বলেছেন। পাশাপাশি বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন তাদের আইনজীবী দ্বারা, শতকরা ২৪ জন আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারী দ্বারা, শতকরা ১৭ জন আইনজীবীদের সহকারী বা মুহুরি দ্বারা এবং শতকরা ৩ জন দালাল দ্বারা হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। একইভাবে শতকরা ৯ জন বিচারপ্রার্থী রায় বা আদেশ বা কোন কাগজ তুলতে গিয়ে হয়রানির শিকার হয়েছেন এবং শতকরা ৪ জন বিচারপ্রার্থী প্রতারণা, নোটিশ বা সমন না পাওয়া, দুর্ব্যবহার,

www.pathagar.com

বেঞ্চ ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছেন। নিঃসন্দেহে এক ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে টিআইবি পরিচালিত জরিপে। বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ব্যাপারে উপরে বর্ণিত বড় বড় সংখ্যাগুলো আমাদের নীতিনির্ধারকদের ভাবিয়ে তুলতে পেরেছে কিনা জানি না কিন্তু আমাদের মত নিরীহ সাধারণ মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ বিচলিত করেছে। এই যদি হয় স্বাধীন দেশের স্বাধীন বিচার বিভাগের চিত্র, তাহলে আমাদের ন্যূনতম প্রতিকার লাভের উপায় কী?

একই প্রতিবেদনে বিচার বিভাগে ঘুষ প্রদানের কারণগুলোও উল্লিখিত হয়েছে। শতকরা ৫৬ জন ঘুষ প্রদান করেছেন মামলার শুনানি ত্বরান্বিত করতে, বিপরীতে শতকরা ৬ জন ঘুষ দিয়েছেন মামলার শুনানি বিলম্বিত করতে, শতকরা ৩৩ জন ঘুষ দিয়েছেন মামলার রায়কে প্রভাবিত করতে, শতকরা ২২ জন ঘুষ দিয়েছেন মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করতে এবং শতকরা একজন ঘুষ দিয়েছেন মামলার কোন কাগজ লুকিয়ে রাখতে। এই প্রতিবেদনেই ঘুষের গড় পরিমাণ পরিমাপের চেষ্টা করা হয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের বিচার বিভাগে গড়ে ৭,৯১৮ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় ঘুষের পরিমাণ গড়ে ৭,৬৫৩ টাকা হলেও নগর এলাকায় এর পরিমাণ একটু বেশি গড়ে ৮,২৭৬ টাকা। ঘুষের পরিমাণের দিক থেকেও সর্বোচ্চ বিচারিক আদালত হাইকোর্ট তার অধস্তন নিম্ন আদালতগুলোর তুলনায় এগিয়ে থেকেছে। হাইকোর্টে ঘুষের পরিমাণ ছিল গড়ে ১২,১৭৬ টাকা, নিম্নতম ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে তা ছিল গড়ে ৬,৫৯৮ টাকা এবং জজকোর্টে ছিল গড়ে ৬,১৭৮ টাকা। এই প্রতিবেদনের বিচার বিভাগ সংক্রান্ত অধ্যায়ের মুখবন্ধে মন্তব্য করা হচ্ছে, 'দুর্নীতি হল বাংলাদেশের বিচার বিভাগের অন্যতম বড় সমস্যা। বিচার ব্যবস্থার নানা ধাপে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা এবং অনিয়মের কারণে অনেক মামলাতেই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে।' আবার একই প্রতিবেদনের সুপারিশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বিচার বিভাগে নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি এবং বদলি হওয়া উচিত মেধা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। বিচার বিভাগকে কাজ করতে হবে এমন এক অবস্থানে থেকে, যেন সর্বোচ্চ মানের ন্যায়নিষ্ঠতা, সততা এবং পেশাগত উৎকর্ষতা বজায় থাকে আবার একই সঙ্গে তারা সব ধরনের পক্ষপাতিত্ব, সংস্কার ও প্রভাবের ঊর্ধ্বেও থাকতে পারেন। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলা যায়, দুর্নীতি যে একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ সেই বার্তাটি সমাজের কাছে পাঠাবেন বিচার বিভাগ যা করতে ব্যর্থ হলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা অরণ্যে রোদনের সমতুল্যই রয়ে যেতে থাকবে।' প্রশ্ন হল, নিজেরা দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে এবং সদ্য বিগত বছরের সেরা আসনটি অলঙ্কৃত করে সমাজের কাছে এ কি ভিন্ন ধরনের বার্তা পাঠালেন আমাদের বিচার বিভাগ? দুর্নীতি যদি দণ্ডযোগ্য অপরাধই হয় তবে তাদের কৃত দুর্নীতির বিচার করে দণ্ড দেবে কে?

www.pathagar.com

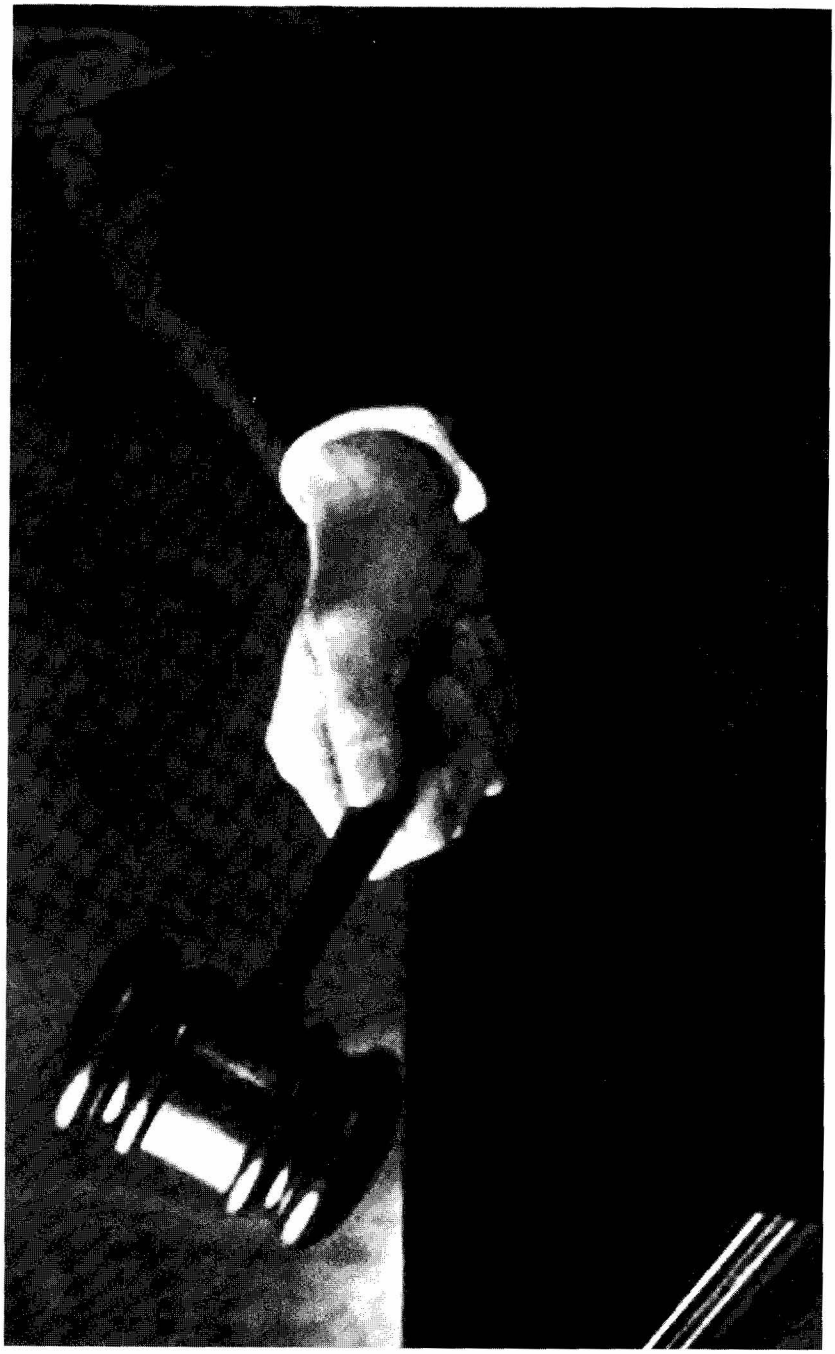

www.pathagar.com

উপরে বর্ণিত টিআইবি পরিচালিত খানা জরিপ ২০১০-এর সার সংক্ষেপ পর্যালোচনা শেষে মনে কেবলই অসহায় হতাশা জেগে ওঠে। যে দেশে বিচার বিভাগ দুর্নীতিতে নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে সে দেশের ভবিষ্যৎ কী? মনে পড়ে টিআইবির প্রতিবেদনটি প্রকাশ হওয়া মাত্র দেশের কয়েক জায়গায় টিআইবি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও আদালত অবমাননা মামলা দায়েরের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। পরে আবার অদৃশ্য কোন চাপে তা প্রত্যাহার বা খারিজ করে দেয়ারও হিড়িক পড়ে। কোন এক আদালতের মাননীয় বিচারক তো সকালে টিআইবি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে দুপুরের পর তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন বলেও মনে পড়ে। অতঃপর টিআইবি কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে পত্র পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়ার সংবাদও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তাদের প্রতিবেদনটি কী পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়েছে সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় এবং এ বিষয়ে সংগৃহীত বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করতে বলা হয়। সর্বোচ্চ আদালতের এমনতর উদ্যোগ আয়োজন দেখে বেশ আশান্বিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, তারা এ বিষয়ে তৎপর হয়ে তথ্য উপাত্ত দেখে-শুনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চয় গ্রহণ করবেন। নিজেদের বিচার তারা নিজেরাই করবেন এবং বিচার বিভাগকে কলুষমুক্ত করবেন দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে—এমনটাও আশা করেছিলেন কেউ কেউ।

কিন্তু দেশের মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের বিচার বিভাগে বিদ্যমান অনাচার-অসঙ্গতিগুলো দূর করার কোন রকম দৃশ্যমান কার্যকর পদক্ষেপ টিআইবি প্রতিবেদন প্রকাশের এতদিন পরেও নেয়া হয়েছে বা এখনও নেয়া হচ্ছে বলে জানা যায় না। বরং এর কিছুদিন পর সদ্য অবসরে যাওয়া প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে যে, তিনি পঞ্চম সংশোধনী মামলার রায় ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্রীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ১০ লাখ টাকা গ্রহণ করেছিলেন। সদ্য বিদায়ী প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ সত্যি হলে কেলেঙ্কারির ষোলকলা পূরণ হতে আর বাকি রইল কি? দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে ওঠা এ অভিযোগ খতিয়ে দেখতেও কোন রকম সরকারি বা বিচার বিভাগীয় উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। টিআইবি যেদিন তাদের আলোচ্য খানা জরিপ ২০১০ প্রকাশ করে, সেদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুদকের চেয়ারম্যান নিজে। তিনিও তার তথাকথিত বিশেষ তৎপর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোন দুর্নীতিবাজ বিচারক বা বিচার বিভাগের কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সম্পদের বিবরণী চেয়ে পাঠিয়েছেন বা ন্যূনপক্ষে তদন্ত প্রক্রিয়া চালু করেছেন এমন খবরও এখন পর্যন্ত দেশবাসীর গোচরিভূত হয়নি। জানি না বিচার বিভাগের কোন বিচারক বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখা দুদকের এখতিয়ারবহির্ভূত কিনা। তবে কোন বিচারকের নৈতিক স্খলনের অভিযোগ খতিয়ে দেখে তার বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল তৎপর হয়ে কোন বিশেষ উদ্যোগ নেবে কিনা আর নিলেও কবে নেবে, কীভাবে নেবে এর বৃত্তান্ত জনগণকে জানালে হয়ত কিছুটা হলেও উদ্বেগের নিরসন হত। বিচার বিভাগে বিরাজমান ঘুষ-দুর্নীতি, নানামুখী হয়রানি, বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা, প্রশাসনের প্রভাবে রায় দেয়া, সরকারি নির্যাতন-নিপীড়নের প্রতিকার না করে বরং কখনও কখনও সহায়ক ভূমিকা পালন করা প্রভৃতি বিপজ্জনক প্রবণতা দেশের নাজুক মানবাধিকার ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

আমার ১৫ বছর বয়সী স্কুল পড়ুয়া ছেলে, যে কিনা মায়ের ইচ্ছায় কোন একদিন ব্যারিস্টার হতে চায়, কী ভেবে আমাকে গতকাল জিজ্ঞেস করছিল, 'আচ্ছা বাবা, বিচারকরা মাথায় অন্য রংয়ের পরচুলা পরেন কেন?' প্রথমে থমকে গেলেও একটুখানি ভেবে সাদামাটা উত্তরে বলেছিলাম, 'উনারা যে সাধারণ মানুষ থেকে একটু আলাদা, সেটা বোঝাবার জন্যই হয়ত এমনটা পরেন।' কিশোর ছেলে মাথা নেড়ে সন্তুষ্ট হয়ে অন্য ঘরে চলে গেলেও আমি বসে বসে ভাবছিলাম, উত্তরটা সঠিক হল কিনা। আজকের পরিস্থিতিতে কি বলা যাবে যে, তারা আলাদা থাকতে পেরেছেন? দুর্নীতি আর অনাচারের সর্বগ্রাসী থাবায় রাষ্ট্রের অন্য সব প্রতিষ্ঠান জর্জরিত হয়ে গেলেও শেষ ভরসাস্থল বিচার বিভাগ যদি ভিন্ন রংয়ের পরচুলা পরে নিজেরা আলাদা না থাকতে পারেন, নৈতিকতার অনন্য উচ্চাসনে অবস্থান না করতে পারেন, তবে এই সমাজ এবং এই দেশের পরিণতি যে অতি ভয়াবহ হতে চলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সব বিচারকের বিচারক মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে 'দুর্নীতিবাজ-অনাচারী বিচারকদের' হাত থেকে রক্ষা করুন, এই দোয়া করি কায়মনোবাক্যে।

দৈনিক আমার দেশ-এ ১৭ জুলাই ২০১১ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা নিয়ে মুখোমুখি রাজনীতি

বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠ এখন যারপরনাই উত্তপ্ত। মূলত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা রাখা না রাখা নিয়ে বড় দুটি দল পরস্পরবিরোধী অবস্থান নেয়ায় কেমন যেন অস্বস্তিকর এক সংঘাতময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ হঠাৎ করেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে তাদের এতদিনকার অবস্থান পাল্টে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান নিয়েছে। এ ব্যাপারে উচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক একটি রায়কে সামনে তুলে ধরে তারা বলতে চাইছে, আদালতের রায় বাস্তবায়ন করতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা রাখার কোন সুযোগই নেই। যদিও উচ্চ আদালতের রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে সামনের আরও দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করা যেতে পারে বলে পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে। আদালতের রায় মেনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে না হয় অবৈধ বলে ধরে নেয়া হল। কিন্তু রায়ের সঙ্গে জুড়ে দেয়া আরও দুটি মেয়াদ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার ব্যাপারে আদালতের পর্যবেক্ষণকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কি সঠিক হল? বাস্তবতা কী বলে? আওয়ামী সরকারের অধীনে অদূর ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য কোন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে কি প্রধান বিরোধী দল বিএনপি আদৌ স্বস্তিবোধ করবে? সেই আস্থার পরিবেশ কি সৃষ্টি হয়েছে? কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার অব্যবহিত পর ১৯৭২ সালে প্রণীত নতুন সংবিধান অনুসারে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে। স্বাধীনতার মধুচন্দ্রিমার আবেশে অনুষ্ঠিত সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সদ্যগঠিত জাসদের কাছ থেকে মৃদু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া মোটামুটি একচ্ছত্র প্রভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বিএনপির অধীনে, যে নির্বাচনে বিএনপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং বাকশালের অধীনে বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ ক্ষুদ্র বিরোধী দল হিসেবে পুনরুজ্জীবিত হয়। সেই নির্বাচনে কোনরকম অনিয়ম বা অনাচারের কথা আজ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ উচ্চারণ করেছে বলে শুনিনি। ১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় স্বৈরাচার এরশাদের অধীনে। সামরিক শাসনবিরোধী যুগপৎ আন্দোলনে রত বিএনপি এবং আওয়ামী লীগসহ প্রধান সব রাজনৈতিক দল বয়কট করা অবস্থায় এরশাদের সঙ্গে

www.pathagar.com

গোপন আঁতাতের অংশ হিসেবে আওয়ামী লীগ বিতর্কিতভাবে একেবারে শেষমুহূর্তে সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৮৮ সালের চতুর্থ সংসদ নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয় স্বৈরাচার এরশাদের অধীনে, যাতে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগসহ কোন প্রধান দলই অংশ নেয়নি।

১৯৯০ সালের স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদের পতন ঘটলে, ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তিন জোটের রূপরেখার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অপ্রত্যাশিতভাবে সবাইকে চমকে দিয়ে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে বিএনপি এবং সংবিধানে দ্বাদশ সংশোধনী এনে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করে। বিএনপির এই শাসনামলে অনুষ্ঠিত মাগুরা উপ-নির্বাচনে সরকারি প্রভাব বিস্তার করে নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেয়ার অভিযোগ তুলে আওয়ামী লীগ মাঠ গরম করে তোলে এবং বিএনপি সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দেয়। পঞ্চম সংসদের মেয়াদ শেষ হয়ে এলে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষার বাধ্যবাধকতায় ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বিএনপি সরকারের অধীনেই, যেখানে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য প্রধান দল অংশগ্রহণ করেনি। স্বল্পমেয়াদি সেই ষষ্ঠ সংসদে পাস হওয়া ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসারে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হলে তার অধীনে পুনর্বার ১৯৯৬ সালেই সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ তাতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন প্রাথমিকভাবে না পাওয়ায় স্বৈরাচার এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি এবং আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বাধীন জাসদের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়।

অতঃপর ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে, যে নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় ঐক্যজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ২০০৬ সালে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় ঐক্যজোট সরকারের মেয়াদ শেষ হলে সম্ভাব্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হিসেবে তৎকালীন সদ্যসাবেক প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানকে আওয়ামী লীগ মেনে নেবে না বলে ঘোষণা দেয় এবং দেশজুড়ে লগি-বৈঠার তাণ্ডবসহ চরম এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। সে পরিস্থিতিতে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সাংবিধানিকভাবে অবৈধ এক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে দুই বছর ধরে অসহনীয় স্টিমরোলার চালায়। দুর্নীতি দমনের নামে দেশজুড়ে তারা এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে বিরাজনীতিকরণের প্রক্রিয়া চালাতে থাকে। এই সাংবিধানিকভাবে অবৈধ

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নানা কারণে প্রশ্নবিদ্ধ সে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট।

উপরের তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগের অধীনে এ পর্যন্ত কেবল একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই ১৯৭৩ সালে, প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। তার আগে বা পরে আর কোন জাতীয় সংসদ নির্বাচন আওয়ামী লীগের অধীনে অনুষ্ঠানের কোন সুযোগ তারা পায়নি। পক্ষান্তরে বিএনপির অধীনে দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং অন্যটি ১৯৯৬ সালে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। অর্থাৎ নয়টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে মাত্র তিনটি নির্বাচন আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপিদলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে পেরেছে। দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন স্বৈরাচার এরশাদের অধীনে আর চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তিন ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে।

প্রথম ধরনটি হল, তিন জোটের রূপরেখা অনুসারে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, যার অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রমকে পরে পঞ্চম সংসদে একাদশ সংশোধনীর আওতায় ভূতপূর্ব বৈধতা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ধরনটি হল, স্বল্পমেয়াদি ষষ্ঠ সংসদে পাস করা ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসারে গঠিত বিচারপতি হাবিবুর রহমান ও বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারসমূহ, যাদের অধীনে যথাক্রমে সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর তৃতীয় বা সর্বশেষ ধরনটি হল, সাংবিধানিকভাবে অবৈধ ১১ জানুয়ারির তত্ত্বাবধায়ক সরকার, যাদের অধীনে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে বর্তমান আওয়ামী সরকার ক্ষমতাসীন আছে।

আশ্চর্যজনকভাবে ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একচেটিয়া আওয়ামী জোয়ারের মধ্যেও ভোট বাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল, জোর করে ফলাফল পরিবর্তনের মত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়েছিল তৎকালীন আওয়ামী সরকার। হাতেগোনা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা এবং মন্ত্রিসভার সিনিয়র সদস্য খন্দকার মুশতাক আহমদের বিরুদ্ধে সে নির্বাচনে জনগণের ভোটে বিজয়ী জাসদ প্রার্থী আবদুর রশীদ ইঞ্জিনিয়ারকে পরাজিত দেখিয়ে জোর করে ফলাফল পাল্টানোর ঘটনা সে সময় সারাদেশে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। আবার সাম্প্রতিক সময়ে ভোলা উপ-নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য যে সন্ত্রাস, প্রশাসনের প্রভাব, কালো টাকার ছড়াছড়ি, ভোটকেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়া, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ নানা কর্মকাণ্ড চালানো হয়েছে তাতে

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের অধীনে কোন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে নতুন করে আস্থার সংকট সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। দেশজুড়ে পৌর নির্বাচনগুলোতে প্রথম দফায় উত্তরাঞ্চলে বিরোধী দল সমর্থিত প্রার্থীদের ব্যাপকহারে বিজয় দেখে দ্বিতীয় দফায় দক্ষিণাঞ্চলে পৌর নির্বাচনগুলোতে সরকারি নগ্ন হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ফলাফল পাল্টে দেয়ার মত আপত্তিকর কর্মকাণ্ড আস্থার সংকটকে আরও গভীর করে তুলেছে। আস্থার এই সংকটের কারণেই বিএনপি আনুষ্ঠানিকভাবে ইতোমধ্যে বলে দিয়েছে, তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ছাড়া আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আংশ নেবে না এবং আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে কোন সাজানো নির্বাচনও এদেশে অনুষ্ঠিত হতে দেবে না।

পক্ষান্তরে বিএনপির অধীনে ১৯৭৯ সালে পরিচালিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগ কোন আপত্তি না করলেও ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি ছিল সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার বাধ্যবাধকতায় পরিচালিত, যেখানে বিএনপি ছাড়া আওয়ামী লীগ বা সে সময়ের প্রধান কোন রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেনি। সে সময় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনরত আওয়ামী লীগ বলেছিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ছাড়া বিএনপির অধীনে কোন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করবে না।

উপরের অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাবলি থেকে এ কথাটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, রাজনৈতিক অঙ্গনে পারস্পরিক আস্থার অভাব, বিশেষ করে বড় দুটি দলের মধ্যে, ক্রমাগতভাবে প্রকট আকার ধারণ করেছে। সিনিয়র রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বলতে শুনেছি, একটি সুষ্ঠু জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে দুটি জিনিসের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হল নির্বাচন আয়োজনে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উঁচুমানের পেশাদারিত্ব ও প্রশ্নাতীত নিরপেক্ষতা। অস্বীকার করার জো নেই যে, এই দুটি জিনিসের অভাব তো আছেই আমাদের নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ নির্বাচন আয়োজনে যেসব প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তাদের সবার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে। ক্রমবর্ধমান হারে দলীয়করণের কুফল আজ পেশাদারিত্বের মানকে নিম্নমুখী করতে করতে এক অদ্ভুত ধরনের নীতিহীন ও সুবিধাবাদী দলীয় আনুগত্য সৃষ্টি করেছে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে।

এ অবস্থায় ক্ষমতাসীন দল নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারার তৃপ্তিকর আত্মবিশ্বাস থেকে যতটা সহজে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা এক্ষুণি উঠিয়ে দিয়ে তাদের দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করতে পারেন, এর বিপরীতে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সন্দেহ, অবিশ্বাস আর আস্থার অভাব থাকার কারণে ব্যাপারটি মেনে নেয়া ঠিক ততটাই কঠিন হয়ে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পড়ে। এমন আস্থা ও নিরপেক্ষতার অভাবের কথা অতিসম্প্রতি বলেছেন গণফোরাম প্রধান ড. কামাল হোসেনও এক গোলটেবিল আলোচনায় এবং ১৮ জুলাই রাতে প্রচারিত এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে। তার মতে, এখনও প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে পরস্পরকে আস্থায় নিতে পারে না। তিনি মনে করেন, যতদিন এই পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ তৈরি না হবে ততদিন গণতন্ত্রের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা চালু থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের টকশোগুলোতে এবং সভা-সেমিনারে সমাজের বিভিন্ন অংশের আলাপ-আলোচনা থেকেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে সবাই জোরালো মতামত দিচ্ছেন। পত্র-পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত ছোট আকারের জনমত জরিপের ফলাফল থেকেও বোঝা যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যে একা হয়ে পড়েছে।

উদ্দেশ্যটা ক্রমেই সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, এই মুহূর্তে জনপ্রিয়তায় ব্যাপক ধস নামা টের পেয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিলের মাধ্যমে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে পুনরায় ক্ষমতায় আসার দিবাস্বপ্নে বিভোর রয়েছে। তারা তড়িঘড়ি করে বিগত ৩০ জুন ২০১১ তারিখে সংসদের সদ্যসমাপ্ত অধিবেশনে পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করার মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করে এক জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। জানা যায়, বিরোধী দল বিএনপির সংসদ সদস্যদের অনুপস্থিতিতে ২৯১ বনাম ১ ভোটে পঞ্চদশ সংশোধনীটি পাস করা হয়েছে যা প্রতীকী অর্থে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাকশাল প্রবর্তনের চতুর্থ সংশোধনী পাসের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

শুধু পার্থক্য একটি জায়গায় রয়ে গেল। বাকশালের বিরোধিতা করে জেনারেল ওসমানী আর ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন পদত্যাগ করে চলে যাওয়ার বিরল সাহস দেখালেও এবার এমন একজন সাহসী বিবেক কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। ঘটা করে সুরঞ্জিতবাবুকে সেমি-মাতব্বরি দিয়ে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, সেই কমিটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন মহলের মতামত নেয়ার নাটক অর্থহীন এক প্রহসনে পরিণত হল।

আগের দফায় যে বলেছিলেন আদালতের দেয়া রায় অনুসরণ করে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা দুই মেয়াদে রেখে সুপারিশ তৈরি করতে, তা থেকে অ্যাবাউট টার্ন নিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। হুট করে একদিন তাদের ডেকে নিয়ে বলে দিলেন, তিনি তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা এখনই উঠিয়ে দিতে চান। প্রয়োজনমাফিক রায় সরবরাহ করে বিশেষ আস্থা অর্জনকারী সদ্যসাবেক প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ১০ লাখ টাকা গ্রহণের মত কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাওয়ায়, তাকে যে সামনে আর প্রধান উপদেষ্টা করা যাচ্ছে না, সেটা বুঝতে পেরেই কি প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ

www.pathagar.com

মত পাল্টালেন? সেজন্যই কি তবে নির্দেশ দিলেন কমিটি যেন তার পরিবর্তিত ইচ্ছা অনুসারেই সুপারিশ প্রস্তুত করে সংসদে পাস করানোর ব্যবস্থা নেয়? কোন বিরোধিতা নেই, কোন সমালোচনা নেই, খালি হাততালি আর হাততালি। যেন সবকিছু ঠিকঠাকই আছে। বিতর্কিত এই সংশোধনী পাস তো হয়ে গেল 'ইয়েস আপা' সংসদে; কিন্তু তা টিকবে তো? আর এই সংশোধনী যদি কোন কারণে টিকে যায়, তবে গণতন্ত্র টিকবে তো?

দেশের গণতন্ত্রকে টেকসই এবং স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে আমাদের সবাইকে পাড়ি দিতে হবে অনেক দূরের পথ। এই পথ যে মসৃণ নয় বরং রীতিমত রক্তঝরা কণ্টকময়, সে অভিজ্ঞতা ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার আমাদের সবারই হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাকশাল প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র হত্যা, ১৯৭৫ সালেরই ১৫ আগস্টের দুঃখজনক হত্যাকাণ্ড, ১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বরণ, ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ স্বৈরাচারী এরশাদের ক্ষমতা দখল ও নয় বছরের সামরিক শাসন এবং অতিসম্প্রতি ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি থেকে সাংবিধানিকভাবে অবৈধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরের অপশাসন-নির্যাতন সুখকর কোন অভিজ্ঞতা নয় কারোর জন্যই এবং এর কোনটিরই নবরূপে প্রত্যাবর্তন দেশপ্রেমিক কোন মহলের কাম্য হতে পারে না। আশা করি আদালতসহ অন্য সবাই যেমনটি বুঝেছেন যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা আরও কমপক্ষে দুই নির্বাচন পর্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে, আওয়ামী বন্ধুদেরও হয়ত তা ঠিকই বোধগম্য হবে। তবে সেই বোধোদয় হোক যথাসময়ে, ঘণ্টা বাজবার আগেই—এই কামনা করি।

দৈনিক আমার দেশ-এ ২০ জুলাই ২০১১ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

সংবিধানের আত্মকথন

আমি বাংলাদেশ নামের একটি ছোট্ট স্বাধীন দেশের সংবিধান। আমার জন্ম ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর তারিখে। আমার কার্যকারিতা দেয়া হয় ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখ থেকে। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান সাংবিধানিক পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান অংশে যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তারাই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সাংবিধানিক পরিষদের সদস্য হিসেবে নিজেদের গণ্য করে নতুন সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কোন কোন সমালোচক বলে থাকেন যে, এই কাজটি বৈধ হয়নি। কারণ, তারা অখন্ড পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে এই অঞ্চলের জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য কোন ম্যান্ডেট জনগণ তাদের দেয়নি। অর্থাৎ সমালোচকদের মতে, স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি নতুন সাংবিধানিক পরিষদ নির্বাচন করা যেত স্বাধীনতার পরপর এবং তা করলে হয়ত স্বাধীন দেশের সাংবিধানিক পরিষদে নির্বাচিতরা জনগণের যথোপযুক্ত ম্যান্ডেট নিয়ে আমাকে বৈধভাবে প্রণয়ন করতে পারতেন। জন্মলগ্নের এই ত্রুটি নিয়ে কেউ যখন খোঁচা দেন তখন তাদের কথার যুক্তিগ্রাহ্যতা অস্বীকার করতে পারি না বটে, কিন্তু আমার বড় অস্বস্তি হয়। জন্মদাতার আইনগত বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে, কার না কষ্ট হয় বলুন?

তৎকালীন যুবাবয়েসী আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে চেয়ারম্যান করে সেই সময়ে একটি সর্বদলীয় সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। তারা আমার চারটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দেন ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। মূলনীতিগুলোর ম্যান্ডেট নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তান অংশের সাংবিধানিক পরিষদের সদস্যরা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন, সেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে এই চার মূলনীতি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাহলে এই মূলনীতিগুলো এল কোথা থেকে? আওয়ামী লীগ কি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন দল হিসেবে জনগণের কাছে উপস্থিত হয়েছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে? আওয়ামী লীগ কি ধর্মনিরপেক্ষ কোন দল হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছিল জনগণের কাছে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে? সমালোচকরা বলেন যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের মিত্রশক্তি ভারত এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ প্রভাবে এই চার মূলনীতির আবির্ভাব ঘটান হয় আমার মধ্যে। সেই সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রবল

www.pathagar.com

উচ্ছ্বাসের সময়টাতে, আওয়ামী লীগের হঠাৎ করে নীতি পরিবর্তন বা সেই পরিবর্তিত নীতিতে জনগণের ম্যান্ডেট আছে কি নেই তা নিয়ে সে রকম উচ্চস্বরে প্রশ্ন তোলার চেষ্টা কেউ না করলেও, পরবর্তী সময়ে এই প্রশ্নগুলো উঠতে থাকে মুখর সমালোচকদের মধ্য থেকে। আমার বড়ই বিব্রতকর লাগতে থাকে। ছোটখাট জিনিস নিয়ে সমালোচনা নয়, রীতিমত আমার মূলনীতিগুলো নিয়ে প্রশ্ন!

১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই তারিখে আমাকে প্রথম সংশোধন করা হয়। প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে আমার আর্টিকেল ৪৭ সংশোধন করে এতে ৪৭ক নম্বর দিয়ে একটি অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়, যার মাধ্যমে গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যুদ্ধাপরাধসহ অন্যান্য অপরাধের বিচার আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে করার বিধান রাখা হয়। আর এই সংশোধনীর মাধ্যমে উপরোক্ত অপরাধসমূহ বিচারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু মৌলিক অধিকার রহিত করা হয়। প্রথম সংশোধনী আনার পর দু'মাস পার হতে না হতেই আমাকে দ্বিতীয়বার সংশোধন করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে আমার আর্টিকেল ২৬, ৬৩, ৭২, এবং ১৪২ সংশোধিত হয়; আর্টিকেল ৩৩ প্রতিস্থাপিত হয়; এবং ৯ক নম্বর দিয়ে একটি অংশ সংযোজিত হয়। এই দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে জরুরি অবস্থায় কিছু কিছু মৌলিক অধিকার রহিত করার বিধান করা হয়। জনগণের মৌলিক অধিকার রহিত করার বিষয়ে সংশোধনী আনার কারণে আমার ভালো মানুষী চেহারাটা অমানবিক হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী জাসদ আর সশস্ত্র বিপ্লবী সিরাজ শিকদারদের দমনের লক্ষ্যে রক্ষীবাহিনী দিয়ে নির্বিচার অত্যাচার চালাতে এই দ্বিতীয় সংশোধনীটি আওয়ামী সরকারের খুব কাজে লেগেছিল বলে শুনেছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমার একদম ভালো লাগেনি। নিজেকে এখনও অপরাধী অপরাধী মনে হয়।

তৃতীয়বার যখন আমাকে সংশোধন করা হয় তখন আমি একটুখানি কেঁদেছিলাম। কারণ, তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে বেরুবাড়ীসহ বাংলাদেশের কয়েকটি ছিটমহল প্রতিবেশী ভারতকে দিয়ে দেয়া হল, যার বিনিময়ে তিনবিঘা করিডোরসহ কয়েকটি ছিটমহল ভারতের কাছ থেকে আমাদের পাওয়ার কথা। যে চুক্তির মাধ্যমে দু'দেশ এই ছিটমহল বিনিময় করেছিল, সেই চুক্তিটি অনুমোদন করার জন্যই এই তৃতীয় সংশোধনী আনা হল। আমাকে সংশোধন করায় দেশের ভূখন্ডের একটা অংশ, তা সে যত ছোটই হোক, আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেল বলে, আমার এমনতর কান্না পেয়েছিল। মায়া তো লাগেই, তাই না? কিন্তু কষ্ট আরও অনেকগুণ বেড়েছে যখন শুনেছি যে, ভারত সেই ছিটমহল চুক্তিটি তাদের সংসদে পাস করিয়ে তাদের সংবিধানে সংশোধনী আনতে পারেনি বা আনেনি। ফলে আমাদের তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে দেয়া ছিটমহলগুলো ভারত বুঝে নিলেও, বিনিময়ে যে ছিটমহলগুলো আমাদের দেয়ার কথা, সেগুলো আজতক দেয়নি। শুধুই

www.pathagar.com

হারাবার বেদনা রয়ে গেল, সান্ত্বনা হিসেবে যে বিনিময়টুকু পাওয়ার কথা চুক্তি অনুযায়ী, তা আর পেলাম না বলে আজও মাঝে মাঝে হাহাকার করে ওঠে মন।

আমার জন্মের পর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিন ছিল ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি তারিখটি। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছিল আমার এই দিনটিতে। তৎকালীন আওয়ামী সংসদ হুট করে চতুর্থবারের মত আমাকে সংশোধন করে ফেলে, মাত্র ১১ মিনিটের মধ্যে। ছোটখাট কোন সংশোধন নয়, চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে আমাকে একেবারে ওলটপালট করে খোলনলচে পাল্টে ফেলা হয়। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বদলে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, বহুদলীয় গণতন্ত্র হত্যা করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়, বাকশাল নামে একটিমাত্র দল রেখে অন্য সব রাজনৈতিক দল বেআইনি ঘোষিত হয়, জাতীয় সংসদের ক্ষমতা অতিশয় সীমিত করে ফেলা হয়, মাত্র চারটি সংবাদপত্র সরকারি মালিকানায় রেখে বাকি সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয়, বিচার বিভাগ তার স্বাধীনতা হারায় এবং জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষায় সুপ্রিমকোর্টের এখতিয়ার নিষ্ঠুরভাবে ছেঁটে ফেলা হয়। আমার আর্টিকেল ১১, ৬৬, ৬৭, ৭২, ৭৪, ৭৬, ৮০, ৮৮, ৯৫, ৯৮, ১০৯, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১৪১ক, ১৪৭, ১৪৮ সংশোধিত হয়; আর্টিকেল ৪৪, ৭০, ১০২, ১১৫ এবং ১২৪ প্রতিস্থাপিত হয়; তৃতীয় এবং চতুর্থ তফসিল পাল্টে ফেলা হয়; প্রথম জাতীয় সংসদের মেয়াদ নজিরবিহীনভাবে বাড়িয়ে দেয়া হয়; রাষ্ট্রপতি ও তার কার্যালয়কে অসীম ক্ষমতা দিয়ে নানা বিধান করা হয়; আর্টিকেল ৭৩ক এবং ১১৬ক সংযোজন করা হয় এই বিশালবপু সংশোধনী আনয়ন করে। এমন অস্বাভাবিক ভাবে আক্রান্ত হয়ে আমি যারপরনাই পর্যুদস্ত হয়ে পড়ি। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে কখনও চিৎকার করে কেঁদেছিও। কিন্তু আমার কান্না কেইবা শোনে? সংবিধানের কান্না কি মানুষ শুনতে পায়?

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে আমি প্রত্যক্ষ করেছি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের মত নৃশংস ঘটনা। আমার একদম ভালো লাগেনি। কোন হত্যাকাণ্ডই আমার ভালো লাগে না। হোক না সে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী জাসদের হাজার হাজার তরুণ নেতাকর্মীদের কেউ, কিংবা সিরাজ শিকদারের মত কোন সর্বহারা বিপ্লবী, কিংবা বাকশাল প্রবর্তনকারী মহাক্ষমতাবান রাষ্ট্রপতি বা তার প্রিয়জন-পরিবার। সবার স্বাভাবিক মৃত্যু হোক এই-ই আমি চাই। ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল তারিখে পঞ্চমবার আমাকে সংশোধন করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডের পর থেকে সৃষ্ট অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এবং আমার অনিচ্ছাকৃত অনুপস্থিতিতে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত জারিকৃত ফরমান, আদেশ ও বিভিন্ন বিধি-বিধান, সংশোধনী, সংযোজন, প্রতিস্থাপন, বাতিলীকরণসহ সব ধরনের কার্যক্রমকে বৈধতা দেয়া হয় এই পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে আমার

www.pathagar.com

চতুর্থ তফসিলে ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদটি সংযোজন করে। এই সংশোধনীর পর বাকশালের অবসান করে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে আসে, রাজনৈতিক দলগুলোকে পুনরায় আইনি কাঠামোর মধ্যে অবাধে রাজনীতি করার সুযোগ দেয়া হয়, আমার চার মূলনীতির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা বদলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস' এবং সমাজতন্ত্র বদলে 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র' করা হয়, আমার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম সংযোজন করা হয়, বিচার বিভাগের হৃত স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়া হয়, বন্ধ হয়ে যাওয়া সব সংবাদপত্রকে পুনরায় প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি তারিখে বাকশাল প্রবর্তন দিয়ে শুরু হওয়া এবং ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর তুঙ্গে ওঠা আমার দমবন্ধ অবস্থার যেন অবসান ঘটে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে। বহুদিন পর খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিতে পেরে আমার বেশ খানিকটা আরাম বোধ হতে থাকে। বাকশালের অধীনে রহিত হয়ে যাওয়া জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো পঞ্চম সংশোধনীর আওতায় ফিরিয়ে দেয়ায় আমার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আবার। হাসিমুখে মানুষকে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠতে দেখে আমি পুনরায় আশায় বুক বাঁধি।

১৯৮১ সালের ৩০ মে তারিখে আমি থমকে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করি কিছু বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার হাতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহদাত বরণের ঘটনা। গণতন্ত্র এর মাধ্যমে আবার একটা হোঁচট খায়। তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর তার আমলে ১৯৮১ সালে আমাকে ষষ্ঠবারের মত সংশোধন করা হয়। এই ষষ্ঠ সংশোধনীর মাধ্যমে আমার আর্টিকেল ৫১ এবং ৬৬ সংশোধন করা হয় বিচারপতি সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করতে দেয়ার পথ সুগম করে দিয়ে। পরবর্তী সময়ে তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সেনা প্রধান এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তারিখে রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক আইন জারি করেন এবং মসনদে আরোহণ করেন। আমি আবার এক দীর্ঘমেয়াদি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিপতিত হই। ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখে আমাকে সপ্তম বারের মত সংশোধন করা হয়। এই সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে আমার আর্টিকেল ৯৬ সংশোধিত হয় এবং আমার চতুর্থ তফসিল সংশোধন করে এতে ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয় যার মাধ্যমে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সব ফরমান, আদেশ, অধ্যাদেশসহ সামরিক আইনের অধীনে কৃত সব কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়া হয়। একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে সামরিক শাসন জারি করা আর কিছুদিন পর তাকে বৈধতা দেয়ার সংশোধনী আমার কাছে অসহ্য লেগেছিল। কিন্তু আমার আর কিইবা করার ছিল, বলুন?

www.pathagar.com

আমাকে আবার সংশোধন করা হয় অষ্টমবারের মত ১৯৮৮ সালের ৭ জুন তারিখে। এই অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে আমার আর্টিকেল ২, ৩, ৫, ৩০ এবং ১০০ সংশোধন করা হয়। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়; হাইকোর্টকে বিকেন্দ্রীকরণ করে ঢাকার বাইরের ছয়টি শহরে ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা হয়; ইংরেজি বানানে উচ্চারিত 'বেঙ্গলি' বদলে বাংলা এবং 'ডাক্কা' বদলে ঢাকা লেখা হয়; এবং কোনো নাগরিকের বিদেশ থেকে কোন উপাধি, পুরস্কার, সম্মাননা নেয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নেয়ার বিধান করা হয়। সামরিক শাসক হিসেবে এরশাদ ততদিনে কোণঠাসা অবস্থায় বলে শুনেছি এবং সে পরিস্থিতিতে এই সংশোধনী এনে তিনি শেষরক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলাবলি করতেন। যাই হোক কিছুদিনের মধ্যে সুপ্রিমকোর্ট হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের সংশোধনীটুকু বাতিল করে দেয়।

আমাকে নবমবার সংশোধন করা হয় ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে। নবম সংশোধনী এনে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে সরাসরি নির্বাচনের বিধি করা হয় এবং শূন্য হওয়া উপ-রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচন না করে নিয়োগ দিলে তা পরবর্তী সংসদে অনুমোদন করিয়ে নেয়ার বিধান যুক্ত হয়।

এর প্রায় এক বছর পর ১৯৯০ সালের ১২ জুন তারিখে দশমবার আমাকে সংশোধন করা হয় যার মাধ্যমে পরবর্তী দশ বছরের জন্য ৩০টি মহিলা সংসদ সদস্য পদ সংরক্ষিত রাখার বিধান করা হয়। সংরক্ষিত আসনের মহিলা সংসদ সদস্যদের জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার বিধান করে আমার আর্টিকেল ৬৫ সংশোধিত হওয়ার সময় সেই ১৮ বছরের তরুণ বয়সে আমার মনে যে একটু-আধটু নির্দোষ রোমাঞ্চ জাগেনি তা হলফ করে বলতে পারব না। কিন্তু বেরসিক কেউ কেউ সে সময়ে ৩০ জন মহিলা সংসদ সদস্যকে ৩০ সেট অলঙ্কার বলে উপহাস করলে সাধারণভাবে দেশবাসী খুব মজা পেয়েছিল বলে শুনেছি। তবে আমার তা একেবারেই ভালো লাগেনি। সমাজের অনগ্রসর কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী মা-বোন-মহিলাদের এগিয়ে আনার দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ায়, সহানুভূতিশীল হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার পরিবর্তে তাদের সাময়িক অদক্ষতা বা অনগ্রসরতা নিয়ে উপহাস করার প্রবণতাকে নিছক অপরিণামদর্শী বলে মনে হয়েছে।

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে এরশাদের পতনও আমি দেখেছি। আমার চোখের সামনে মানুষ জেগে উঠেছিল ঘরে ঘরে এবং নেমে এসেছিল রাজপথে। তিন জোটের রূপরেখা অনুসারে ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপি তার বিধবা পত্নী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে অপ্রত্যাশিতভাবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। সেই আমলের শুরুর দিকে ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট তারিখে আমাকে একইদিনে একাদশ এবং দ্বাদশবার সংশোধন করা হয়।

www.pathagar.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
[১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত]

www.pathagar.com

একাদশ সংশোধনীতে আমার চতুর্থ তফসিল সংশোধন করে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগসহ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে (১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ৯ অক্টোবর নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব গ্রহণ পর্যন্ত সময়কালে) তার কৃত সব কার্যক্রমের বৈধতা দেয়া হয়। একই সঙ্গে এই সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে তার পূর্বতন প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে অনুমোদন দেয়া হয়। একই দিনে আনা দ্বাদশ সংশোধনীটি ছিল ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারিতে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে কৃত মস্তবড় এক ভুলের সংশোধন, ১৬ বছর পর, তিন জোটের রূপরেখা অনুসারে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার বিধান করে নেয়। দ্বাদশ সংশোধনীতে আমার আর্টিকেল ৪৮, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৭০, ৭২, ১০৯, ১১৯, ১২৪, ১৪১ক এবং ১৪২ সংশোধিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাহী প্রধান করে তার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা জাতীয় সংসদের কাছে জবাবদিহি করবে, এমন বিধান রাখা হয় এই সংশোধনীতে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি তার অতি সীমিত ক্ষমতাসহ সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন, এমন বিধানও করা হয়। এই দুটি সংশোধনী আনার সময় আমার খুবই ভালো লেগেছিল এজন্য যে, গোটা জাতি এ ব্যাপারে ঐকমত্য অর্জন করেছিল। কোন দ্বিমত ছিল না এই দুটি সংশোধনীর ব্যাপারে। আমাকে যে কোন সময় সংশোধনের ব্যাপারে সবার মাঝে এমনতর সমঝোতাই তো হওয়া উচিত, তাই না?

এ সময়টাতে আমি খুব আশাবাদী হয়ে উঠেছিলাম বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার ব্যাপারে। ভেবেছিলাম সব ক্লেদ পেছনে ফেলে সামনে শুধুই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কাজকর্ম করবেন রাজনীতিবিদরা। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই মাঠ আবার উত্তপ্ত করে তোলে আওয়ামী লীগ। মাগুরা উপ-নির্বাচনে অনিয়ম হয়েছে অভিযোগ তুলে, বিএনপির অধীনে কোন নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে দেশে আবার ভয়াবহ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়। এর মধ্যে বিএনপি সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে এলে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি, যেখানে বিএনপি ছাড়া আওয়ামী লীগ বা অন্য কোন রাজনৈতিক দল অংশ নেয়নি। বরং তারা রাজপথ দখল করে অচলাবস্থার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। অবশেষে বিএনপি সংঘাত এড়াতে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দলের দাবি মোতাবেক স্বল্প মেয়াদের ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ তারিখে আমাকে ত্রয়োদশবার সংশোধন করে। ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসারে দেশে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিধান করা হয়। এই সংশোধনীর বিধান অনুসারে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে

www.pathagar.com

১৯৯৬ সালেই সপ্তম এবং তার পরের মেয়াদে ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২০০৪ সালের ১৬ মে তারিখে আমাকে চতুর্দশবার সংশোধন করা হয়। এই চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে আর্টিকেল ৪ক সংযোজন করা হয়, আর্টিকেল ৬৫ সংশোধন করা হয়; আর্টিকেল ৯৬(১), ১২৯ এবং ১৩৯ সংশোধন করে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি, মহা হিসাবনিরীক্ষক, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবসরের বয়সসীমা বাড়ানো হয় এবং আর্টিকেল ১৪৮ সংশোধন করা হয়। এ সময়টাতে আমার বেশ কিছুটা অস্বস্তি লেগেছিল যখন বিচারপতিদের বয়স বাড়ানোর ব্যাপারটি নিয়ে আওয়ামী লীগ তৎকালীন প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানের দিকে আঙুল তোলে। তারা অভিযোগ করে বসে যে, বিচারপতি কে এম হাসানকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করার লক্ষ্যেই বয়স বাড়ানোর এই সংশোধনী আনা হয়েছে। এই নিয়ে ঠেলাঠেলি চলতে চলতে রাজনীতির মাঠ চরম উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে ধাবিত হয়। লগি-বৈঠা দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে মানুষ হত্যার মত ঘটনা ঘটতে দেখে আমি শিউরে উঠেছিলাম। এসব কী হচ্ছে দেশে? এমনতর নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের ফলে, ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি আমাকে পুনরায় লঙ্ঘন করে এক অবৈধ শক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে ক্ষমতা দখল করে বসে। তারা গায়ের জোরে ২ বছরের মত ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থেকে সীমাহীন নির্যাতন-নিপীড়ন চালায় রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, গণমাধ্যমকর্মীসহ আপামর দেশবাসীর ওপর। অবশেষে তাদের অধীনেই ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর তারিখে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আওয়ামী লীগ বিপুলভাবে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। বিএনপি সে নির্বাচনকে নানা কারণে প্রশ্নবিদ্ধ বলে অভিহিত করেছে বলে শুনেছি।

সর্বশেষ ২০১১ সালের ৩০ জুন তারিখে আমাকে পুনরায় সংশোধন করা হয়েছে পঞ্চদশবার। এই পঞ্চদশ সংশোধনী নাকি আবার সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে করা হয়েছে বলে আওয়ামী লীগ দাবি করছে। যে রায়ের ভিত্তিতে সংশোধনীটি আনা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে, সে রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি নাকি তখনও আদালত থেকে পাওয়া যায়নি।

পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে মূলত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে সামনের জাতীয় সংসদ নির্বাচন আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে করার বিধান করা হয়েছে এবং আমার মূলনীতিগুলোর মধ্যে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস' তুলে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সমস্যা হল একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী যেমন করে দেশের প্রধান সব রাজনৈতিক শক্তির কাছে গ্রহণযোগ্যভাবে আনা গিয়েছিল, পঞ্চদশ সংশোধনীর ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটছে ঠিক উল্টোটা। বিএনপি তো বটেই, আওয়ামী লীগ ছাড়া আর সবাই নানা দৃষ্টিকোণ থেকে

www.pathagar.com

পঞ্চদশ সংশোধনীকে সমালোচনা করে যাচ্ছে। মহাজোটের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শরিকরা সমালোচনার ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। উপজাতি জনগোষ্ঠী হৈ চৈ করে যাচ্ছেন। নাক উঁচু জনবিচ্ছিন্ন সুশীল সমাজ যারা সাধারণত আওয়ামী লীগের প্রতি কোমল মনোভাব পোষণ করেন, তারাও দেখলাম এ ব্যাপারে ছেড়ে কথা বলছেন না। পত্র-পত্রিকার পাতায় ছোট ছোট জনমত জরিপের ফলাফলও দেখলাম এক্ষেত্রে আওয়ামী সরকারের বিপক্ষে।

ইসলামী দলগুলো বিচ্ছিন্নভাবে এবং যুগপৎ হরতাল মিছিল করে পঞ্চদশ সংশোধনীর ব্যাপারে তাদের প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছে। বিএনপি তো সোজা-সাপ্টা বলছেই, তারা এই সংশোধনী কিছুতেই মেনে নেবে না। আর নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন ছাড়া আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেয়ার ঘোষণা তো বিএনপি আরও আগেই দিয়ে রেখেছে। এমনকি তাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, এই সংশোধনী সহকারে আমি নাকি আর সংবিধান নামের যোগ্য নেই, রীতিমত আওয়ামী লীগের দলীয় ইশতেহারে নাকি পরিণত হয়েছি। অতএব, তিনি ক্ষমতায় এলে আমাকে নাকি ছুঁড়েই ফেলে দেবেন। বুঝুন এবার আমার অবস্থা! কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে আজ আমাকে? যদি আমি আসলেই কারোর দলীয় ইশতেহারে পরিণত হয়ে গিয়ে থাকি, আমি তো তা হতে চাইনি!

আমি অতি নিরীহ একখানা সংবিধান মাত্র। আমাকে নিয়ে নানা রকম চালাচালি করে আমার গ্রহণযোগ্যতা আজ এমন এক নেতিবাচক পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে যে, আমার খুবই লজ্জা লাগে। জনসমক্ষে মুখ দেখাতে সঙ্কোচ বোধ করি আজকাল। একটি দেশের সংবিধান হওয়ার সুবাদে যে স্বাভাবিক গর্ববোধ নিয়ে চলাফেরা করেছি এই কিছুকাল আগেও, সেই গর্বের লেশমাত্র আর অবশিষ্ট নেই আজ। এই তো ক'দিন আগে প্রবীণ বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট লেখক বদরুদ্দীন উমর সাহেব আমাকে নিয়ে এক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, এই পঞ্চদশ সংশোধনীর পরিণামেই নাকি আমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হবে বা আমার মৃত্যু ঘটবে।

আমার স্থানে নাকি এক নতুন সংবিধানের জন্ম ঘটবে। কেমন লাগে, বলুন তো ভাই? একজন বড় নেত্রী আমাকে সম্প্রতি পঞ্চদশবারের মত সংশোধন করলেন নিজের মত করে, তার সাপেক্ষে অন্য বড় নেত্রী বললেন আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, আর একই সঙ্গে বামধারার এক প্রবীণ রাজনীতিবিদ বলছেন আমার নাকি মরণঘণ্টাই বেজে গেছে। এসব দেখেশুনে আমার অবশ্য এমনিতেও আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। একটা স্বাধীন দেশের সংবিধান হওয়ার যে অনন্য গৌরব এতদিন উপভোগ করতাম, সেই গৌরবই যদি ধুলায় লুটিয়ে পড়ে, তবে আর অসম্মানিত হয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে খুঁজে পাই না আমি।

মৃত্যুর আগে শেষ ইচ্ছা হিসেবে শুধু বলে যেতে চাই, আমার যে উত্তরসূরি জন্ম নেবে তার জন্ম নিয়ে যেন আমার মত কোন ত্রুটি না থাকে, সেদিকে আপনারা একটু

www.pathagar.com

বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন। বেশ কয়েক মাস আগে আমাকে সংশোধনের জন্য যে লোক দেখানো কমিটি গঠিত হয়েছিল, সেখানকার এক বৈঠকে গিয়ে এ যুগের এক অসম সাহসী কলমসৈনিক দৈনিক আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান লিখিত মত দিয়ে এসেছিলেন যে, নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি সাংবিধানিক পরিষদ বা তার ভাষায় গণপরিষদ নির্বাচন করতে, যারা জাতিকে একটি যুগোপযোগী সংবিধান উপহার দিয়ে বিদায় নেবে। আমাকে নিয়ে যখন এতই বিতর্ক আপনাদের মধ্যে, তবে সে রকম একটা গণপরিষদ বা সাংবিধানিক পরিষদ গঠন করে আমাকে বরং এবার রেহাই দিন না কেন আপনারা? শুনতে পান কিনা জানি না, ইদানীং আমি নজরুলের একটি জনপ্রিয় গান করুণ সুরে অহর্নিশ গেয়ে চলেছি—'আমার যাবার সময় হল, দাও বিদায়...'

দৈনিক আমার দেশ-এ ২০ জুলাই ২০১১ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

ভারতবান্ধব বনাম ভারতবিরোধী

বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে 'ভারতবান্ধব' এবং 'ভারতবিরোধী' বলে দুটি বিশেষণ প্রচলিত রয়েছে। তার ভিত্তিতে জনমতের দুটি বিপরীতমুখী ধারা সতত প্রবাহমান রয়েছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মুখে শুনে আসছি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত অকুণ্ঠ সমর্থন জুগিয়েছে। শুধু নৈতিক সমর্থন নয়, আমাদের কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে তার নিজ ভূখণ্ডে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, প্রশিক্ষণ দিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে, আমাদের ভূখণ্ড শত্রুমুক্ত করে কাঙ্ক্ষিত বিজয় ছিনিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। এসব সাহায্য-সহযোগিতা এবং সমর্থন তো ভোলার মত নয়, সবাই তা একবাক্যে স্বীকার করবেন। বাঙালি জাতির সবচেয়ে মূল্যবান অর্জন স্বাধীনতা। আর সেই স্বাধীনতা অর্জনের মত এক অনন্য আবেগজড়িত মুহূর্তে যে প্রতিবেশী দেশটি পরম বন্ধুর মত আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই বন্ধুদেশ ভারতের প্রতি তো স্বাভাবিকভাবে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকার কথা বাংলাদেশের আপামর জনগণের। পরবর্তী সময়ে সদ্ভাব ক্ষুণ্ন হওয়ার মত কোন কিছুর উদ্ভব না ঘটে থাকলে, সারা বাংলাদেশ হওয়ার কথা প্রশ্নাতীতভাবে ভারতবান্ধব। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ভারতবিরোধী মনোভাব বিরাজমান বলে অনেককেই দাবি করতে শুনি। বাংলাদেশের জনমনে এই (প্রবল কিংবা মৃদু যাই হোক না কেন) ভারতবিরোধী মনোভাবের অস্তিত্ব যদি সত্য হয়ে থাকে, প্রশ্ন আসে কী কারণে তা সৃষ্টি হল? একটু ভেবে-চিন্তে কারণগুলো নির্মোহভাবে খুঁজে বের করা দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সম্পর্কোন্নয়নের জন্য জরুরি।

প্রথম কারণ হল নদীর পানি। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে ৫৪টি অভিন্ন নদীর প্রবাহ। এই নদীগুলোর পানির ন্যায্য হিস্যা নিয়ে ভারত উজানের দেশ এবং বাংলাদেশ ভাটির দেশ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে দরকষাকষি করে যাচ্ছে। ভাটির দেশ হিসেবে অভিন্ন নদীর প্রবাহে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকারকে ভারত কখনও গুরুত্ব দেয়নি। ফারাক্কা নামক স্থানে বিশাল বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশের পদ্মা নদীর পানিপ্রবাহকে আটকে দিয়ে প্রমত্তা পদ্মাকে চরজাগা জীর্ণশীর্ণ এক নালায় পরিণত করেছে ভারত। ফলস্বরূপ আমাদের সমগ্র উত্তরাঞ্চল পরিণত হয়েছে ফসলহীন মরুভূমিতে। ফারাক্কা নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অব্যাহত কাকুতি-মিনতি, হৈচৈ,

www.pathagar.com

লংমার্চ, আন্তর্জাতিক ফোরামে সালিসের চেষ্টা কোন কিছুতেই ভারত কর্ণপাত করেনি, কোন কার্যকর সুরাহা আজতক হয়নি। যৌথ নদী কমিশন, সোজা ভাষায় বলতে গেলে অনিয়মিত এবং অকার্যকর। সম্প্রতি টিপাইমুখ বাঁধ নিয়েও ফারাক্কা নাটকের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, যার ফলে সুরমা কুশিয়ারাসহ মেঘনা অববাহিকা পুরোটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বৃহত্তর সিলেট, কুমিল্লা এবং নোয়াখালী অঞ্চল দেশের উত্তরাঞ্চলের মতই মরুভূমিতে পরিণত হবে বলে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা।

দ্বিতীয় কারণ হল সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ড। বাংলাদেশের বৃহৎ প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের সঙ্গে আমাদের রয়েছে দীর্ঘতম স্থল সীমান্ত। এই সীমান্তজুড়ে একতরফাভাবে কাঁটাতারের বেড়া স্থাপন করে ভারত প্রতীকী এক বৈরিতা দাঁড় করিয়েছে নিরীহ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশের বিপরীতে। আর বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তে নিয়মিতভাবে নিরীহ বাংলাদেশিদের হত্যা করে চলেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। মার্কিন মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ২০১০ সালের প্রতিবেদন অনুসারে গত ১০ বছরে ৯০০ নিরীহ বেসামরিক বাংলাদেশী নাগরিক ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে। বিপরীতে একই সীমান্তে কোন ভারতীয় বেসামরিক নাগরিক বাংলাদেশী সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে এমন সংবাদ জানা যায় না। লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান, চীন, মিয়ানমার, নেপাল এবং ভুটানের স্থল সীমান্ত থাকলেও এই পাঁচটি দেশের কোন বেসামরিক নাগরিককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী সীমান্তে হত্যা করেছে বলে খবর পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের স্থল সীমান্ত জুড়ে নিরীহ বেসামরিক বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ড কোন বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা নয়, বরং তা বছরের পর বছর বিরতিহীনভাবে চলছেই।

তৃতীয় কারণ হল পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতায় ইন্ধন। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বে যে সহিংসতা শুরু হয়েছিল জনসংহতি সমিতি বা শান্তিবাহিনীর নামে, তা ভারতের প্রত্যক্ষ মদতেই শুরু হয়েছিল। নিজের ভূখণ্ডে শান্তিবাহিনীকে আশ্রয় দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অস্থিতিশীল কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য তাদের ব্যবহার করেছিল ভারত। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা ঠেকানোর জন্য বাংলাদেশকে পার্বত্যাঞ্চলে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে রাখতে হয়েছে, প্রচুর সামরিক-বেসামরিক প্রাণহানি স্বীকার করে নিতে হয়েছে এবং পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসরত বাঙালি জনগোষ্ঠীকে জানমাল হারানোসহ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, পিতা শেখ মুজিবের সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সহিংসতা শুরু হয়েছিল যে ভারতের মদতে অগ্রজ মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বে, দুই যুগ পর কন্যা শেখ হাসিনার সময়ে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে অনুজ সন্তু লারমার সঙ্গে সে ভারতেরই চাপে বা প্রভাবে। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে ভারত তাদের মাটিতে লালিত সশস্ত্র শান্তিবাহিনীকে শেখ

www.pathagar.com

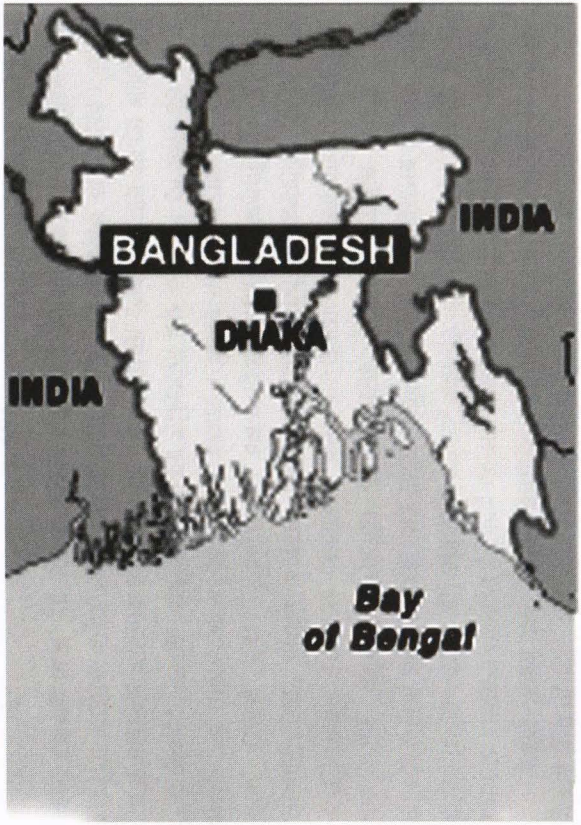

www.pathagar.com

হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে চাপ প্রয়োগ করেছিল, সেই ভারতই আবার ইউপিডিএফ নামীয় নতুন একটি শান্তিচুক্তি বিরোধী অংশ তৈরি করে সেখানে অস্থিরতা জিইয়ে রাখছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

চতুর্থ কারণ হল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ফেনসিডিল প্রেরণ। বাংলাদেশের যুবসমাজ আজ ফেনসিডিলসহ নানা নেশাজাতীয় সামগ্রীর কবলে পড়ে এক সীমাহীন অবক্ষয়ের শিকার। বাংলাদেশে ফেনসিডিলের উৎপাদন নিষিদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তের ওপার থেকে তা বাংলাদেশের বাজারে অবাধে পাঠানো শুরু হয়। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল বরাবর ভারতীয় ভূখণ্ডে বিশেষ ব্যবস্থায় কারখানা স্থাপন করে ফেনসিডিল উৎপাদন করে সব উৎপাদন শুধু বাংলাদেশের বাজারে পাঠানো হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে, এমন অভিযোগ পত্র-পত্রিকায় বহু বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে। দুঃখজনক হলেও তো সত্য যে, ফেনসিডিলের আসক্তিতে আজ আমাদের তরুণ ও যুবসমাজ শ্রেণী-ধর্ম-শিক্ষা নির্বিশেষে দেশজুড়ে শারীরিক এবং মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে, নানা ধরনের অপরাধ কর্মে জড়িয়ে পড়ছে, লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ছে এবং সামগ্রিকভাবে তাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ সমূলে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই সর্বনাশা নেশাসক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে অকর্মণ্য করে দেয়ার বিশেষ অপতৎপরতায় ভারতের প্রশ্রয় কিংবা পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ হতভাগা অভিভাবকদের মুখে জোরেশোরে শোনা যায়।

পঞ্চম কারণ হল ব্যবসা-বাণিজ্যে একতরফা সংরক্ষণবাদিতা এবং স্বার্থপরতা। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়ে বাণিজ্য ভারসাম্য বহুকাল ধরেই ভারতের অনুকূলে। বাণিজ্য ঘাটতি বিশাল অংকে বাংলাদেশের প্রতিকূলে। বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে বাংলাদেশী পণ্য ভারতীয় বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে যে স্বাভাবিক সুবিধা পাওয়ার দাবি রাখে তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভারত টালবাহানা করে যাচ্ছে বলে বাংলাদেশী ব্যবসায়ী মহল প্রায়ই অভিযোগ করে থাকে। ভারতীয় সাত বোন আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল রাজ্যে বাংলাদেশ রফতানি করে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনবে—এমন উদ্যোগে বারবার বাদ সেধেছে ভারতীয় নন-ট্যারিফ বাধা।

বাংলাদেশী পণ্যগুলো সিমেন্ট, সাবান, প্রসাধনী, মোড়কজাত খাবার, শুঁটকি, ব্যাটারি প্রভৃতি যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এবং মূল্যে প্রতিযোগিতাসক্ষম হলেও প্রতি চালানে দিল্লি থেকে মান সম্পর্কিত সনদ আনার শর্ত জুড়ে দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে অনেকবার। আমাদের গার্মেন্ট সামগ্রীকে কোটা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। ভারতের বাজারে শূন্য শুল্কে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত বাংলাদেশী পণ্য তালিকা অগুরুত্বপূর্ণ পণ্যের তালিকায় ভরপুর করে রাখা হয়। যেসব পণ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা করতে তুলনামূলকভাবে সক্ষম সেসব পণ্যে বাধা সৃষ্টি করে রাখার অভিযোগ বহুদিনের। ভারতীয় সব টিভি চ্যানেলকে আমাদের দেশে নিঃশর্ত অবাধ

www.pathagar.com

প্রবেশাধিকার দেয়ার পরও আমাদের কোন টিভি চ্যানেলকে ভারতে প্রবেশাধিকার দেয়া হচ্ছে না আজ পর্যন্ত।

ষষ্ঠ কারণ হল তিনবিঘা করিডোর না দেয়া এবং এখন নিজেই পুরো বাংলাদেশের বুক চিরে করিডোর চাওয়া। ১৯৭৩ সালে আমাদের সংবিধানে তৃতীয় সংশোধনী এনে আমরা বেরুবাড়িসহ কয়েকটি ছিটমহল ভারতের কাছে হস্তান্তর করেছিলাম। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত ছিটমহল চুক্তি অনুযায়ী বিনিময়ে আমাদের কাছে তিনবিঘা করিডোরসহ তাদের প্রদেয় ছিটমহলগুলো ভারত আর হস্তান্তর করেনি। কারণ হিসেবে তারা বলেছে, ছিটমহল বিনিময় চুক্তিটি তারা তাদের সংসদে অনুমোদন করাতে পারেনি বা করেনি। এরই মধ্যে নতুনভাবে উপস্থিত হয়েছে ভারতকে একতরফাভাবে ট্রানজিটের নামে করিডোর দেয়ার ব্যবস্থা। ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে গোপনে ট্রানজিটের নামে ভারতের এক প্রান্ত থেকে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ভারতেরই আরেক প্রান্তে যাওয়ার জন্য করিডোর দেয়ার চুক্তি করে এসেছে।

এত দিন বাদেও এই গোপন করিডোর চুক্তি এখন পর্যন্ত সংসদে উপস্থাপন করা হয়নি বা জাতির সামনে প্রকাশ্যে পেশ করা হয়নি। ভারতকে করিডোর প্রদান বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে বলে বিশেষজ্ঞরাসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সমালোচনা করলেও ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার তাতে কর্ণপাত করছে না। এই করিডোর প্রদান করার কারণে বাংলাদেশ নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়বে দু'ভাবে। প্রথমত, ভারতের সাত বোন রাজ্যগুলোর বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর দিক থেকে বাংলাদেশের মাটিতে নানাবিধ ঝামেলা, সন্ত্রাস, অস্থিরতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আমদানি হওয়ার সমূহ-সম্ভাবনা থাকবে। দ্বিতীয়ত, ভারত রাষ্ট্রীয়ভাবে নিজেই যে কোন সময় করিডোরে প্রবেশাধিকারের সূত্রে বাংলাদেশের জন্য নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে তার সুবিধাজনক সময়ে। আবার করিডোর প্রদানের কারণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবেও স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দু'দিক থেকে। প্রথমত, করিডোরের জন্য যে অবকাঠামোগত সুবিধাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচ হবে তা মেটাতে গিয়ে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ত, করিডোর দেয়ার ফলে বাংলাদেশ তার প্রাকৃতিকভাবে অর্জিত 'তুলনামূলক ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা' হারাবে পার্শ্ববর্তী ভারতীয় সাত বোন রাজ্যে নিজের উৎপাদিত পণ্যগুলো রফতানির ক্ষেত্রে।

গত ২৮ জুলাই ২০১১ তারিখে ঢাকা মেট্রোপলিটান চেম্বার ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়াকে মন্তব্য করতে শুনলাম যে, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জুজুর ভয় দেখিয়ে বহুদিন ধরে কানেক্টিভিটিসহ অনেক কিছু নাকি আটকে রাখা হয়েছে। আর নাকি এসব বলে সময়ক্ষেপণ করার সুযোগ নেই। তার ভাষায়, কানেক্টিভিটি নাকি এবার হবেই।

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিকভাবে এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে, কার কানেক্টিভিটির কথা বলছেন তিনি? আর সেই কানেক্টিভিটি দিতে চাচ্ছেন কার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে? উত্তর হচ্ছে খুবই সোজা। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়া শুধু ভারতের কানেক্টিভিটির কথা বলছেন। আর ভারতের কানেক্টিভিটি দিতে চাচ্ছেন তিনি বাংলাদেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে। কারণ ট্রানজিটের নামে যে করিডোর দেয়ার কথা বলছেন তিনি, তাতে কেবল ভারতের একপাশের ভূখণ্ড অন্যপাশের ভূখণ্ডের সঙ্গেই কানেক্টিভিটি পাচ্ছে নজিরবিহীনভাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে। বাংলাদেশ যে এতে কোনরকম নতুন কানেক্টিভিটি অর্জন করছে, তা কিন্তু নয়। বরং বাংলাদেশের স্বার্থ এতে দারুণভাবে হানি হচ্ছে, যা ওপরের অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে কিছুটা বর্ণনা করা হয়েছে। আর বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে তিনি যদি জুজুর ভয় মনে করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, তবে তো বড়ই দুশ্চিন্তার কথা। দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি যত ছোটই হোক, তারও নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা হল, জুজুরা তো আছেই। জুজুদের ভয় না পেলেও প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন এবং যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রেখে জুজুদের হাত থেকে তো দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব-স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে হবেই।

ভারতবান্ধব কথাবার্তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ওপরের অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ার বয়ানে। বন্ধুত্ব করতে গিয়ে নিজের দেশের স্বার্থহানি করার নীতি যে পরিণামে আত্মঘাতী হতে চলেছে, এ সত্যটি আমাদের সবাইকে আজ উপলব্ধি করতে হবে। বিশেষ করে যারা রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল পদে আসীন তাদের কাছ থেকে দেশের স্বার্থরক্ষায় আরও সতর্ক পদক্ষেপ ও সুবিবেচনা প্রত্যাশা করে দেশবাসী। ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করে উপকার করেছিল বলে তার উপকার আপনাকেও করতে হবে, তা না হয় করুন। কিন্তু ভারতের উপকার করতে গিয়ে অতি অবশ্যই নিজের দেশের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিতে হবে। অতিমাত্রায় ভারতবান্ধব হতে গিয়ে নিজের কথা বা কাজ যেন কোনভাবে দেশবিরোধী না হয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে আহ্বান জানাব মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়াকে।

বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতকে তার প্রার্থিত কিছু দেয়ার কোনরকম আলোচনা শুরুর আগেই ন্যূনপক্ষে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলিয়ে রাখা ছয়টি সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধানের শর্ত আরোপ করা প্রয়োজন। অভিন্ন নদীর পানি সমস্যার সমাধান, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড চিরতরে বন্ধ, পার্বত্য চট্টগ্রামে হস্তক্ষেপ বন্ধ, ফেনসিডিলসহ নেশাসামগ্রী প্রেরণ বন্ধ, আমাদের সব পণ্যে নিঃশর্ত শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার এবং তিনবিঘা করিডোরসহ ছিটমহল সমস্যার সমাধান করার জন্য জোরালো চাপ দিতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলা যেতে পারে। 'তুমি আমার প্রিয় বন্ধু, কিন্তু

www.pathagar.com

দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমাকে করিডোর দেয়া সম্ভব হচ্ছে না,' এই কথাটি ভারতকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে। ভারত থেকে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে মিয়ানমার হয়ে চীন বা থাইল্যান্ড যাওয়ার ট্রানজিট বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু ভারতের একপাশ থেকে অন্যপাশে যাওয়ার করিডোর বাংলাদেশের ওপর দিয়ে কোনমতেই নয়।

বাংলাদেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে ভারতসহ বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার নীতি প্রণয়ন করেছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের দেশগুলো, চীন, মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ও ভারতসহ জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন করে বাংলাদেশের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছিলেন। 'প্রভু নয় বন্ধু চাই'—এই একটি ছোট্ট লাইন ছিল তার পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা। আজকের এই নাজুক সময়ে তিনি উপস্থিত থাকলে নিশ্চয় বলতেন, 'কে ভারতবান্ধব আর কে ভারতবিরোধী তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হোক, কে দেশবান্ধব আর কে দেশবিরোধী।'

দৈনিক আমার দেশ-এ ৩১ জুলাই ২০১১ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং আওয়ামী মন্ত্রীদের উপদেশ বর্ষণ

ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী মহোদয় এই তো দু'দিন আগে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জনগণকে কম করে খাবার উপদেশ দিয়ে ফেললেন। একই সঙ্গে 'খাবার লালসা' নিয়ন্ত্রণ করার উপদেশও দিয়েছেন তিনি, যা দেশের সব টেলিভিশন চ্যানেলে এবং জাতীয় দৈনিকে বেশ গুরুত্বসহকারে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে। হালের বিত্তবান ব্যবসায়ী পরিবারের সদস্য হওয়ার সুবাদে তার নিজের ও নিজের পরিবারের সদস্যদের কম বা বেশি খাওয়ার দুশ্চিন্তা তাকে কখনও করতে হয় না বলে আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু বাণিজ্যমন্ত্রীর মত দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের মানুষকে 'খাদ্যলোভী পেটুক' হিসেবে চিত্রিত করার অপচেষ্টা বেশ আপত্তিকর বলেই মনে হয়েছে। খাদ্য গ্রহণ বাণিজ্যমন্ত্রী মহোদয়ের মত হাতে গোনা গুটিকয়েক সৌভাগ্যবানের জন্য বিলাসিতা হলেও হতে পারে। কিন্তু দেশে দ্রব্যমূল্যের যে লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি চলছে তাতে জনসাধারণ যে এমনিতেই প্রয়োজনের তুলনায় কম খেতে বাধ্য হচ্ছেন, সে বিষয়ে সম্ভবত তার কোন ধারণা নেই। বিত্তবৈভবের হাওয়ায় আকাশে উড়তে থাকলে হয়ত জনজীবনের রূঢ় বাস্তবতা অনেক সময় টের পাওয়া যায় না!

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের প্রশ্নবিদ্ধ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদাগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান ওয়াদা ছিল দেশের জনগণকে ১০ টাকা কেজি দরে চাল খাওয়ানো এবং অন্যান্য নিত্যপণ্যসামগ্রীর মূল্যকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ আওয়ামী লীগের এই নির্বাচনী ওয়াদা সরল মনে বিশ্বাস করেছিলেন। তারা তখনকার সাংবিধানিকভাবে অবৈধ ১১ জানুয়ারির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে বিরাজমান দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতির অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। সেই কঠিন সময়ে আওয়ামী লীগ যখন বলে ফেলল যে, তারা ১০ টাকা কেজি দরে চাল খাওয়াবে তখন সেটা আদৌ সম্ভব হবে কিনা, হলেও কীভাবে সম্ভব হবে, বিশ্বাসপ্রবণ বাংলাদেশী জনসাধারণ সেসব বিচার-বিশ্লেষণ করার কোন প্রয়োজন মনে করেননি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পরপর চালের দামসহ অন্যান্য নিত্যপণ্যসামগ্রীর মূল্য কমার বদলে বাড়তে থাকলে তা নেহায়েৎ সাময়িক প্রবণতা বলে ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছিল জনগণকে। আর দ্রব্যমূল্যের লাগাম টেনে ধরতে কিছুটা সময় প্রয়োজন ভেবে জনগণও কিছুটা সময় ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

ভেবেছিলেন কিছুটা সময় পেলে আওয়ামী সরকার হয়তবা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী কিছু উদ্যোগ নেবে।

কিন্তু আজ যখন আওয়ামী লীগ তার ক্ষমতাসীন হওয়ার আড়াই বছরেরও বেশি সময় অতিক্রম করে ফেলেছে এবং চাল ১০ টাকা কেজি তো দূরের কথা তার ৪ গুণ বেশি মূল্যে কিনতে হচ্ছে, ততক্ষণে জনগণের বিশ্বাসের ভিতটুকু নড়ে গেছে। শুধু চাল কেন, তেলের দামও নিয়মিত বিরতিতে বেড়ে চলেছে এবং কমপক্ষে ১২০ টাকা লিটার দরে কেনা লাগছে। চিনি সরকারিভাবে এই রমজান মাসে ৬৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হওয়ার বিভ্রান্তি ছড়ানো হলেও প্রকৃতপক্ষে ৮৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে বাজারে। ডাল, ছোলা, খেজুর প্রভৃতি রমজানের বিশেষ সামগ্রী তো বলতে গেলে ধরাছোঁয়ার বাইরেই। শাকসবজি, মাছ-মাংস, লবণ-মসলা, ফলমূল কোনটার দামই আর আমজনতার সাধ্যের মধ্যে নেই। আওয়ামী লীগ জনগণকে ১০ টাকা কেজি দরে চাল খাওয়ানোর যে ওয়াদা দিয়েছিল, তা তো রক্ষা করলই না বরং সে রকম কোন ওয়াদা যে তারা কখনও কস্মিনকালে জনগণকে দিয়েছিল, সে কথাটিও বেমালুম অস্বীকার করে ফেলল। হায়রে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদা!

সরকারিভাবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মুখ্য দায়িত্বে রয়েছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মহোদয়। বিগত আড়াই বছর ধরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে না পারলেও তিনি নানা অপ্রাসঙ্গিক ও কৌতুকপ্রদ বক্তব্য দিয়ে যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়ে চলেছেন। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রথম বছরটি তিনি পার করেছেন তার মন্ত্রণালয়ের আওতাবহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে করে।

সে সময়টায় তিনি যেন সরকারের সর্ববিষয়ের অঘোষিত প্রধান মুখপাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। বিশেষভাবে মনে পড়ে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দুঃখজনক বিডিআর বিদ্রোহে সেনাকর্মকর্তা হত্যাকাণ্ডের সময়টাতে তার এখতিয়ারবহির্ভূত বক্তব্যগুলো। বিডিআর বাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দু'জনকে ডিঙ্গিয়ে তিনি হুট করে একদিন বলে বসলেন যে, বিডিআর বিদ্রোহে জঙ্গি কানেকশন খুঁজে পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে যদিও তার এই চাঞ্চল্যকর বক্তব্যের কোন রকম ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি, এমনকি সরকারিভাবে প্রণীত তদন্ত প্রতিবেদনেও নয়। সে সময়ে প্রতিদিন সংবাদ মাধ্যমে তার সরব উপস্থিতি জনমনে যুগপৎ হাস্যরস এবং বিরক্তি উদ্রেক করত বলে আশপাশের অনেককে কটু মন্তব্য করতে শুনেছি। দ্বিতীয় বছরটি তিনি পার করলেন বিশ্ববাজারে নিত্যপণ্যসামগ্রীর দাম বেড়ে গেছে বলে জনঅবহিতকরণ কর্মসূচি চালাতে গিয়ে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যে আমাদের দেশের চেয়ে নিত্যপণ্যসামগ্রীর দাম আরও অনেকগুণ বেশি এই তথ্যটিও তিনি খুব গুরুত্বসহকারে প্রচার করলেন। দেশবাসী তাদের অতি প্রত্যাশিত দ্রব্যমূল্য কমার কোন লক্ষণ না দেখতে পেলেও তার অসংলগ্ন কথামালার চক্করে সীমাহীন এক গোলকধাঁধায় অসহায়ভাবে ঘুরপাক খেতে লাগলেন।

তৃতীয় বছরটি তিনি কেমন করে পার করছেন তার বর্ণনা আমার দেয়ার

www.pathagar.com

প্রয়োজন নেই। কারণ, এই অতি সাম্প্রতিক সময়টুকুতে তার দৌড়ঝাঁপ সচেতন পাঠকদের স্মরণে এবং নজরে আছে বলেই ধরে নিচ্ছি। সামগ্রিকভাবে বিগত আড়াই বছরে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে সম্পাদন করতে ব্যর্থ হলেও তিনি নিজের পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য সাফল্যজনকভাবে বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য সম্পাদন করাতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানা যায়। বিদ্যুৎ খাতে তার পারিবারিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বোচ্চসংখ্যক বিদ্যুৎ প্রকল্প কোন কোন ক্ষেত্রে বিনা টেণ্ডারে বাগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে তার অতুলনীয় প্রভাবের কারণে এবং এর মাধ্যমে তিনি ও তার পরিবার ব্যাপক পরিমাণ মুনাফার অধিকারী হয়ে এরই মধ্যে পত্র-পত্রিকার শিরোনামও দখল করেছেন। তার পারিবারিক মালিকানাধীন দু'টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার নিয়মবহির্ভূতভাবে মন্ত্রিত্বের প্রভাব খাটিয়ে অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যে সরাসরি তালিকাভুক্ত করে নিরীহ বিনিয়োগকারীদের প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে সাম্প্রতিককালে পেশাজীবীদের আয়োজিত এক সেমিনারে। এমনতর আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ যদি দেশের আপামর জনগণের সবারই হত, সবারই যদি আয়-রোজগার এই আড়াই বছর সময়কালে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মহোদয়ের মত বা তার কাছাকাছিও হতে পারত, তবে দেশে দ্রব্যমূল্য কতটুকু বাড়ল বা না বাড়ল তা নিয়ে হয়ত কারও কোন রকম হায় হুতাশ না করলেও চলত।

নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যবসায়ে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন আর নানারকম এখতিয়ারবহির্ভূত কাজকারবারে মূল্যবান সময় ব্যয় করার বিপরীতে বাণিজ্যমন্ত্রী মহোদয়ের আওতাধীন মন্ত্রণালয় থেকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কোন সুনির্দিষ্ট কার্যকর নীতিমালা বা কর্মকৌশল প্রস্তুত করা হয়ে ওঠেনি। নিত্যপণ্যসামগ্রীর মধ্যে কোনটির সরবরাহ কী আর তার বিপরীতে চাহিদাই বা কী তা আজও পর্যন্ত সঠিকভাবে নিরূপিত হয়েছে কিনা জনগণকে জানানো হয়নি। চাহিদার আলোকে এই পণ্যসমূহের স্থানীয় উৎপাদন কতটুকু আর ঘাটতি মেটানোর জন্য আমদানির প্রয়োজনই বা কী পরিমাণ তা সঠিকভাবে নিরূপিত হয়নি। আমদানি করার প্রয়োজন হলে সরকারিভাবে কতটুকু আমদানি হবে আর বেসরকারিভাবে কতটুকু আমদানি হবে তাও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নখদর্পণে আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পণ্যসামগ্রী আমদানিতে এবং বিতরণে সরকারি ভূমিকা থাকবে কিনা আর থাকলে বাজার বাস্তবতায় তার স্বরূপ কী হবে, সে বিষয়েও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করতে সক্ষম হননি তিনি। টিসিবি নামক যে সরকারি প্রতিষ্ঠানটি নিত্যপণ্যসামগ্রী আমদানি করে বাজারজাত করে থাকে তার যুগোপযোগী সদ্ব্যবহার করতেও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

ফলে মাঝে সাঝে ব্যবসায়ীদের ডেকে তার মন্ত্রণালয়ের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বৈঠকখানায় বসে বৈঠক করা আর তাদের মোটা গলায় ধমক দেয়ার সচিত্র প্রতিবেদন টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে প্রচার করা নিষ্ফল আস্ফালন হিসেবেই এযাবৎ প্রতিভাত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হয়েছে। তার সঙ্গে বৈঠকে অংশগ্রহণ করে থাকেন এমন কয়েকজন ব্যবসায়ী ও তাদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে অনানুষ্ঠানিক ঘরোয়া আলোচনায় নানা হাস্যরসের পাশাপাশি এও শুনেছি যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে যে গভীর তাত্ত্বিক ও খুঁটিনাটি বাস্তব জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সেটি তার নেই বলে তাদের কাছে মনে হয়েছে। তাই যখন বৈঠকে ডাকা হয় নিয়ম রক্ষার খাতিরে সেখানে যান বটে, কিন্তু তার এলোমেলো হম্বিতম্বিতে তারা কোন গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। কয়েকজন ব্যবসায়ী আবার. বাণিজ্যমন্ত্রী মহোদয় আহূত সেসব বৈঠকে ইদানীং নিজেরা না গিয়ে তাদের গুরুত্বহীন বেতনভুক্ত কর্মকর্তাদের পাঠানো শুরু করেছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যে রুটিন নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাজার তদারকির কার্যক্রম চালানোর কথা, তা আজ অদক্ষতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত এক অর্থহীন ছেলেখেলায় যেন পরিণত হয়েছে।

সবকিছু মিলিয়ে দেশের সাধারণ মানুষের আজ বড়ই করুণ অবস্থা। দ্রব্যমূল্য যে আওয়ামী লীগ তাদের প্রতিশ্রুত ১০ টাকা কেজি দরে চাল খাওয়ানোর মত অবস্থায় কোনদিনই নিতে পারবে না, তা এর মধ্যে বুঝে গিয়েছেন সাধারণ মানুষ। নির্বাচনের আগে ২০০৮ সালে ভাঁওতা দিয়ে ভোট নেয়ার জন্য আওয়ামী লীগ তাদের বোকা বানিয়েছিল, এই নির্মম সত্যটিও এতদিনে জনগণ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগে দ্রব্যমূল্য যে অবস্থায় ছিল, কমপক্ষে সে অবস্থায়ও যদি তা ধরে রাখা না যায়, তবে তো আর সাধারণের প্রাণ বাঁচে না। আয় তো বাড়ে না সে হারে, যে হারে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে দ্রব্যমূল্য, এই আওয়ামী জমানায়। অনাহারে কি থাকা সম্ভব, কতদিন? অর্ধাহারে থাকাও তো কঠিন হয়ে পড়ছে দিনকে দিন। এর মধ্যে একদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া বলে বসলেন, বাংলাদেশের মানুষ নাকি এখন তিন বেলার পরিবর্তে চারবেলা করে খাচ্ছেন। কষ্টে থাকা অর্ধভুক্ত মানুষগুলোকে নিয়ে এমন ধরনের রসিকতা না করলেও পারতেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া। তার প্রিয়ভাজন আওয়ামী মন্ত্রী মহোদয়গণ, উপদেষ্টাবৃন্দ, সংসদ সদস্যগণ, ছাত্রলীগ-যুবলীগসহ বিশিষ্ট আওয়ামী নেতৃবৃন্দ মাত্র চারবেলা কেন, চাইলে নিশ্চয় আরও বেশি বেলা করে খেতে পারেন। তাদের হয়তবা সেই পরিমাণ আর্থিক উন্নতিও ঘটেছে এরই মধ্যে। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের প্রকৃত আয় এবং ক্রয়ক্ষমতা যে এই আড়াই বছরে কমতে কমতে দেয়ালে পিঠ ঠেকার অবস্থায় উপনীত হয়েছে, তা তো সরকারিভাবে প্রকাশিত মুদ্রাস্ফীতির অঙ্ক আর অর্থনীতির সাধারণ সূচকগুলো দেখেও বোধগম্য হওয়ার কথা। যেমনটা বোঝেননি মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মহোদয় তেমনি বুঝলেন না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়াও।

আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় আবার রমজান শুরুর ঠিক আগে আগে দ্রব্যমূল্য কমানোর উপায় হিসেবে বিশেষজ্ঞসুলভ উপদেশ দিয়ে দিলেন, বাংলাদেশের জনগণ যেন সপ্তাহে একদিন বাজারে না যায়। তাহলেই নাকি দ্রব্যমূল্য

www.pathagar.com

তরতর করে কমে আসবে। চাহিদা কমে যাওয়ার দরুণ ব্যবসায়ীদের ওপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি আমাদের প্রকৃত ভোগই না কমে, তবে শুধু সপ্তাহে একদিন বাজারে না যাওয়ার কারণে চাহিদা কি করে কমবে? এই প্রশ্নের কোন উত্তর অর্থমন্ত্রী মহোদয় না দিলেও মোটামুটি একখানা উত্তর পেলাম আমার শাশুড়ি মাতার কাছে। বয়োবৃদ্ধ মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের এই উপদেশ টেলিভিশনে শুনে আমার আপাত:নিরীহ শাশুড়ি মাতা ক্ষেপে অস্থির। তার মতে এই কথার মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী মহোদয় নাকি আমাদের সবাইকে প্রকারান্তরে সপ্তাহে একদিন না খেয়ে থাকতে বলেছেন। আমি পাল্টা অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষ নিয়ে বললাম যে, তিনি সপ্তাহে একদিন বাজারে যেতে বারণ করেছেন, সপ্তাহে একদিন খেতে বারণ করেননি। তখন শাশুড়ি মাতা যুক্তি দেখালেন যে, আমরা মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী এমনিতেও সপ্তাহে প্রতিদিন বাজারে যাই না, সপ্তাহে দুই বা তিনদিন বাজার করি। অর্থমন্ত্রী হিসেবে তার এই সাধারণ কথাটি জানা থাকার কথা। সেক্ষেত্রে তিনি আসলে সপ্তাহে একদিন না খেয়েই থাকতে বলেছেন আমাদের, এই বলে শাশুড়ি মাতা জোর তর্ক জুড়লেন। আমাদের বাসার চটপটে গৃহকর্মী, যার নাম শারমিন মাঝখান থেকে বলল আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা। তার বাবা একজন রিকশা চালক। বেচারা দৈনিক ভিত্তিতে রোজগার শেষে দৈনিক বাজার করে পরিবার নিয়ে উদরপূর্তি করে থাকেন, তার কী হবে? তিনি প্রতিদিন বাজার না করলে পরিবার নিয়ে অনাহার করা ছাড়া উপায় নেই। আবার একসঙ্গে সপ্তাহের বাজার করার সামর্থ্য বা জোগাড়ও নেই তার! শাশুড়ি মাতা এবং শারমিন দু'জনের কথায়ই যুক্তি আছে বলে পিছু হটলাম। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় সম্ভবত না বুঝেই এমনতর উপদেশ দিয়ে ফেলেছেন। যাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ বর্ষণ করেছেন তারা তা নাকচ করে দিতে পারে বাস্তব কারণ দেখিয়ে, সেটুকু আন্দাজ করা বা বোঝার মত জ্ঞানের গভীরতা ও জনসম্পৃক্ততা অবশ্য সবার থাকেও না।

যে কোন বিষয় নয়, রীতিমত জনগণের পরিমাণমাফিক খেয়ে জীবনটুকু ধারণ করার মত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম যেটি, অন্তত সেই খাদ্য সামগ্রীর মূল্য স্থিতিশীল রাখা বা জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য যে কোন সরকার আন্তরিকভাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে নীতি প্রণয়ন করবে এবং যথোপযুক্ত কর্মকৌশল গ্রহণ করবে, সেটাই প্রত্যাশিত। যার যা করণীয় তা না করে, অর্ধভুক্ত দিশেহারা জনগণের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং বাণিজ্যমন্ত্রীর পালাক্রমে পরিবেশিত অশোভন বাগাড়ম্বর এবং বালখিল্যসুলভ উপদেশসমূহ নিষ্ঠুর তামাশার মতই শোনাচ্ছে। শাশুড়ি মাতারা এবং শারমিনের বাবারা এমনতর তামাশা অপছন্দ করে কখন যে রাস্তায় নেমে আসবে, কে জানে?

দৈনিক আমার দেশ-এ ৭ আগস্ট ২০১১ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

বন্ধু কেন শত্রুর মত নিষ্ঠুর?

সম্প্রতি পিলে চমকে দেয়ার মত একটি ছবি প্রকাশ করা হয়েছে দেশের প্রায় সব দৈনিকের প্রথম পাতায়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ঢাকার রাজপথে পুলিশের চকচকে বুটের নিচে পিষ্ট হচ্ছেন নিতান্ত নিরীহ এক নাগরিক। বাংলাদেশের আপামর জনগণের সঙ্গে পেটোয়া পুলিশ বাহিনী তথা নিপীড়ক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিদ্যমান বাস্তব সম্পর্কের প্রতীকী চিত্রই যেন ফুটিয়ে তুলেছে এ ছবিটি। ২৩ সেপ্টেম্বর আমার দেশ, নয়া দিগন্ত, যুগান্তর, ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন দৈনিকের প্রথম পাতায় গুরুত্বের সঙ্গে ছবিটি ছাপা হলেও প্রচারসংখ্যায় শীর্ষস্থানে থাকা দৈনিক প্রথম আলো যে কোন কারণেই হোক সেদিন তা ছাপেনি অথবা হয়ত বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিল। অন্য সব পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর ছবিটি নিয়ে দেশজুড়ে হৈচৈ শুরু হলে অবশ্য পরদিন প্রথম আলোতেও ছবিটি ছাপা হয়। ভারাক্রান্ত মনে প্রশ্ন জাগছিল, এই নির্মমতাকে কি এখনও হাততালি পাওয়ার মত কোন বীরত্বগাথা হিসেবেই বিবেচনা করছে পুলিশ প্রশাসন তথা আওয়ামী সরকার? নাকি এবার অন্তত ঘটনাটিকে থমকে দাঁড়ানোর মত ন্যক্কারজনক বর্বরতা হিসেবে চিহ্নিত করে একটু নড়েচড়ে বসেছে? দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকারের চিরাচরিত জুলুমবাজ চরিত্রের ধারাবাহিকতায় তাদেরই আশ্রয়-প্রশ্রয়ে আজ সারা দেশে এমনতর ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে।

এই বহুল আলোচিত ছবিটি নিয়ে সারা দেশে যখন নিন্দার ঝড় ও যারপরনাই তোলপাড় চলছে, তখনও এই লজ্জাজনক ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে রীতিমাফিক একটি বিবৃতি দেয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি পুলিশ প্রশাসন বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। উপরন্তু পুলিশি বুটের নিচে পিষ্ট হওয়া অতিসাধারণ এই নাগরিক আওয়ামী নিপীড়নের নতুনতম পদ্ধতি ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক কর্তৃক এক বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন। নির্যাতনকারীর তাৎক্ষণিক কোনো সাজা হল না; বরং যিনি রাজপথে প্রকাশ্যে নির্যাতিত হলেন তাকেই চটজলদি কারাদণ্ড দেয়া হল! ত্বরিত ফরমায়েশি বিচার সরবরাহের এই অদ্ভুত ব্যবস্থা আমাদের বিশৃঙ্খল দেশটাকে সামনের দিনগুলোতে নৈরাজ্যের কোন স্তরে যে নিয়ে যাবে, কে জানে? ঘটনার সাত দিন পর বৃহস্পতিবারের পত্রিকাতেই দেখলাম, আলোচিত পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করার মত নামকাওয়াস্তে ব্যবস্থা গ্রহণের সংবাদ ছাপা হয়েছে। ব্রিটিশ পুলিশ নয়, পাকিস্তানি পুলিশ নয়—আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের তথাকথিত 'জনগণের বন্ধু'

www.pathagar.com

পুলিশভাই এ কেমন বীরত্ব প্রদর্শন করলেন? কী এত রাগ, কী এমন বিদ্বেষ পুষে রেখেছিলেন তিনি এমন সাধারণ এক নাগরিকের প্রতি? নিরীহ-নিরস্ত্র এক সাধারণ নাগরিককে রাজপথে অমানুষিকভাবে পিটিয়ে দলিত-মথিত করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার এই পুলিশি উন্মাদনা সাধারণ জনগণকে বিশেষভাবে বিচলিত করে তুলেছে। পুলিশের এ ধরনের আচরণকে আর যাই বলা হোক, বন্ধুসুলভ যে বলা যাবে না তা আশা করি সরকারিভাবে পুলিশের মুরব্বি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়া ছাড়া আর সবাই স্বীকার করবেন।

ঘটনাটি হরতালের দিন ঘটেছে। গত ২২ সেপ্টেম্বর বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সারা দেশে ১১ ঘণ্টার হরতাল ডেকেছিল মূলত তেল-গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে। তেল-গ্যাসের দাম বাড়ানোর ফলে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধিসহ ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাসহ জনজীবনের নানা ধরনের দুর্ভোগ লাঘবের দাবিতে ডাকা এই হরতালে জনগণ ব্যাপক সাড়া দিয়েছে। দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ক্ষুদ্র পরিসরে যে জনমত জরিপ চালানো হয় অনলাইনে, সেগুলোর ফলাফল থেকে দেখা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরদাতাই এই হরতাল সমর্থন করেছেন। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে প্রচারিত টকশোগুলোতেও জনদাবি নিয়ে ডাকা এ হরতালকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

কোন কোন আলোচক তো সোজাসুজিই বলেছেন, বহুদিন পর বিএনপি জনগণের ইস্যু নিয়ে হরতাল ডাকায় সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু হরতালের দিনে পুলিশ বাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীগুলোর অতি উৎসাহী তৎপরতা ছিল খুবই আপত্তিকর। তারা প্রধান বিরোধী দল বিএনপির নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়টি ঘিরে রেখেছিল বরাবরের মত। বিএনপির নেতা-কর্মীদের তারা দলীয় কার্যালয়ে প্রবেশ করতে বা বের হতে দেয়নি। আগের ডাকা হরতালগুলোর মতই দলীয় কার্যালয়ের সামনে ঘেরাও অবস্থায় চেয়ার পেতে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সঙ্গে ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও দফতরের দায়িত্বে নিয়োজিত যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদসহ হাতে গোনা কয়েকজন নেতা-কর্মী। হরতালের কর্মসূচি বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে যেন ক্ষুদ্রাকারের অবস্থান ধর্মঘটে রূপলাভ করেছিল সেদিন।

এছাড়া ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে হরতালের সমর্থনে বের করা মিছিলগুলোকে দেখামাত্র তাড়া করেছে পুলিশ, বেধড়ক পিটুনি দিয়েছে, হরতালের সমর্থনসূচক ব্যানারগুলো টেনে-হিঁচড়ে কেড়ে নিয়েছে, আর লাঠিপেটা থেকে বাঁচতে ভোঁ দৌড় দেয়ার পরও যাকে যাকে ধরতে পেরেছে তাকেই কিল-ঘুষি-লাথি সহযোগে গ্রেফতার করে পুলিশ ভ্যানে তুলে নিয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে হরতালের সমর্থকদের বিভিন্ন জায়গায় সাজাও নাকি দেয়া হয়েছে বলে পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে রাজপথে

www.pathagar.com

অবস্থান নিয়ে হরতালকারীদের প্রতিহত করার ঘোষণা ছিল যথেষ্ট কৌতূহল উদ্দীপক। জাতীয় সংসদের সরকারদলীয় হুইপ ও আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মির্জা আযম নাকি হরতাল পালনকারীদের গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন তার বীর বাহাদুর নেতা-কর্মীদের প্রতি, যারা এরই মধ্যে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজিতে দেশব্যাপী বিশেষ সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আওয়ামী লীগের দলীয় সন্ত্রাসী ও নেতা-কর্মীরা এবং সরকারি পুলিশ বাহিনী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জনদাবিতে ডাকা সেদিনের হরতাল প্রতিরোধে সীমাহীন তাণ্ডব চালিয়েছে বেপরোয়াভাবে। গণতন্ত্রের লেবাসে ফ্যাসিস্ট চরিত্রের আওয়ামী সরকার সবমিলিয়ে এক অননুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করল বিগত হরতালের দিনে।

এর আগের হরতালে বিরোধী দলের চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুককে নির্মমভাবে প্রহার করেছিল চিহ্নিত কিছু অতি উৎসাহী পুলিশ কর্মকর্তা। পুলিশি প্রহারে গুরুতর আহত হয়ে ফারুক সাহেব এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। দায়ী পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সারা দেশে নিন্দার ঝড় বইলেও অদ্যাবধি কোন বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এই তো সেদিন আবার সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী এম ইউ আহমেদকে মধ্যরাতে বাসা থেকে তুলে নিয়ে নির্যাতন করে মরণাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে পাঠাল পুলিশ। দিনকয়েক মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে তিনি তো প্রাণই হারালেন। অথচ দায়ী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে এবারও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সপ্রতি যাত্রাবাড়ী এলাকার ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি কাজী আতাউর রহমান লিটুকে সাদা পোশাকের পুলিশ রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গুম করে দিয়েছে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠেছে। তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না আজ পর্যন্ত।

স্বজন হারানো পরিজনের আহাজারি বাতাসকে ভারী করে তুলছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মহল এখনও রহস্যজনকভাবে নীরব। বছর পেরিয়ে গেল, কিন্তু এখনও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি ঢাকা সিটি করপোরেশনের কমিশনার ও ঢাকা মহানগর বিএনপি নেতা চৌধুরী আলমের। তাকেও ফার্মগেট এলাকায় গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গুম করে দেয়ার অভিযোগে কত শত হৈচৈ হল। কিন্তু কই, কাউকে তো কোন জবাবদিহি করতে হয়নি। ঢাকার কাছে আমিনবাজারে নির্দোষ ৬ ছাত্রের গণপিটুনির কবলে পড়ে মৃত্যুতে পুলিশের বিতর্কিত ভূমিকা এবং নোয়াখালীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে হতভাগা কিশোরকে গণপিটুনি দেয়ার জন্য উচ্ছৃঙ্খল জনতার হাতে তুলে দেয়ার নির্মমতা সারা দেশের সব বিবেকবান মানুষকে হতবাক করে দিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের জীবনের মূল্য কি এতই কম বলে বিবেচিত হয় পুলিশ এবং তাদের নিয়ন্ত্রক আওয়ামী কর্তাব্যক্তিদের কাছে?

হরতালের দিনে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে দেখছিলাম হরতালের সমর্থনে রাজপথে মিছিলকারীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের দৃশ্য। সত্যি বলতে কী, বড়ই

www.pathagar.com

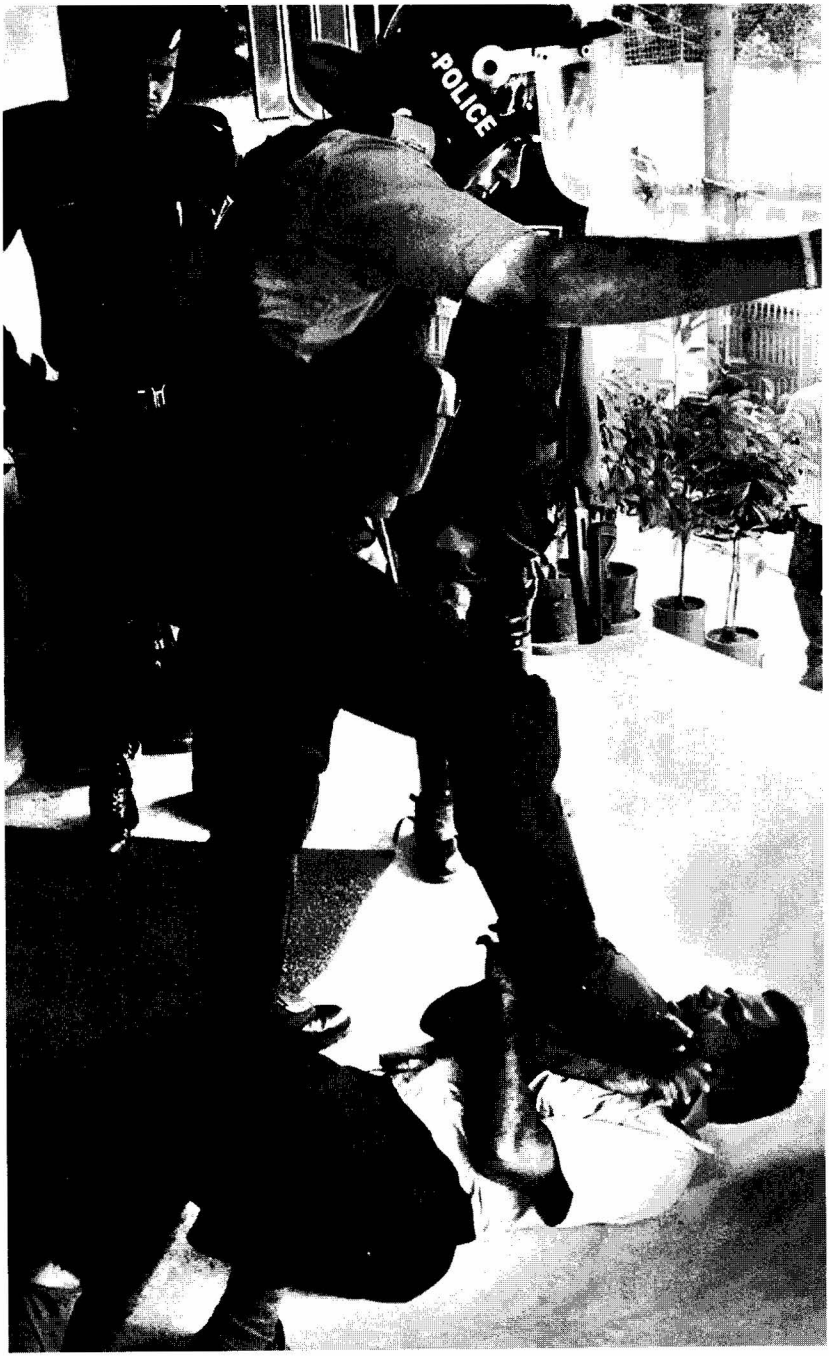

www.pathagar.com

নির্দয় এবং অমানবিক মনে হয়েছে। মানবিকতার এমন অপমান এবং সংবেদনশীলতার এমন অনুপস্থিতি সত্যিই হতাশাজনক। প্রবল আক্রোশ নিয়ে নিরস্ত্র নিরীহ মানুষের ওপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার এই অমানুষিক প্রবণতা সভ্য জগতে নজিরবিহীন। কোন মানুষকে পেটাতে পেটাতে রাস্তায় ফেলে দিয়ে তারপরও অবিরাম পেটাতে থাকা এবং অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরও উন্মাদের মত লাঠিপেটা করা কতটুকু মানবাধিকারের চেতনার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ আর কতটুকুই বা পুলিশি পেশাদারিত্বের সীমার মধ্যে পড়ে, আমার বোধে আসে না।

লিমন নামের হতভাগা কিশোরের ঘটনাও নিশ্চয় পাঠকের এতদিনে ভুলে যাওয়ার কথা নয়। দুর্ভাগ্য হল এই যে, ওপরে বর্ণিত কোন ঘটনারই কোন রকম প্রতিকার হয়নি বলে আরও আরও এমনতর ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে একের পর এক। এর শেষ কোথায়, কে জবাব দেবে? সম্প্রতি মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা এনজিও আইন ও সালিশ কেন্দ্রের কর্ণধার অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দুরবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, দেশে নাকি আজ আর স্বাভাবিক মৃত্যুর কোন গ্যারান্টি নেই। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় তো একসময় লিমনের ঘটনা নিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাড়াবাড়ির সমালোচনা করেছিলেন এবং প্রয়োজনে নিজে উদ্যোগী হয়ে এলিট ফোর্স র‍্যাবের বিরুদ্ধে লিমনের পক্ষ হয়ে মামলা করবেন বলেছিলেন। কিন্তু যা বলেছিলেন, তা তিনি করতে পারেননি।

আওয়ামী সরকারের অন্তর্গত চাপের মুখে তিনি এখন মোটামুটি চুপচাপই বলা চলে। আমিনবাজার, নোয়াখালী বা সাম্প্রতিক পুলিশি বুটের নিচে পিষ্ট করার ঘটনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন নজরে পড়ার মত নীরব। আরও উৎকণ্ঠার বিষয় হল, গণমাধ্যমে পুলিশি নিপীড়নের খবরাখবর যতটুকু প্রকাশ পায় কিংবা যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনা করা হয় মাঝে সাঝে, তাও নাকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাকশালী কায়দার জাতীয় সম্প্রচার আইন বা নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে।

একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল সতত জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে এবং জনগণের ওপর কোনরকম নিপীড়ন নির্যাতন হলে তার প্রতিকার করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে, স্বাভাবিকভাবে সেরকমই আশা করা হয়। আর বিরোধী দল সেই গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সরকারের নীতি ও কার্যক্রমের সমালোচনা করবে, প্রয়োজনে সরকারের জনবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করবে, জনগণের পক্ষে শক্ত অবস্থান নেবে এবং তা করতে গিয়ে নানাবিধ রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করবে, তাও আশা করা হয়।

গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে তাই সরকারের উচিত বিরোধী দলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত নানাবিধ সমালোচনা ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে দেয়া রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা। তা না করে বিরোধী দলের নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক

www.pathagar.com

কর্মসূচি ঠেকাতে সরকার যদি তার অধীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে লেলিয়ে দেয় বিরোধী দলকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে দমনের জন্য, তা আখেরে আদৌ কোন শুভ ফল বয়ে আনে না।

সরকার সম্প্রতি যে তেল ও গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে, তা মূলত করেছে দাতা সংস্থা আইএমএফের চাপে। আজ দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থায় দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির চাপে সাধারণ জনগণের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় হয়েছে। তার ওপরে আবার তেল ও গ্যাসের দাম বেড়ে গেলে যে জনজীবন আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, সেই আশঙ্কায় বিরোধী দলের পক্ষ থেকে জনস্বার্থে রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে হরতাল দেয়া হয়েছিল ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে। সরকারের তেল-গ্যাসের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ জনগণও বিরোধী দলের কাছে তা প্রত্যাশা করছিল। জনগণের ইস্যু নিয়ে ডাকা হরতালের দিনে সাধারণ নাগরিক পুলিশের হাতে রাজপথে মার খাবে, বুটের নিচে পিষ্ট হবে, তা কোন ধরনের গণতন্ত্রের নমুনা? হরতাল কি কোন নিষিদ্ধ রাজনৈতিক কর্মসূচি? যদি হরতাল স্বীকৃত রাজনৈতিক কর্মসূচি হয়, তবে হরতালের পক্ষে মিছিলকারীদের বেধড়ক লাঠিপেটা করা বা অবমাননাকরভাবে গ্রেফতার করা কি গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে?

দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনী কর্তৃক নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে প্রকাশ্য রাজপথে কিংবা রিমাণ্ডে নিয়ে গোপনে মারধর করা, গুম করে ফেলা, ক্রসফায়ার বা এনকাউন্টারের নামে ঠাণ্ডামাথায় হত্যা করা যেমন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন, তেমনি তার বিপরীতে সরকারের তরফ থেকে এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করাও মানবাধিকার লঙ্ঘনকে প্রশ্রয় দেয়ার শামিল। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করাই যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব বলে আমরা জানি, সেই বাহিনীগুলোর হাতেই আজ দুর্ভাগ্যজনকভাবে জননিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। 'পুলিশ জনগণের বন্ধু' বলে যে স্লোগানটি পুলিশ বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে আসছে তা আজ সর্বতোভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। বন্ধু হওয়ার দাবি নিয়ে রচিত স্লোগানটি যে আপাত ভালো শোনায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া পুলিশের নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণ ও কর্মকাণ্ড এই ভালো শোনানো স্লোগানটিকে কোনরকম বিশ্বাসযোগ্য সমর্থন জোগাচ্ছে না।

স্লোগানে বর্ণিত পুলিশের আদর্শ বন্ধুসুলভ চেহারার বিপরীতে এক ধরনের শত্রুভাবাপন্ন ভয়ঙ্কর চেহারা যেন আজ জনমনে স্থান করে নিচ্ছে। রাষ্ট্রের অন্যতম জনসম্পৃক্ত ও অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পুলিশের ভাবভঙ্গি, আচার-আচরণ, চরিত্র ও কর্মকাণ্ড ক্রমবর্ধমান হারে নেতিবাচক রূপলাভ করছে, যা বড়ই উদ্বেগের বিষয়। পুলিশের গণমুখী চরিত্র ও সংবেদনশীল ভাবমূর্তি ধ্বংসের এই বিপজ্জনক প্রবণতা

www.pathagar.com

অবিলম্বে রোধ করা জরুরি। দায়িত্বশীল সবাইকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এ ব্যাপারে গভীর ভাবনা-চিন্তা করে প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে। নতুবা আজকের বিদ্যমান ভয়াবহ পরিস্থিতি যে সামনের দিনগুলোয় ভয়াবহতর নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে, সে আশঙ্কা অমূলক বলে উড়িয়ে দেয়ার অবকাশ নেই। মনে রাখা ভালো, কল্পকাহিনীতে বর্ণিত ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানব নাকি কোন একপর্যায়ে তার স্রষ্টার জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জনগণের বন্ধু হওয়ার দাবিদার পুলিশ বাহিনী সবার কাছে গ্রহণযোগ্য প্রিয় বন্ধু হয়েই থাকুক। সে যেন বেখেয়ালে কারও সঙ্কীর্ণ রাজনীতির অপরিণামদর্শী প্ররোচনায় ভীতিকর কোন গণশত্রুর প্রতিকৃতি না হয়ে ওঠে।

দৈনিক আমার দেশ-এ ১ অক্টোবর ২০১১ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

সরকারের ভিত কি নড়ে গেছে?

শিরোনামে উল্লিখিত প্রশ্নটি বেশ কয়েক মাস ধরে আলোচিত হতে শুনছি বিভিন্ন মহলে। শুনতে পাই দরিদ্র রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে উচ্চ মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি ব্যাংক কর্মকর্তা পর্যন্ত অনেকেই একে অন্যকে জিজ্ঞেস করছেন, এই সরকার আর কতদিন ভাই? আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের মেয়াদ তো দেখতে দেখতে প্রায় তিন বছর পূর্ণ হতে চলল। এই সময়কালের মধ্যে সরকারের জনপ্রিয়তা বা গ্রহণযোগ্যতা যে নামতে নামতে এখন প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছে তা বোঝা যায় সাধারণ মানুষের কথাবার্তা একটু কান পেতে শুনলেই। এমনকি খোদ আওয়ামী সমর্থকদের চোখে-মুখেও ইদানীং চরম হতাশার ছাপ দেখতে পাচ্ছি। ক্ষমতাসীন সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, ব্যর্থতা ও বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের ফলে জনমনে সৃষ্ট পুঞ্জীভূত ক্ষোভের কি তবে বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছে?

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এই মুহূর্তে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে ভয়াবহ রকমের খারাপ বলে প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদরা সবাই মন্তব্য করে যাচ্ছেন হরহামেশা। আর সাদা চোখে দেখলেও দিব্যি বোঝা যায়, মানুষ বেশ কষ্টে আছে। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি শ্রেণীভেদে আপামর জনসাধারণের জীবনে দুর্বিসহ অনটনের সৃষ্টি করেছে। নীরব এক দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে দেশ জুড়ে। বিগত নির্বাচনের আগে দশ টাকা কেজি দরে চাল খাওয়ানোর গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। আজ তার চারগুণ অর্থাৎ চল্লিশ টাকা কেজি দরে চাল কিনতে বাধ্য হচ্ছে জনগণ। অন্যসব নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী যেমন তেল, চিনি, মাছ-মাংস, শাকসবজি, পেঁয়াজ-মরিচের মূল্যবৃদ্ধি অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান টিসিবি প্রকাশিত সাম্প্রতিক দ্রব্যমূল্যের তালিকা আগের দ্রব্যমূল্যের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্য কমা সত্ত্বেও সরকারের চাপিয়ে দেয়া জ্বালানি তেল ও সিএনজির কয়েক দফায় মূল্যবৃদ্ধি চলমান সঙ্কটকে আরও ঘনীভূত করেছে।

শেয়ারবাজারে প্রতারণার অশুভ ফাঁদ পেতে সাধারণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের লাখো-কোটি টাকা লুটে নেয়ার চক্রে সরকারের দায়িত্বশীল লোকজন এমনকি মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবার-পরিজনরাও সক্রিয়ভাবে জড়িত বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে মোটামুটি সব জাতীয় দৈনিকে। প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র পক্ষ থেকেও শেয়ারবাজার প্রতারণার জন্য সরাসরি সরকারের উচ্চ মহলকে দায়ী করে

www.pathagar.com

এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। তথাকথিত ফুলে-ফেঁপে ওঠা শেয়ারবাজার মুখ থুবড়ে পড়েছে। ইদানীং ভুক্তভোগীদের অসহায় কান্না আর বিক্ষোভসহ আমরণ অনশন কর্মসূচি পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে দমন করা হচ্ছে। পাশাপাশি দেশের অর্থবাজার বা মানি মার্কেটেও সীমাহীন অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও অদূরদর্শী নীতিমালার ফলে বেশিরভাগ ব্যাংক একদিকে তারল্যের সঙ্কট আর অন্যদিকে বিনিয়োগ করতে না পারার কারণে আয় কমে যাওয়ায় দেউলিয়াত্বের সীমায় অবস্থান করছে। কলমানি মার্কেটে নজিরবিহীন হাহাকার চলছে। বাজেট ঘাটতি মেটাতে গিয়ে সরকারকে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যারপরনাই রকমের ধার করতে হচ্ছে, ফলস্বরূপ অর্থবাজার আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। এহেন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আবার নতুন করে আরও কয়েকটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়ার উদ্যোগ সর্বমহলে সমালোচিত হচ্ছে, এমনকি দাতাসংস্থা আইএমএফও এ ব্যাপারে তাদের আপত্তি জানিয়ে দিয়েছে।

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দশ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে এসেছে এর মধ্যে, যা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্ধারিত তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। সারা বিশ্বের বিভিন্ন মুদ্রার সাপেক্ষে যখন মার্কিন ডলারের দাম কমছে বলে জানা যায়, তখন বাংলাদেশে টাকার বিপরীতে মার্কিন ডলারের দাম কেবল বাড়ছেই। দেশের সামগ্রিক আমদানির পরিমাণ রফতানির চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে তা আমাদের অর্থনীতির ওপরে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। মুদ্রাস্ফীতি দুই অঙ্কের বেশি হারে বাড়ছে যা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। ব্যাগ ভরে টাকা নিয়ে বাজার থেকে পকেট ভরে পণ্যসামগ্রী কিনে আনার মত দশায় উপনীত হয়েছি কি আমরা? বিনিয়োগের চিত্রও নেতিবাচক। গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বন্ধ রাখায় এবং ব্যাংকগুলোতে চরম তারল্য সঙ্কট বিরাজ করায় নতুন কোন বিনিয়োগ হচ্ছে না। ফলে নতুন কোন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না অভ্যন্তরীণ বাজারে। অন্যদিকে প্রবাসের শ্রমবাজারও প্রসার লাভ করছে না, বরঞ্চ বিদ্যমান বাজারগুলোতে নেতিবাচক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিনামূল্যে সার দেয়ার কথা থাকলেও বর্তমানে সার, বীজ ও কীটনাশকসহ সব কৃষি উপকরণের দাম কৃষকের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সীমান্ত নিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তোলা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। রহস্যজনক বিডিআর বিদ্রোহে সেনা কর্মকর্তা হত্যাকাণ্ড আর তার পরবর্তী সময়ে খোলনলচে পালটে ফেলা বিডিআর বাহিনীকে নাম বদলে বানানো হয়েছে বিজিবি। সীমান্ত রক্ষায় বর্তমান বিজিবির কার্যকর কোন ভূমিকা না রাখতে পারা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন শোনা যায়। বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে সীমান্ত জরিপের নামে যখন আমাদের জমি অপদখলের চেষ্টা চালাচ্ছিল ভারতীয় খাসিয়ারা বিএসএফের সমর্থনে, তখন স্থানীয় জনসাধারণের প্রতিরোধের মুখে ভারতীয়রা পিছু হটলেও বিজিবি'র

www.pathagar.com

ভূমিকা ছিল দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিষ্ক্রিয়। সীমান্তে বিএসএফ অহরহ নিরীহ বেসামরিক বাংলাদেশী নাগরিক হত্যা করেই যাচ্ছে, যা নিয়ে গণমাধ্যম ও দেশি-বিদেশি মানবাধিকার সংস্থাগুলো সোচ্চার হলেও বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কিশোরী ফেলানীকে হত্যা করে কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলিয়ে রাখার ছবিটি প্রতীকী অর্থে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত পরিস্থিতির সামগ্রিক চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে যেন। সাম্প্রতিককালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময় অপদখলীয় জমি বিনিময়ের নামে যে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে তাতে বাংলাদেশী নাগরিকদের জমি অন্যায্যভাবে ভারতকে দিয়ে দেয়ার অভিযোগ উঠেছে সীমান্তবর্তী স্থানীয় জনসাধারণের মধ্য থেকে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সম্প্রতি ঢাকায় এসে সংবাদ সম্মেলন করে বলে গেলেন যে, বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নেই এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। গত বছরের জুন মাসে দৈনিক আমার দেশ-এর সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে পত্রিকা অফিস থেকে গভীর রাতে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় সরকারের নির্দেশে পেটোয়া পুলিশ বাহিনী এবং পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধের নির্দেশ দিয়ে প্রেস তালাবদ্ধ করে দেয়। মাহমুদুর রহমানকে একনাগাড়ে ১৪ দিন রিমাণ্ডে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে তার ও তার পত্রিকার বিরুদ্ধে ৪৯টি মামলা দায়ের করা হয় হয়রানির উদ্দেশ্যে। উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশের আওতায় পত্রিকাটি একমাস পর থেকে পুনঃপ্রকাশ হতে থাকলেও সম্পাদক মাহমুদুর রহমান প্রায় দশমাস কারাভোগ করে মুক্তি লাভ করেন।

তার ওপর চালানো এই রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন দেশে বিরাজমান গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে। এছাড়াও চ্যানেল ওয়ান বন্ধ করে দেয়া এবং বাংলাভিশনে প্রচারিত জনপ্রিয় টকশো পয়েন্ট অফ অর্ডার বন্ধ করে দেয়ার ঘটনা দেশ ও বিদেশে খুবই সমালোচিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের তরফ থেকে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়ন এবং জাতীয় সম্প্রচার আইন পাসের উদ্যোগকে গণমাধ্যম সংশ্লিষ্টরা বাকশালী কায়দায় পুনরায় গণমাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরার অপচেষ্টা হিসেবেই দেখছেন।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটার ফলে আজকাল সাধারণ নাগরিকের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী র‍্যাব কর্তৃক লিমন নামের অতি সাধারণ এক কিশোরকে পায়ে গুলি করে পঙ্গু করে দেয়ার পর আবার তাকেই উল্টো মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়ার ঘটনা উদ্বেগজনক। ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার প্রভৃতির নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেই চলেছে। এর সঙ্গে আরও যোগ হয়েছে চিহ্নিত কাউকে কাউকে রাস্তা থেকে বা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গুম করে ফেলার প্রবণতা। বিএনপি নেতা চৌধুরী আলমসহ বেশ

www.pathagar.com

কয়েকজনকে গুম করে ফেলার ঘটনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রিমাণ্ডে নিয়ে নির্যাতনের ঘটনা তো অব্যাহত রয়েছেই। নারী নির্যাতন বেড়ে গেছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে অহরহ, চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-খুন উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে এবং তদুপরি গণপিটুনিতে বেশকিছু মৃত্যুর ঘটনাও সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। বিশেষ করে অতি সম্প্রতি সংঘটিত ঢাকার আমিনবাজারে ছয়জন ছাত্রকে শবেবরাতের রাতে পিটিয়ে হত্যা ও নোয়াখালীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক কিশোরকে পুলিশের ইন্ধনে অমানুষিকভাবে পিটিয়ে হত্যার মত ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছেন সবাই। ল'লেসনেস বা আইনহীনতার এই ভয়াবহ রূপ আজ সমাজ সচেতন মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে। বিরোধী দলের ডাকা হরতালের সময় বিরোধী দলীয় চিফ হুইপকে জাতীয় সংসদ এলাকায় সরকারের লেলিয়ে দেয়া পুলিশ বাহিনী কর্তৃক পিটিয়ে আহত করার ঘটনা টেলিভিশনের কল্যাণে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

সাধারণ জনগণের সর্বশেষ প্রতিকার লাভের ভরসা হিসেবে বিচার বিভাগও আজ দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ নিয়ে খোদ আওয়ামীপন্থী সিনিয়র আইনজীবীরাই সমালোচনায় মুখর হয়েছেন এবং তারা তাদের এক সভায় এই সরকারের আমলে নিয়োগ দেয়া উচ্চ আদালতের বিচারকদের যোগ্যতা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন। এই সরকারের আমলেই ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ চ্যাপ্টার পরিচালিত জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিচার বিভাগ শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। বিরোধীদল আহূত হরতাল কর্মসূচিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলার বদলে সরকার সাম্প্রতিককালে ভ্রাম্যমাণ আদালত নামে এক অদ্ভুত বিচার ব্যবস্থা চালু করেছে যারা সরকারের ফরমায়েশ মোতাবেক হরতাল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের তাৎক্ষণিকভাবে সাজা দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করছে। এহেন বিচারের নামে প্রহসন মানবাধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের অঙ্গীকারের বিপরীতে আজ মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হক এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, এখন দেশে বিচার বিভাগই নাকি সর্বোচ্চ মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করেই ফেলছে ভারত আমাদের সরকারের নীরবতার সুযোগ নিয়ে। ফারাক্কার প্রভাবে সমগ্র উত্তরাঞ্চলকে মরুকরণের পর এবার টিপাইমুখ দিয়ে পূর্বাঞ্চলের পুরো মেঘনা অববাহিকাকেও মরুকরণের আয়োজন সম্পন্ন হল। ট্রানজিটের নামে স্বাধীন দেশের বুক চিরে প্রতিবেশী দেশের এক অংশ থেকে আরেক অংশে যাওয়ার জন্য নজিরবিহীনভাবে করিডোর দেয়ার পাঁয়তারা তো চলছেই। এর ফলে যে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে কিংবা দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সেসব বিবেচনা মোটেই আমলে নেয়া হচ্ছে না। আওয়ামী লীগের ভারতপ্রীতি আজ সব চক্ষুলজ্জার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সীমা অতিক্রম করে যেন নিঃশর্ত ভারতবশ্যতায় পর্যবসিত হয়েছে। এই একদেশমুখী প্রবণতার ফলে সারা বিশ্বের সঙ্গে সমমর্যাদার ভিত্তিতে ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি যা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চালু করে গিয়েছিলেন, তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়া সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক বর্তমানে বেশ নাজুক অবস্থা পার করছে বলে কূটনৈতিক পাড়ায় আলোচনা শুনতে পাই। চীনের সঙ্গেও নাকি চলছে টানাপড়েন। সৌদি আরবসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে ভালো যাচ্ছে না তা তো শ্রমবাজারে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা থেকেই প্রতীয়মান হয়।

আওয়ামী মহাজোটের মন্ত্রী মহোদয়রা দুর্নীতি, অদক্ষতা, বালখিল্যপনা ও ব্যর্থতায় এর মধ্যে দেশজুড়ে ব্যাপক নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছেন। অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের অর্থনীতি সামাল দিতে ব্যর্থতা আজ চারদিকে আলোচিত হচ্ছে এবং তার পদত্যাগের দাবি সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে খোদ আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেও উঠছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী মহোদয় নিজের মন্ত্রণালয়ে কোনোরকম সাফল্য দেখাতে না পারলেও তার এখতিয়ারবহির্ভূত নানা বিষয়ে বিতর্কিত সব মন্তব্য করে এবং নিজ পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রভাব খাটিয়ে শেয়ারবাজার থেকে ও বিদ্যুৎ খাত থেকে ব্যাপক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বর্তমান সরকারের সবচেয়ে নিন্দিত ও সমালোচিত মন্ত্রীদের একজন হিসেবে পরিগণিত। যোগাযোগমন্ত্রী মহোদয় তো বর্তমান সরকারের দুর্নীতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের বিরল কৃতিত্বের জন্য বাহবা পেতে পারেন! তার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাংকের তরফ থেকে পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে এবং তার অধীনে পদ্মা সেতু প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক থেকে কোন অর্থায়ন না করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও তার অধীনস্থ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাস্তাঘাট দীর্ঘদিন মেরামত না করায় তার বিরুদ্ধে সারা দেশে জনরোষ রয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ার সাফল্য যে নেতিবাচক তার প্রমাণ দেশের ক্রমাবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি, যা আগের এক অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটানোর পরেও তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে বরং দোষীদের প্রশ্রয় দেয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে। নৌ পরিবহনমন্ত্রী মহোদয় মন্ত্রী হওয়ার পরেও তার শ্রমিক রাজনীতির অতীত ছেড়ে আসতে পারেননি। সড়ক দুর্ঘটনায় নন্দিত চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ ও চিত্রগ্রাহক মিশুক মুনীর নিহত হওয়ার পর তিনি বেপরোয়া গাড়ি চালানোর দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়া গাড়ি চালকদের পক্ষাবলম্বন করে দেশজুড়ে নিন্দিত ও সমালোচিত হতে থাকেন। বিনা পরীক্ষায় সাতাশ হাজার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়ার সুপারিশ করে এবং

www.pathagar.com

ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কোন শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন নেই, শুধু কোনটা মানুষ আর কোনটা গরু বা ছাগল তা জানলেই চলবে ধরনের মন্তব্য করে ধিকৃত হন তিনি।

ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মহোদয় অতি সম্প্রতি তার এলাকার জনপ্রিয় পৌর মেয়র লোকমান হোসেন হত্যায় জড়িত বলে নিহতের পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ উঠেছে। মন্ত্রী মহোদয়ের ভাইকে আসামি করে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে হত্যা মামলাও এর মধ্যে দায়ের করা হয়েছে। সর্বশেষ চমকপ্রদ ঘটনা হল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যিনি একাধারে সরকারের প্রভাবশালী স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মহোদয় তাকে নিয়ে, হঠাৎ করেই তার পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়ে গত সপ্তাহে সারা দেশে। সব জাতীয় দৈনিকে এই পদত্যাগের খবর পরদিন গুরুত্বসহকারে গুজব হিসেবে প্রকাশিত হয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একে স্রেফ গুজব বলে অভিহিত করে উড়িয়ে দেয়া হলেও জনশ্রুতি রয়েছে যে, তার পদত্যাগপত্র এখনও প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা রয়েছে। আর উপদেষ্টা মহোদয়দের নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে তো স্বয়ং আওয়ামী নেতারাই ক্ষুব্ধ বলে জানা যায়। উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে সংসদে মুখ খুলতে দেখা গেছে সিনিয়র আওয়ামী নেতৃবৃন্দকে। শোনা যায় উপদেষ্টাদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি পদত্যাগপত্রও জমা দিয়ে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী বরাবর, আবার কেউবা নাকি অভিমান করে আমেরিকা চলে গিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

ক্ষমতাসীন দলের ভেতর গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে চলছে লুটপাটের প্রতিযোগিতা যার কারণে উপর থেকে নিচ তথা জাতীয় থেকে তৃণমূল পর্যায় সর্বত্র চলছে অন্তর্দ্বন্দ্ব আর কলহ। এসব কলহে বক্তৃতা-বিবৃতি শুধু নয় রামদা, তলোয়ারসহ দেশি অস্ত্রশস্ত্র এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েও ঝাঁপিয়ে পড়ছে একে অপরের ওপর, খুন জখম চলছে হরহামেশা। অতি সম্প্রতি পত্রিকার পাতায় দেখলাম, স্থানীয় সংসদ সদস্যের সঙ্গে বিরোধের জের ধরে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাহমুদকে গ্রেফতার করায় তার সমর্থকরা শহর জুড়ে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে। বেশ কিছুকাল আগে ঘটে যাওয়া ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন কর্তৃক তার রাজনৈতিক সহকর্মী ইব্রাহিমকে হত্যা করার ঘটনাটি বিচার না করেই ধামাচাপা দেয়া হয়েছে। শামীম ওসমানের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জে ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভীসহ সংসদ সদস্য সারাহ বেগম কবরীর দ্বন্দ্ব গণমাধ্যমে বারবার উঠে এসেছে। নরসিংদীর প্রয়াত মেয়র লোকমান হোসেনের সঙ্গে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মহোদয়ের দ্বন্দ্ব নিয়ে শোকাবহ আলোচনা তো এখনও মানুষের মুখে মুখে। চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে সংসদ সদস্য এম এ লতিফকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে ধরাশায়ী করার ঘটনা বেশ আগের হলেও ভুলে যাওয়ার মত নয়। কোথায় নেই ক্ষমতাসীন দলের ভেতরে এ ধরনের আন্তঃকলহ?

www.pathagar.com

গত এক-দেড় বছরে যে ক'টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এই সরকারের অধীনে তার মধ্যে সাম্প্রতিকতম হল নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচন। এই নির্বাচন নিয়ে ঘটনাবলী যেভাবে ঘটেছে তা আওয়ামী লীগের বিদ্যমান সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বকে প্রকাশ করে দিয়েছে প্রকটভাবে। নানা নাটকীয়তার মাধ্যমে একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলীয় সমর্থন দেয়া হলেও নারায়ণগঞ্জের জনগণ সরকারি দল সমর্থিত প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তার আগে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনেও জনগণ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং বিকল্প হিসেবে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীকে বেছে নিয়েছিল। জাতীয় সংসদের হবিগঞ্জ উপ-নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে বিএনপি প্রার্থী জয়লাভ করেছে। সারা দেশের পৌর নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির পরেও বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের জয়জয়কার ছিল লক্ষ্যণীয়। এই নির্বাচনগুলোর ফলাফল কিসের লক্ষণ? জনগণ কি তবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে?

সব মিলিয়ে সারাংশ দাঁড়াল এই যে, জনগণ সরে গেছে আওয়ামী লীগের পাশ থেকে। সাধারণ মানুষ ফুঁসছে ভেতরে ভেতরে এবং ন্যূনতম কোন সুযোগ পেলেই সরকারের ওপর অনাস্থা প্রকাশ করছে। ক্ষমতাসীন দলের ভেতরে চলছে হালুয়া-রুটি নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব, মারামারি আর খুনাখুনি। দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রয়েছেন মন্ত্রী-উপদেষ্টা ও সংসদ সদস্যরা। অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন খাতে চরম অচলাবস্থা যার কিছু কিছু বর্ণনা ওপরের কয়েকটি অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এই সরকার বন্ধুহীন হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি বিরোধীদলের চলমান রোডমার্চ কর্মসূচিতে ব্যাপক গণজোয়ার দেখা যাচ্ছে। এ সবকিছু দেখেশুনে মনে হওয়া স্বাভাবিক, সরকারের ভিত আসলেই নড়ে গেছে। একটুখানি ধাক্কা দিলেই হয়ত বিদায় নিতে বাধ্য হবে এই দেশবিরোধী ফ্যাসিস্ট সরকার। সেক্ষেত্রে মোক্ষম ধাক্কাটা কখন দেবেন, আর কীভাবেইবা দেবেন তার যথোপযুক্ত কৌশল ও দিনক্ষণ নিশ্চয় অনেক বুঝেশুনে নির্ধারণ করবেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। মহান স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, কষ্টার্জিত গণতন্ত্র ও সর্বোপরি দেশের মানুষকে রক্ষায় তিনিই যে শেষ আশ্রয়স্থল!

দৈনিক আমার দেশ-এ ২২ নভেম্বর ২০১১ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

অগ্রজপ্রতিম মাহমুদুর রহমান অকুতোভয় এক সম্পাদক

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত জাতীয় দৈনিকের আলোচিত সম্পাদকের নাম উচ্চারণ করতে গেলে এ মুহূর্তে মাহমুদুর রহমানের নামই উঠে আসবে। যারা তাকে পছন্দ করেন তারা তো বটেই, যারা তাকে বিশেষ অপছন্দ করেন, তারাও এ বিষয়ে একমত হবেন বলেই বিশ্বাস করি। জরুরি সরকারের সময়ের দমবন্ধ অবস্থায় কলাম লেখালেখির মাধ্যমে সংবাদপত্র জগতের সঙ্গে ধীরে ধীরে জড়িয়ে যাওয়ার সময় তিনি হয়ত ঘূণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি যে, তাকেই একদিন আল্লাহর ইচ্ছায় একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে হতে পারে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকাটি ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির পর সংকটে নিপতিত হয়, অগ্নিকাণ্ডে পত্রিকাটির মূল কার্যালয় পুড়ে যায়, সে সময়কার মালিকেরা জরুরি সরকারের রোষানলে পড়ে কারাবরণ করেন। মালিকদের অনুপস্থিতিতে বিশিষ্ট সাংবাদিক আতাউস সামাদের অভিভাবকত্বে সাংবাদিক-কর্মচারীরা কমিটি করে পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত রাখেন। সে সময়ের মালিকদের অনুরোধে সাংবাদিক-কর্মচারীরা নতুন মালিক খোঁজার প্রক্রিয়ায় মাহমুদুর রহমানকে পত্রিকাটির মালিকানা তথা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করেন। প্রথমে আর্থিক বিষয়, ব্যস্ততাসহ নানারকম অসুবিধার কথা বিবেচনা করে মাহমুদুর রহমান আমার দেশ-এর মালিকানা গ্রহণের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেও পরবর্তী সময়ে সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাংবাদিক আতাউস সামাদের বিশেষ অনুরোধে তিনি কয়েকজন সমমনাকে সঙ্গে নিয়ে পত্রিকাটির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে সম্মত হন।

আমার মনে আছে, ২০০৮ সালের জুলাই মাসের কোন একদিন (সঠিক তারিখটি এ মুহূর্তে মনে নেই) তিনি আমাকে টেলিফোন করে পরদিন তার উত্তরা অফিসে দেখা করার জন্য বলেন। সে অনুযায়ী পরদিন তার অফিসে গেলে তিনি দৈনিক আমার দেশ-এর মালিকানা গ্রহণের ব্যাপারে তার সহযাত্রী হতে আমার আগ্রহ ও সামর্থ্য আছে কি না জানতে চান। আমি তাৎক্ষণিক আমার সম্মতি জানিয়ে দিই এবং তখনই কথা প্রসঙ্গে তাকে পত্রিকাটির মালিকানার পাশাপাশি সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণেরও পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে আমাকে বলেন যে, নতুন মালিক হিসেবে আমাদের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত পত্রিকাটির আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আলোচনার শীর্ষে থাকবে দৈনিক আমার দেশ। সেদিকেই তিনি এগিয়ে নিচ্ছিলেন দৈনিক আমার দেশ পত্রিকাটিকে তার সম্পাদনায়, আলোচনার শীর্ষে।

সম্পাদকীয় নীতিমালা হিসেবে তিনি খুব সংক্ষেপে সবাইকে বলে দিয়েছিলেন সাহসী ও দায়িত্বশীল হতে হবে। দেশ, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে। সরকার বা এস্টাবলিশমেন্ট বিরোধী কিন্তু কোন নির্দিষ্ট দলের মুখপত্র নয়। যে কোন অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ব্যাপারে তার বক্তব্য ছিল যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ সাপেক্ষে সাহসী প্রতিবেদন চাই, যাতে করে যার বিরুদ্ধে রিপোর্ট হবে তারও যেন প্রতিবাদলিপি পাঠাতে গিয়ে নৈতিকভাবে সংকোচবোধ হয়। দুর্নীতিবাজ ও দুর্বৃত্তদের ক্ষেত্রে আপসহীন। কোন প্রতিবেদন যদি সত্যি হয়, তবে তা যার বিরুদ্ধেই যাক না কেন ছাপানোর ব্যাপারে তার কোন পক্ষপাত থাকবে না। সর্বোপরি যদি তা দেশ ও জনগণের পক্ষে যায়, তবে তা অবশ্যই ছাপাতে হবে। এই সংকল্পবদ্ধ সম্পাদকীয় নীতিমালা বজায় রাখতে গিয়ে তিনি সরকার, বিরোধী দল, বিজ্ঞাপনদাতাসহ অনেকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, কিন্তু একচুলও পিছু হটেননি তার নীতি থেকে । তার সম্পাদনায় দৈনিক আমার দেশ একের পর এক সাহসী অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপিয়ে গেছে দেশ ও জনগণের স্বার্থে। তার বিশ্বাস সংবাদপত্রের দায়বদ্ধতা রয়েছে কেবল দেশ ও জনগণের প্রতি। জাতীয় স্বার্থকে সুরক্ষা করতে দৈনিক আমার দেশ অগ্রণী ও আপসহীন ভূমিকা পালন করবে—এই হচ্ছে তার সম্পাদকীয় নীতিমালার মূল কথা।

সরকারের নীতি ও কর্মকাণ্ডের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন যেমন ছাপিয়েছেন একের পর এক, তেমনি সমান গুরুত্ব সহকারে বিরোধী দলের চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ-দুর্বৃত্তদের অপকর্মকে তুলে ধরতেও কার্পণ্য করেননি। এ বিষয়ে সামাজিক অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করতে দেখেছি নির্বিকার সংকল্পবদ্ধভাবে। খুবই স্পর্শকাতর বৃহৎ বিজ্ঞাপনদাতাদের অনিয়ম-অনাচারও তথ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে একের পর এক লিড নিউজ করেছেন। আমি যেহেতু বিজ্ঞাপন বিভাগের দায়িত্বে আছি, বিজ্ঞাপনদাতাদের অনুরোধ-উপরোধ এমনকি হুমকি-ধামকি তাকে জানাতে গেলে তিনি ধীরস্থিরভাবে বলে দিয়েছেন—আমার দেশ সব সময় দেশ ও জনগণের পক্ষে অবস্থান নেবে, কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক স্বার্থে কোন বৃহৎ বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে অবস্থান নেবে না।

বিজ্ঞাপন বিভাগ যেন সম্পাদকীয় নীতিমালাকে প্রভাবিত করার কোন চেষ্টা না করে, সে ব্যাপারে আমাকে কয়েকবার সতর্ক করে দিয়েছেন। গুলশানে লেক ভরাট করে জমি দখল নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে গিয়ে আমাদের রিপোর্টার যখন নামকরা বড় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ধমক খেয়ে ঘাবড়ে যায়, তখন তিনি তাকে সাহস দিয়েছেন। সেই ব্যবসায়ী আবার বিরোধী দলের সাবেক সংসদ সদস্য হিসেবে সহানুভূতি পাওয়ার আশায় অনুরোধ করেছেন যেন তার বিরুদ্ধে যায় এমন

www.pathagar.com

প্রতিবেদন বন্ধ করা হয়। কিন্তু তথ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে সেই প্রতিবেদন আমার দেশে ছাপানো হয়েছে। ব্যাংকিং সেক্টরের গুরুতর অনিয়ম নিয়ে দৈনিক আমার দেশ-এ ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি কেস স্টাডি ছাপানো হয়েছিল। সে সময়ে আমি অনুরুদ্ধ হয়ে কয়েকটি প্রতিবেদন থামানোর চেষ্টা করেছিলাম, কারণ এই সেক্টর থেকে পত্রিকায় উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপন আয় আসে। কিন্তু তিনি আপস করেননি। দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, ব্যাংকের মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যদি জনগণের আমানত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, সেক্ষেত্রে তা তুলে ধরা আমার দেশ-এর নৈতিক দায়িত্ব ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার অংশ।

এর মাধ্যমে জনগণের আমানত রক্ষা পাবে, এমনকি সার্বিকভাবে হয়ত ব্যাংকটিও বেঁচে যাবে কয়েকজন অসৎ মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার অশুভ খপ্পর থেকে। তার এই আপসহীন মনোভাবের কারণে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞাপনদাতা বিভিন্ন সময়ে মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন, সাময়িকভাবে আমাদের বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত করেছেন, কেউ কেউ আমার মুখ দেখাও বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অবিচল। তিনি বলতেন, শুধু শর্ট টার্ম গেইন দেখলে হবে না, সার্বিকভাবে দেশের স্বার্থে কাজ করে গেলে লং টার্মে গেইনার হতে পারবে।

আজ এই আপসহীন সম্পাদক যখন তার দেশপ্রেম ও সাহসী সম্পাদকীয় নীতিমালার জন্য কারান্তরালে, তখন আরও বেশি বেশি করে মনে পড়ে নানা সময়ে তার নীতি-নির্ধারণী সাহসী সিদ্ধান্তগুলোকে। শর্ট টার্ম গেইন যিনি কখনও বড় করে দেখেননি, তিনি নিশ্চয়ই তার এই সময়কার শর্ট টার্ম পেইনকে মেনে নিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে এই শর্ট টার্ম পেইন সহ্য করে লং টার্মে দেশ ও জাতির স্বার্থে আরও যথাযথ ভূমিকা রাখার শক্তি ও সাহস জোগাবেন এই দোয়া করি কায়মনোবাক্যে।

তিনি যখন কারান্তরালে সরকার ও রাষ্ট্রের নিপীড়ন নির্যাতনের মাঝে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার আপসহীন সংগ্রামে, তখন কেউ কেউ আজ এই প্রশ্নও তুলেছেন মাহমুদুর রহমান একটি প্রতিষ্ঠিত জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক হওয়ার জন্য উপযুক্ত কি না? এই প্রশ্ন তোলা কয়েকজনের মধ্যে আবার দৈনিক আমার দেশ-এর সাবেক সম্পাদক আমানুল্লাহ কবীরও রয়েছেন। আমানুল্লাহ কবীরের মত একজন সিনিয়র সাংবাদিকের এহেন ভূমিকা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। বিশেষ করে এ জন্য যে, তিনি নিজেই এক সময় দৈনিক আমার দেশ-এর সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দৈনিক আমার দেশ তথা এর বর্তমান সম্পাদকের এই দুঃসময়ে আমানুল্লাহ কবীর সাহেবের নেতিবাচক বক্তব্য প্রদান ও রহস্যজনক ভূমিকা আমার দেশ পরিবারের সবাইকে গভীরভাবে আহত করেছে।

অথচ তারই বিপরীতে দৈনিক আমার দেশ-এর আরেকজন ভূতপূর্ব সম্পাদক সর্বজনশ্রদ্ধেয় আতাউস সামাদের অভিভাবকসুলভ ভূমিকা আমাদের আপ্লুত

www.pathagar.com

করেছে। সব সাংবাদিক-কর্মচারীর মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য নিয়মিত খোঁজখবর রাখাসহ সহানুভূতি প্রদর্শন করে এই কঠিন সময়ে তিনি আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছেন। যেদিন হাইকোর্টের রায়ে আমার দেশ পুনঃপ্রকাশ হবে বলে আমরা সবাই বিকাল সন্ধ্যায় সদলবলে অফিসে গিয়ে হাজির হয়েছি, সেদিনই সন্ধ্যার পরে হঠাৎ করে দেখলাম আমাদের উপ-সম্পাদক সৈয়দ আবদাল আহমদ কারোর সঙ্গে মোবাইলে কথা বলতে বলতে যেন কাঁদছেন। আমি পাশে গিয়ে কী ব্যাপার জানতে চাইলে মোবাইলটি হাত দিয়ে ঢেকে মৃদুস্বরে বললেন, অন্যপ্রান্তে সামাদ ভাই কাঁদছেন। তিনি বলছেন যে মাহমুদুর রহমানকে আমার দেশের দায়িত্বে এনে এই বিপদে ফেলেছেন বলে তাঁর অপরাধবোধ হচ্ছে। আমি বাকশূন্য হয়ে বসে রইলাম। এই সহমর্মিতা ও মানবিক গুণাবলীর মূল্য কী দিয়ে পরিমাপ করা যায়, আমার জানা নেই।

নির্জলা খাঁটি দেশপ্রেম একজন মানুষকে কতটা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ করে তুলতে পারে, তা মাহমুদুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে না এলে বোঝার সামর্থ্য হয়ত আমার হত না। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের ছোবল থেকে দেশের জনগণ ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সুরক্ষা, দেশজুড়ে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ইত্যাকার বিষয়ে তার দুশ্চিন্তা ছিল সার্বক্ষণিক ও অকৃত্রিম। দৈনিক আমার দেশ-এর সম্পাদক হিসেবে তিনি এসব বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলে দেশসেবার ব্রত নিয়েছিলেন। এই পথ যে কণ্টকাকীর্ণ তা তিনি জানতেন এবং প্রায়ই আমাকে বলতেন যে, এর জন্য তাকে কারাবরণসহ নানাবিধ নির্যাতন নিপীড়ন সইতে হতে পারে, এমনকি প্রাণও হারাতে হতে পারে। এমন নানাবিধ শঙ্কাও তাকে কখনও বিচলিত করেনি, তার লক্ষ্য থেকে তাকে চ্যুত করতে পারেনি। অনেকবারই আমাকে তিনি বলেছেন যে, তার কোন পিছুটান নেই, অতএব দেশের স্বার্থে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে তিনি পিছ পা হবেন না কখনোই।

একজন জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকের উপযুক্ততা নিয়ে কথা উঠলে প্রথমেই তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, লেখালেখি করার অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, প্রখর নিউজ সেন্স, চিন্তার গভীরতা প্রভৃতি বিবেচ্য বিষয় হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর উপরেও সম্পাদক মহোদয়ের চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলী, নৈতিক মনোবল, দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি অঙ্গীকার ইত্যাদি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয় বলে প্রাজ্ঞজনদের কাছে শুনেছি। মাহমুদুর রহমান সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, আমরা সবাই জানি। বুয়েটের মেধাবী ছাত্র হিসেবে প্রথমত কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পরবর্তী সময়ে সিরামিকের ওপর জাপান থেকে উচ্চতর ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন, তৎপরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী আইবিএ থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। অতএব শিক্ষাগত যোগ্যতায় তাকে উপযুক্ত বলে মেনে নেয়া ছাড়া কোন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিকল্প নেই বলেই মনে করি। কর্মদক্ষতা প্রসঙ্গে তার সুনাম পরম শত্রুও একবাক্যে স্বীকার করে নেবেন। দীর্ঘ ৩১ বছরের কর্মজীবনে তিনি বেসরকারি খাতের নানা নামী প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দায়িত্বশীল উচ্চপদে কর্মরত থেকে দেশের সেরা প্রধান নির্বাহীদের মধ্যে অন্যতম বলে পরিগণিত হয়েছেন।

২০০১ সাল থেকে এক নাগাড়ে পাঁচ বছর বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দলমত নির্বিশেষে দেশের আপামর ব্যবসায়ী সমাজের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। আর জ্বালানি উপদেষ্টা হিসেবে তার ১৬ মাসের কার্যক্রম সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার অনন্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত। অতএব কর্মদক্ষতা বিষয়েও তাকে পাস মার্ক দেয়ার কোন বিকল্প নেই। গণমাধ্যমে লেখালেখি করার অভিজ্ঞতা তার জন্য নতুন হলেও ১১ জানুয়ারির পর থেকে অব্যাহত কলাম লেখার মাধ্যমে তিনি নিজস্ব একটি স্টাইল সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। স্পষ্টভাষী, যুক্তিগ্রাহ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ লেখা তাকে দ্রুত জনপ্রিয় করে তোলে পাঠকদের মাঝে। তার লেখালেখির দক্ষতা নিয়ে তাই প্রশ্ন তোলা অবান্তর। এবার আসি বিশ্লেষণী ক্ষমতার বিষয়ে। যে কোন পরিস্থিতি ও বিষয়কে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করার অসাধারণ প্রতিভা মাহমুদুর রহমানের রয়েছে।

এ বিষয়ে যারা তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে ছিলেন বিভিন্ন সময়ে তারা তো বটেই, এমনকি যারা তার লেখার নিয়মিত পাঠক বা বিভিন্ন টক-শোর দর্শকশ্রোতা তারাও রীতিমত উচ্চকণ্ঠ। আর চিন্তার গভীরতা-ব্যাপকতায় তার তুল্য ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে কমই আছেন। নানা বিষয়ে নিবিড় জ্ঞানার্জন ও ধারাবাহিকভাবে সিরিয়াস পড়াশোনা করে নিজেকে হালনাগাদ রাখার ব্যাপারে সব সময় তাকে সক্রিয় দেখেছি। সংবিধান, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি, ইতিহাস, ইসলাম, বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ইত্যাকার সব বিষয়েই এই ব্যক্তিত্বকে প্রতিনিয়ত জানার আগ্রহে পিপাসার্ত দেখেছি। তাই তার চিন্তার গভীরতা ও ব্যাপকতা নিয়েও আশা করি প্রশ্ন থাকে না। অন্যান্য চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলীর দিক দিয়েও তার সমকক্ষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সম্পাদক আজ বিরল বলেই আমার কাছে প্রতীয়মান হয়। অতএব যারা সম্পাদক হিসেবে তার উপযুক্ততা নিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আজ প্রশ্ন তুলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছেন তাদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাব, দয়া করে এই নোংরা খেলা থেকে বিরত হোন। অন্যথায় এর ফল অদৃষ্টের পরিহাসে কারও কারও নিজের জন্যই বুমেরাং হয়ে দেখা দিতে পারে অদূর ভবিষ্যতে।

এ প্রসঙ্গে আমি দৈনিক আমার দেশ-এর উপ-সম্পাদক সৈয়দ আবদাল আহমদের সঙ্গে একমত যে, মায়ের পেট থেকে কেউ পেশাদার যোগ্য সম্পাদক হয়ে জন্মায় না। সময়ের প্রয়োজনে বিশেষ পরিস্থিতিতে কেউ কেউ অসাধারণ সম্পাদক হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন বা জন্ম নিতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে অবজারভার সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুস সালামের নাম প্রাসঙ্গিকভাবে আসতে পারে যিনি

www.pathagar.com

সরকারি চাকরি ছেড়ে হঠাৎ করে এসে সম্পাদক হয়েছিলেন। তার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি জাতীয় প্রেসক্লাবে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেখানে বিদগ্ধ সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই আবদুস সালামের সফল সংগ্রামী সম্পাদক জীবনের সঙ্গে কারান্তরীণ মাহমুদুর রহমানের সম্পাদক জীবনের বিশেষ রকম সাদৃশ্য রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

আমিও তাদের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত পোষণ করি। মাহমুদুর রহমান তার অতীত পেশাগুলোতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ঈর্ষণীয় সাফল্যের পর নেতৃস্থানীয় একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক হিসেবেও সফল হয়েছেন। বন্ধ হতে যাওয়া জাতীয় দৈনিকটিকে তিনি ঘুরে দাঁড় করিয়েছেন, নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদনা করে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করেছেন এবং সর্বোপরি তার স্বপ্ন মোতাবেক সেই পত্রিকাটিকেই আজ আলোচনার শীর্ষে তুলে এনেছেন। আমার দেশ আবার পাঠকের হাতে পৌঁছতে শুরু করেছে এবং এরই মধ্যে সারা দেশে পত্রিকাটি ক্রমবর্ধমান পাঠকপ্রিয়তা লাভ করছে। গায়ের জোরে পত্রিকাটি হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়ার মুহূর্তে যে প্রচার সংখ্যা ছিল, তা অতি শিগগিরই অতিক্রম করে যাবে বলে মনে হচ্ছে। এমতাবস্থায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার স্বার্থে কারান্তরীণ মাহমুদুর রহমানকে মুক্ত করে আনা খুবই জরুরি বিষয় । আইনি প্রক্রিয়ায় আমাদের সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, কিন্তু পাশাপাশি বর্তমান সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হলে তা হবে সবার জন্যই মঙ্গলকর। ভিন্নমত দমন না করে ভিন্নমত লালন করার মধ্যেই একটি গণতান্ত্রিক সমাজের অনন্য সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। প্রিয় সম্পাদক অগ্রজতুল্য মাহমুদুর রহমান অতি শিগগিরই মুক্ত হয়ে এসে স্বাধীনভাবে তার প্রিয় আমার দেশ সম্পাদনা করবেন এবং দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে আরো বলিষ্ঠ অবদান রাখবেন—এই প্রত্যাশা করি। এ ব্যাপারে সব ভেদাভেদ ভুলে দলমত নির্বিশেষে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যথোপযুক্ত ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই।

দৈনিক আমার দেশ-এ ১০ আগস্ট ২০১১ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

স্কুল পালানো রুমকি ও তার বাবার কষ্ট

ফুটফুটে মেয়ে রুমকি সেদিন জীবনে প্রথমবারের মত স্কুল থেকে পালাল। শিশু মনের অভিমান আর রোমান্টিকতায় ভেসে স্কুল শেষে নির্ধারিত স্কুল ভ্যানে না চড়ে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে চুপিচুপি পা বাড়াল। নামি সাউথপয়েন্ট স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে ছোট্ট মেয়ে রুমকি। বড়সড় কোন অঘটন ঘটার আগেই আল্লাহর অশেষ রহমতে মিষ্টি মেয়েটির মোলাকাত হয়ে যায় আমার স্ত্রী শিউলীর সঙ্গে নাটকীয়ভাবে। নিকেতনে আমাদের নির্মাণাধীন বাড়ির তদারকির কাজে শিউলী দৈনন্দিন ব্যস্ত থাকে আর আমিও মাঝেসাঝে খোঁজখবর নিতে সেখানে যাই। সেদিনও দৈবক্রমে প্রায় সমাপ্ত বাড়ির নিচতলায় পৌঁছে রুমকিকে দেখতে পাই আমার স্ত্রীর পাশে বসে গল্পসল্প করতে। সেখান থেকেই এই অম্লমধুর জীবনঘনিষ্ঠ গল্পের শুরু।

রুমকিরা দুই বোন আর এক ভাই। রুমকি সবার বড়। তার পরই তার ভাইটি, যে সাউথপয়েন্ট স্কুলেরই আরেক দূরবর্তী শাখায় পড়ে। সবার ছোট আরও একটি আদরের বোন, যার বয়স মাত্র ১০ মাস। সব মিলিয়ে পাঁচজনের সংসার রুমকিদের। ছোট ভাইটি তাকে খুব একটা মান্য করে না বরং মাঝেসাঝে বে-আদবি করে চিমটি খামচি দিয়ে থাকে। বাবা রাগ করে কথা বলে রুমকির সঙ্গে। আর মায়ের নজর এবং ব্যস্ততা মূলত সবার ছোট বোনটির দিকে। রুমকির খুবই অসহায় লাগে আর শিশুসুলভ অভিমান জমাট বেঁধে ওঠে ছোট্ট বুকটার ভেতর। রুমকির সন্দেহ এখন আর ওরা কেউ তাকে ভালোবাসে না। সন্দেহটুকু যে অমূলক নয় তা আজ সকালেই প্রমাণ হয়ে গেছে বলে তার ধারণা—যখন তার বাবা স্কুলে আসার আগে তাকে বকাঝকা করেছে। আর মুখে মুখে তর্ক করার অপরাধে নরম ছোট্ট গালে একটা মৃদু চড়ও দিয়েছে। মা তখন বাবার ওপর রেগে গিয়ে রুমকিকে বলেছে, 'হারিয়ে যেতে পারিস না যেদিকে চোখ যায়? তাহলে তো কিছুটা হলেও শান্তি পেতি!'

রুমকির খুব কান্না পেয়েছে তখন, কাঁদতে কাঁদতে স্কুল ভ্যানে চড়ে স্কুলে এসেছে এবং তখনই ভেবে ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে আর ওই বাড়িতে ফিরে যাবে না। হারিয়ে যাবে আজ যেদিকে চোখ যায়, মা যখন বলেছে তখন সে তাই করবে। স্কুলে এসে সে তার ঘনিষ্ঠ তিন বান্ধবীকে ফিসফিস করে বলেছে আজ তার যেদিকে চোখ যায় সেদিকে হারিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা। বান্ধবীদের মধ্যে একজন আবার ক্লাসটিচার মিসকে জানিয়ে দিয়েছে রুমকির ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা। ক্লাসটিচার

www.pathagar.com

রুমকিকে ডেকে ভালোমতই বুঝিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু রুমকির মনে হারিয়ে যাওয়ার সংকল্প অটুট থেকে গেছে। স্কুল শেষে পরিকল্পনা মোতাবেক স্কুলভ্যানে না চড়ে হারিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রুমকি যখন সরে যেতে লাগল তখন তার পিছু নিল তিন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। তারা তাদের প্রিয় বান্ধবীকে হারিয়ে যেতে দেবে না।

রুমকি তাদের অনেক করে বোঝাল যে তাকে বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। সে আজ হারাবেই। বান্ধবীরা বলল, তারা হল সিআইডি, তারা কিছুতেই তার পিছু ছাড়বে না, তাকে হারিয়ে যেতে দেবে না। রুমকি তাদের বলল, 'যেখানে রক্তের সম্পর্কের মানুষ বলেছে হারিয়ে যেতে, সেখানে তোমরা তো শুধু আমার বান্ধবী, তোমরা আমাকে আটকাতে পারবে না।' তারপর কিছুক্ষণ এদিক সেদিক লুকোচুরি খেলা শেষে বান্ধবীরা নিজ নিজ স্কুল ভ্যানে ফিরে যেতে বাধ্য হলে রুমকি তার পরিকল্পনা মোতাবেক হারিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

স্কুল ইউনিফর্ম পরা কাঁধে স্কুলব্যাগ ঝোলানো একটি ছোট মেয়ে ভরদুপুরে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটছে। সে আজ হারিয়ে গেছে। চলে যাবে যেদিকে চোখ যায় তার মায়ের মুখ ফস্কে বলে ফেলা কথামত। পথচারী কারোর মনেও একাকী রুমকিকে দেখে কোন সন্দেহ তৈরি না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ এ সময়টায় বাচ্চারা স্কুল থেকে ফেরে। ঘণ্টাখানেক উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরি শেষে রুমকির কিছুটা ক্ষুধা ও ক্লান্তিবোধ হলে সে এবার একটি বিকল্প আশ্রয় খোঁজার পরিকল্পনা করে। দুটো বাড়িতে কড়া নেড়ে প্রবেশ করে এবং নাটকীয়ভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আশ্রয়ের বিনিময়ে বাড়ির সব কাজ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয় সে। কিন্তু তার সচ্ছল বেশভূষা আর চেহারা দেখে দুই বাড়ির গৃহকর্ত্রীই অনাহুত ঝামেলা এড়ানোর মানসে তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বলে দরজা বন্ধ করে দেন।

আশ্রয় প্রার্থনা নির্বিকারভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর রুমকির মনে কিছুটা নিরাপত্তাহীনতা ও অসহায়ত্ব জেগে ওঠে। সঙ্গে ক্ষুধা আর ক্লান্তি তো আছেই। কাঁদো কাঁদো অবস্থায় সে মরিয়া হয়ে একজন নির্ভরযোগ্য আশ্রয়দাতা বা দাত্রীর সন্ধানে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকে। সে মুহূর্তে সীমানা দেয়াল নির্মাণ কাজের তদারকিতে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো আমার স্ত্রী শিউলীর সাক্ষাৎ পায় রুমকি। আশপাশে ঘুরঘুর করছিল সে আর বারবার শিউলীর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল যেন কিছু বলতে চায়। শিউলী হঠাৎ করেই খেয়াল করল রুমকিকে এবং জিজ্ঞেস করল 'কি মা, তোমার নাম কী? তুমি এখানে কী করছ? যাও, বাসায় যাও।'

নিরাপদ আশ্রয়সন্ধানী ক্লান্ত-শ্রান্ত শিশুটি এবার একটু আদুরে গলা শুনে একেবারে ভেঙে পড়ল এবং ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, "আমার নাম রুমকি। আমাকে আপনার বাসায় থাকতে দেবেন? আমি আপনার সব কাজ করে দেব। কাপড় ধোয়া, বাসন মাজা, ঘর মোছা—সব কাজ করে দেব, আন্টি!" শিউলীর এবার মাতৃসম দায়িত্ব নেয়ার পালা। সে ছুটে গেল ক্রন্দনরত

www.pathagar.com

রুমকির দিকে, জড়িয়ে ধরল আদর করে, টেনে এনে বসাল নির্মাণাধীন বাড়ির নিচতলায় পাতা সাইট চেয়ারগুলোর একটিতে। স্কুল ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখল সাইট টেবিলের ওপর। মাথায় হাত বুলিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আশ্বস্ত করল এবং বলল, 'আমি তোমাকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাব মা। তুমি আর কেঁদো না।' বিকেল বাজে তখন ৩টা। রুমকির চোখমুখ দেখেই শিউলী বুঝতে পারে যে শিশুটি ক্ষুধার্ত। সাইটের কেয়ারটেকার সহিরুদ্দিন মিয়াকে দিয়ে ত্বরিতগতিতে জুস আর বিস্কিট আনিয়ে খেতে দেয়। বিস্কিট আর জুস খেতে খেতে রুমকি একটু একটু করে মুখ খোলে। বর্ণনা করতে থাকে তার অবোধ মনে জমে থাকা শিশুসুলভ সব দুঃখ, কষ্ট আর আপনজনদের প্রতি তার গভীর অভিমানের কথা।

গল্প চলতে চলতেই রুমকি জিজ্ঞেস করল শিউলীকে, 'আচ্ছা আন্টি, তুমি যে আমাকে তোমাদের বাসায় নিয়ে যাবে, তোমার হাজব্যান্ড মেনে নেবে তো?' নিয়মিত টেলিভিশনে বাংলা নাটক আর হিন্দি সিরিয়াল দেখার প্রভাবে তার সব কথাতেই নাটুকে সংলাপের ছাপ ছিল লক্ষণীয়। শিউলী হেসে জবাব দিল, 'আমার হাজব্যান্ড অবশ্যই মেনে নেবে এবং তোমাকে দেখে খুবই খুশি হবে।' কাকতালীয়ভাবে সে কথোপকথন চলাকালীনই আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছাই এবং রুমকিকে দেখে প্রথমে ভাবি পাশের বাড়ির কোন মেয়ে বুঝি, যার সঙ্গে শিউলীর সদ্য ভাব জমেছে। ঘটনার কোন আগপিছ না জেনেই সৌজন্যের খাতিরে আদর করে বলি 'এই রাজকন্যাটার নাম কী? তাকে আজ আমাদের বাসায় নিয়ে চল তো।'

সঙ্গে সঙ্গে রুমকিকে ফিক করে হেসে ফেলতে দেখি আর শিউলীকে বলতে শুনি 'দেখেছ আমার হাজব্যান্ড তোমাকে মেনে নেবে কিনা?' জুসে চুমুক দিতে দিতে রুমকি হাত মুখ নেড়ে নেড়ে সারা দিনের সব ঘটনা আর তার পরিবারের গল্প শোনায়। কী তার উচ্চারণ, মুখভঙ্গি আর শব্দচয়ন! আমরা স্বামী-স্ত্রী অভিভূত হয়ে শুনি আর তাকে ফাঁকে ফাঁকে বোঝাতে থাকি। কথা বলার মাঝেই শিউলী রুমকির স্কুল ব্যাগ খুলে তার ডায়েরিটা হাতে নেয়। বুদ্ধিমতী মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে 'তুমি কি আমার বাবার ফোন নম্বর খুঁজছ?' শিউলী জবাব দেয় 'হ্যাঁ, খুঁজছি। কিন্তু তুমি না বললে আমরা তোমার বাবাকে ফোন দেব না।'

সে অনুমতি দেয় ঠিকই, কিন্তু শর্ত দেয় যে সে তার বাবার সঙ্গে বাসায় যাবে না, আমাদের বাসায় যাবে, আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমি তাকে আশ্বস্ত করি এই বলে যে, বাবাকে জানিয়ে ওকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাব। না হলে বাবা ওকে খুঁজে না পেয়ে অনেক কান্না করবে। শিউলী যখন রুমকির বাবাকে ফোন দিচ্ছে তখন আমি রুমকির সঙ্গে মজার মজার গল্পে মত্ত। সে আমার কাছে জানতে চাইল আমার ছেলে কত বড়, তার নাম কী, কোন ক্লাসে পড়ে, তাকে মেনে নেবে কিনা ইত্যাদি। আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম এই বলে যে আমার একমাত্র ছেলের কোন বোন নেই। তাই রুমকিকে পেয়ে আমাদের ছেলে খুব আনন্দ পাবে, খেলতে পারবে, মজা করতে

www.pathagar.com

পারবে। উচ্ছ্বসিত রুমকি এবার আমাকে অনুরোধ করে 'আঙ্কেল, আমার বাবাকে এখানে আসতে বলবে না, শুধু ফোনে জানিয়ে দাও। সে এলে কিছুতেই আমাকে তোমাদের বাসায় যেতে দেবে না।' আমি আশ্বস্ত করে বলি, ওর বাবা এখানে এলেও তাকে বুঝিয়েই ওকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাব। শিউলী ফোন শেষ করে এসে জানায় রুমকির বাবা যত দ্রুত সম্ভব আসছেন। তিনি বিনীত অনুরাধ করেছেন যেন উনি আসা পর্যন্ত আমরা তার মেয়েকে হেফাজতে রাখি। গল্পের মধুর পর্ব এখানেই শেষ। অম্ল পর্ব এখন শুরু হতে যাচ্ছে।

ততক্ষণে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এর মধ্যে একটি রিকশা এসে থামল আমাদের গেটের সামনে। রিকশা থেকে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলেন একজন উদ্বিগ্ন বাবা। হ্যাংলা পাতলা গড়ন, মাথায় চুল কম, কিন্তু টাক মাথা হয়নি এখনও, শার্ট-প্যান্ট-জুতো পরা, হাতে একটা বাদামি রঙের ইনভেলাপ। এসে পরিচয় দিলেন তিনিই রুমকির বাবা। পরিচয়ের দরকার ছিল না। তার উপস্থিতি মাত্র রুমকির মুখে ভীতি ও অস্বস্তির ছাপ দেখে আমরা তার পরিচয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গত কারণেই তিনি মেয়েকে উপর্যুপরি জেরা করা শুরু করলেন ধমকের সুরে—"তুমি এখানে কেন? তোমার স্কুল ভ্যানে না গিয়ে এখানে এলে কী করে? জবাব দাও।"

রুমকির চোখজুড়ে ততক্ষণে অশ্রুর ঢল নেমেছে আর অসহায়ভাবে সে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে যেন অভিযুক্ত করছে ওকে এ অবস্থায় ফেলার জন্য। মারমুখী বাবাটিকে এবার আমি থামালাম কিছুটা জোর করেই। টেনে নিয়ে গেলাম দেয়ালের একেবারে শেষ মাথার কোনায়। উত্তেজিত বাবাকে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি সকালে মেয়েকে বকেছেন কিংবা মেরেছেন?' তিনি উত্তর করলেন, 'হ্যাঁ, মুখে মুখে তর্ক করেছিল বলে একটা চড় দিয়েছি।' আমি বললাম, 'ভাই, আপনি আপনার মেয়ের সঙ্গে একদম খারাপ ব্যবহার করবেন না। আপনার মেয়ে খুবই স্পর্শকাতর। সে আজ স্কুল পালিয়েছে, আপনি এখন ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে সে আবার পালাবে বা আরও ভয়ঙ্কর কিছু করে বসবে।' একদম চুপ মেরে গেলেন বাবাটি। অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে এবার রুমকির কাছে শোনা সারা দিনের ঘটনার বর্ণনা দিলাম। ভদ্রলোক এ পর্যায়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন আমাকে জড়িয়ে ধরে। কাঁদতে কাঁদতেই বলতে থাকলেন, 'ওরা আমাকে একবারেই বুঝতে চায় না ভাই। আমি কত কষ্ট করি ওদের জন্য। কিন্তু আমি আর পারি না।' ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকলেন ভদ্রলোক আমাকে জড়িয়ে ধরেই। সান্ত্বনা দিলাম একজন বাবার পিঠ চাপড়ে, কিন্তু ততক্ষণে নিজের চোখই ভিজে উঠেছে।

কিছুটা সামলে নিয়ে ভদ্রলোক যা বললেন অকপটে, তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, তিনি একজন দিশেহারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। চাকরি করেন ঢাকার পাশেরই একটি ইউনিয়ন পরিষদের সচিব হিসেবে। বেতন পান সর্বসাকুল্যে মাসে এগারো হাজার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

টাকা। মোটামুটি একটি বাসায় থাকেন, যার সব মিলিয়ে ভাড়া দিতে হয় বর্তমানে সাড়ে নয় হাজার টাকা। অফিস যাওয়া আসা বাবদ বেতনের অবশিষ্ট দেড় হাজার টাকা বা তারও বেশি খরচ হয়। সবার খাওয়ার খরচ, কাপড়চোপড়ের খরচ, চিকিৎসার খরচ, বাচ্চাদের সাধ-আহ্লাদ আর পড়াশোনার খরচ জোগাতে তিনি প্রতি মাসে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছেন। দুটো বাচ্চাকে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে পড়াতে তার মাসিক খরচ হয় গড়ে ১০ হাজার টাকা।

তার হিসাব মতে, সামাজিক মর্যাদা কোনোরকমে রক্ষা করে সংসার চালাতে সব মিলিয়ে তার প্রয়োজন কমপক্ষে তিরিশ হাজার টাকা। বেতনের এগারো হাজার টাকা বাদে বাকি উনিশ হাজার টাকা জোগাড় করতে উপরি আয়ের চেষ্টা করেন প্রতিনিয়ত যেমন করে হোক। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব হিসেবে উপরি রোজগারের সুযোগও নাকি তার যথেষ্ট নয়। অতএব তার মাথা থাকে সর্বক্ষণ গরম। রাতে ঘুমাতে পারেন না। স্ত্রীর সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই থাকে সব সময়। বাধ্য হয়ে একটা স্বল্প বেতনের টিউশনি করেন অফিসের পরে। তাও সংসারের হিসাব মেলে না কিছুতেই এই লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির বাজারে। যে বাসায় সর্বসাকুল্যে পাঁচ হাজার টাকা ভাড়ায় উঠেছিলেন তিন বছর আগে, সে বাসার ভাড়া এখন বেড়ে দ্বিগুণের কাছাকাছি। লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে শ্বশুরের খালি পড়ে থাকা একটা ফ্ল্যাটে ওঠার জন্য স্ত্রীকে চাপ দিয়ে যাচ্ছেন ছয় মাস যাবৎ।

যদি বাড়ি ভাড়াটা সাশ্রয় করা যায় তবে হয়ত একটু উপায় হয়। কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই নিজের বাবাকে এই দীনতার কথা বলে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ঝুঁকি নিতে চান না। প্রতিদিন যতটা শরীরে কুলায় ভদ্রলোক হেঁটেই যাতায়াত করেন আর দূরযাত্রায় পাবলিক বাস ব্যবহার করেন। নিজ খরচে দুপুরে কিছু খাওয়া বাদ দিয়েছেন দুই বছর হল, কেউ কিছু খাওয়ালে খান অন্যথা মোটামুটি উপোসই করেন। সবকিছু মিলিয়ে সৎ কিংবা অসৎ যে কোন উপায়ে হোক নিজের আয়কে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে তুলতে পারছেন না ভদ্রলোক কোনভাবেই। আবার সামাজিক মর্যাদার ভয়ে পারছেন না আরও কম ভাড়ার বাসায় যেতে কিংবা বাচ্চাদের কম খরচের সরকারি স্কুলে নিয়ে আসতে।

সজল চোখে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি এখন কী করব ভাই? উচ্চবিত্তের কোন অভাব নেই, খরচ যতই বাড়ুক তারা সামাল দিতে পারে। নিম্নবিত্তও তাদের মজুরি বাড়িয়ে নিয়েছে, দৈনিক ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা না হলে এখন দিনমজুর পাওয়া যায় না। আমার মত নিম্ন মধ্যবিত্তের উপায় কী?' সত্যিই তো, এই প্রশ্নের উত্তর কী? আরও বেতন বৃদ্ধি? আরও বিশাল ঘাটতি? আরও বেশি বেশি সরকারি ঋণ? দ্রব্যমূল্যের লাগাম টেনে নামানো? নাকি অন্য কিছু? আমার পরিষ্কার জানা নেই। বোদ্ধা অর্থনীতিবিদরা এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় তাদের চলতি বাজেট ভাবনায় এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবেন বলে আশা করেছিলাম।

www.pathagar.com

যুৎসই কোন উত্তর না পেয়ে সত্যি আশাহত হয়েছি রুমকির দিশেহারা বাবার মতই। এসব লুটেরা দেউলিয়াপনা চরিত্রের বাজেট দিয়ে কি রুমকির বাবাদের অসহনীয় কষ্টের লাঘব হবে?

অবিশেষজ্ঞ হয়েও বিজ্ঞের মত ভদ্রলোককে পরামর্শ দিলাম, 'ভাই, আপনার আয় অনুযায়ী সংসার খরচ ঠিক করুন। আর তো কোন উপায় দেখি না।' ক্রন্দনরত ভদ্রলোক ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'আমার মেয়ে আজ হারিয়ে যেতে চায়, স্ত্রী আমাকে ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দেয়। তার চেয়ে আমিই বরং হারিয়ে যাব। আমিই বরং আত্মহত্যা করব।' এমন কথা শুনে ভয় পেয়ে বোকার মতই ভদ্রলোককে প্রস্তাব দিলাম, 'ভাই আপনি প্রয়োজনে রুমকিকে আমাদের বাসায় রেখে যান। আমরা ওকে আমাদের নিজের মেয়ে মনে করে বড় করব। আপনার যখন ইচ্ছা এসে দেখে যাবেন। আপনার সমস্যা সমাধান হয়ে গেলে না হয় নিয়ে যাবেন একেবারে।'

এতক্ষণ যাবৎ ভেতরে লুকিয়ে থাকা মধ্যবিত্ত বাবা যেন প্রবল পরাক্রমে জেগে উঠল হঠাৎ করে, আমাকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ভস্ম করে ভদ্রলোক মেয়ের কাছে ফিরে চললেন দেয়ালের আড়াল থেকে। মেয়ের স্কুল ব্যাগটি হাতে নিয়ে নরম স্বরে বললেন, 'চল মা, বাড়ি যাই।' আমাকে এবং শিউলীকে তড়িঘড়ি সৌজন্যমূলক ধন্যবাদ জানিয়ে প্রবল ঝড়ো বৃষ্টির মধ্যেই মেয়ের হাত ধরে টেনে রিকশায় উঠালেন। আহ্লাদী মেয়েকে দেখলাম স্নেহময় সংগ্রামী বাবার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে রিকশায় বৃষ্টি ঠেকানোর পর্দা ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

দৈনিক আমার দেশ-এ ১৮ জুন ২০১১ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

সুলেমানের কোরবানি দেখা

আমার ছেলের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে সুলেমান। সেই সূত্রে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হল এবারের কোরবানি ঈদের ছুটিতে। এর আগে ফোনে হয়ত কথা হয়েছে টুকটাক। বাসার ল্যান্ড ফোনে যখন বন্ধুকে খুঁজেছে, তখন হয়তবা কখনও আমি ফোন ধরেছি। জিজ্ঞেস করেছি—'কে বলছ, বাবা?' সে হয়ত উত্তরে বলেছে—'আমি সুলেমান।' আমি ছেলেকে ডেকে দিয়েছি। এই পর্যন্তই ছিল। কিন্তু কোরবানি ঈদের ছুটিতে ছেলের স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে সুলেমানের ফোন আসতে থাকে বার বার। দিনে-রাতে আট থেকে দশবার ফোন আসছে, কখনও আমি ধরছি, কখনও বা আমার স্ত্রী। এই সময়ে সুলেমান নামটি আমাদের পরিবারে খুব পরিচিত হয়ে ওঠে।

ছেলের নতুন এই বন্ধুটি কে? কেন সে এতবার ফোন করছে? আমার স্ত্রী চিন্তিত হয়ে আমাকে একান্তে প্রশ্ন করে। মা হিসেবে বাড়ন্ত ছেলেকে নজরে রাখার প্রয়োজনে ছেলের বন্ধুদের খোঁজখবর রাখার চেষ্টা তার সব সময়। স্ত্রীর চাপে আমিও ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করি সুলেমানের ব্যাপারে। কিন্তু খুব একটা লাভ হয় না। কারণ ইদানীং আমাদের কিশোর ছেলে বাড়িতে কথা কম বলার পর্বটুকু পার করছে। সে শুধু সংক্ষেপে বলে—'সুলেমান আমার ক্লাসমেট। গুলশানে থাকে, আমাদের বাসার কাছেই, রোড ফিফটি।' জিজ্ঞেস করি—'সে ইদানীং এত বেশি ফোন করছে কেন তোমাকে?' ছেলে উত্তরে জানায়—'সে আমাকে তাদের বাসায় যেতে বলছে, খেলতে।' আমি বললাম—'তুমি বরং ওকে আমাদের বাসায় আসতে বল।' ছেলে বলে—'আচ্ছা।'

পরদিন সকালে ছেলে এসে বলল—'সুলেমান আজকে বিকেলে আসতে চাচ্ছে, তিনটার পরে।' আমি বললাম—'মাকে জিজ্ঞেস করে তারপর ওকে আসতে বল।' বাসায় আজ স্ত্রী নেই, ঈদ উপলক্ষে শপিংয়ে গেছে। কখন যে ফিরতে পারবে কে জানে। দুপুরের পর সুলেমান আবারও ফোন দিল। ফোনের রিসিভার ধরে রেখেই ছেলে জিজ্ঞেস করল—'বাবা, কী বলব?' বললাম—'আসতে বল।' মায়ের অনুপস্থিতিতে নতুন বন্ধুর সম্ভাব্য আপ্যায়ন কী হবে না হবে, তা নিয়ে ছেলেকে দেখলাম বেশ চিন্তিত। নিজে নিজেই ঘরের ফ্রিজ চেক করে এসে বলল—'ঘরে তো নাস্তা দেয়ার মত কিছু নেই বাবা।' বললাম—'চল, বাপ-বেটা দু'জনে কিছু কিনে আনি।' তিনটা বাজতে মিনিট বিশেক বাকি তখন। সুলেমান এসে যদি আমাদের

www.pathagar.com

বাসায় না পায় তা বিব্রতকর হতে পারে ভেবে ছেলে ফোন করে ওকে বলে দিল—'তোমার আসার দরকার নেই বরং আমরাই তোমাকে পথে তুলে নেব।' বাড়ি খুঁজে পেতে কোন সমস্যা হল না। গার্ডরুমের ইন্টারকম থেকে ছেলে বলল—'নেমে আস সুলেমান, আমরা নিচে।' ও বলল—'তোমরা উপরে এস। আমার বাবা-মা তোমাদের সঙ্গে কথা না বলে আমাকে ছাড়ছে না।'

আমি ছেলেকে বললাম—'ড্রাইভার চাচ্চুকে নিয়ে উপরে যাও, আমি নিচে গাড়ি পাহারা দিচ্ছি।' যে কিশোরটি নেমে এল আমার ছেলের বগলদাবা হয়ে, চেহারাটা তার হাসিখুশি মায়াময় ধরনের। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল। চোখে পাতলা কালো ফ্রেমের চশমা। পরনে টি-শার্ট, থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট আর পায়ে স্পোর্টস সুজ। গায়ের রং শ্যামলাই বলতে হবে আর উচ্চতায় আমার ছেলের চেয়ে ইঞ্চিখানেক খাটো হবে হয়ত। ঠোঁটের ওপর চিকন গোঁফের রেখা উঁকি দিচ্ছে। আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেক করার জন্য। আমি বললাম—'তুমিই তাহলে সুলেমান?' প্রত্যুত্তরে সে বলল—'জ্বি আঙ্কেল।' খানিকটা কাছে টেনে নিলাম ছেলের বন্ধুকে, জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত ঘষে দিলাম আদর করে। দুই বন্ধুকে মাঝের সিটে বসতে দিয়ে আমি সামনের সিটে বসলাম এবং বললাম—'চল বাবা, আমাদের কিছু কেনাকাটা করে তারপর বাসায় যেতে হবে।'

দু'দিন বাদে ঈদ। কোরবানির গরু কেনা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ শেষ করলাম গাড়িতে বসেই মোবাইল ফোনে। ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেকে বললাম—'চল বাবা, কালকে গরু কিনতে যাই।' ছেলে কিছু বলার আগেই সুলেমান প্রবল উৎসাহে বলে উঠল—'আঙ্কেল, আমাকে নিয়ে যাবেন?' আমি বললাম—'তোমার বাবা-মা কি তোমাকে যেতে দেবেন আমাদের সঙ্গে?' একটু যেন দমে গেল সুলেমান। কিছু বলল না, চুপ করে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর হুট করে প্রশ্ন করল—'আমি কি ঈদের দিন আপনাদের বাসায় কোরবানি দেখতে পারি?' আমার ছেলে পাল্টা প্রশ্ন করল—'তুমি কখনও কোরবানি দেখনি?' ও বলল—'না, দেখিনি।'

পনের বছর বয়সী কিশোর ঢাকায় বসবাস করেও কখনও কোরবানি দেখেনি, শুনে প্রথমটায় একটুখানি আশ্চর্যই হয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম ওকে—'তোমরা কোরবানি দাওনা কখনও?' ও জবাব দিল—'না, আমরা কখনও কোরবানি দিই না!' কিছুটা কৌতূহল হল আমার। অর্থনৈতিক কারণ তো হওয়ার কথা না। ইংরেজি স্কুলে পড়ে, গুলশানে ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে, গাড়িতে চড়ে। তবে অন্য কী কারণ হতে পারে! নাম তো মুসলমানদের মতই শোনায়, ধর্মবিশ্বাস কি তবে ওদের অন্য? ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের নামও তো অনেক দেশে মুসলমানদের মতই হয়ে থাকে। নাকি কোন নাস্তিক পরিবার ওদের? অল্পবয়েসী এই কিশোরকে বিব্রত না করে কারণটা কীভাবে জিজ্ঞেস করা যায় যখন মনে মনে ভাবছি, তখন ও নিজে থেকেই বলল—'আমার বাবা হিন্দু। মা মুসলমান। আমি আর আমার ছোট বোন দু'জনে এখনও

www.pathagar.com

কোন ধর্ম বেছে নিইনি। ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পরই নাকি আমরা দুই ভাই-বোন ঠিক করব আমাদের ধর্ম কোনটা হবে!'

সেদিন সারা বিকাল ফুটবল খেলে সন্ধ্যায় ছেলে আর সুলেমান এসে বসল আমার সামনে। নাস্তা খেতে খেতে আলাপচারিতা। মুসলমান মায়ের ছেলে সুলেমানকে আমরা বাপ-বেটা মিলে দাওয়াত করে দিলাম। ঈদের দিন সকাল থেকে সারাদিন আমাদের বাসায় কাটাবার দাওয়াত। সকালে ঈদের জামাত। নামাজ থেকে ফেরার পর কোরবানি দেখা। আর ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে লাঞ্চ, এমনকি ডিনারও সে করবে আমাদের সঙ্গে। সানন্দে দাওয়াত কবুল করে বাড়ি ফিরে গেল সুলেমান। রাতেই আবার ফোন এল তার। ঈদের দিন সকাল ক'টার মধ্যে আসতে হবে জানতে চায়। ছেলে বলে দিল—'আটটার মধ্যে চলে এস। আমরা সাড়ে আটটার জামাতে যাব।' রাতে আমার স্ত্রী সব বৃত্তান্ত শুনে বাগড়া দিল একটুখানি। জানতে চাইল—'ওর বাবা-মায়ের অনুমতি আছে তো?' আমি বললাম—'অনুমতি পেলেই তো আসবে।' ছেলেও মাথা নেড়ে সমর্থন যোগাল আমাকে। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল সুলেমানের ফোনে। ছেলেকে ডাকব কিনা জিজ্ঞেস করতেই বলল—'না ডাকলেও চলবে। আপনারা আজকে কখন গরু কিনতে যাবেন?' জিজ্ঞেস করলাম—'তুমি যাবে?' ও বলল—'না আঙ্কেল, আপনারা কিনে আনার পর আমি দেখতে আসব।' ওকে আশ্বস্ত করলাম এই বলে যে, গরু আসা মাত্র ওকে ফোনে জানিয়ে দেয়া হবে যাতে ও এসে দেখে যেতে পারে।

গরু কেনা হল। গতবারের চেয়ে বাজার বেশ চড়া এবার। বাজেট ঠিক রাখার চেষ্টায় হিমশিম খেতে হল আমাকে। ছেলের যা পছন্দ হয় তা আমার বাজেটের বাইরে। যা বাজেটের মধ্যে পাওয়া যায় তা আবার ছেলের চোখে লাগে না। ঘণ্টা তিনেক বাপ-বেটা ঘোরাঘুরি করে গতবারের চেয়ে বিশ হাজার টাকা বেশি দামে গতবারের চেয়ে কিছুটা ছোট সাইজের দুটো গরু কিনলাম। ছেলে তার বন্ধুকে ফোন দিল বাজার থেকেই—'এখনই চলে আস, আমাদের গরু কেনা হয়ে গেছে।' দেখলাম বিশেষ উত্তেজনা আর উচ্ছ্বাস নিয়ে ছেলে তার বন্ধুকে সদ্যসমাপ্ত গরুবাজার অ্যাডভেঞ্চার বর্ণনা করছে, হালের স্যাটেলাইট টেলিভিশনে লাইভ রিপোর্টিংয়ের মত। মোবাইলের অন্যপ্রান্তে থাকা সুলেমানের কিশোর মুখটা তখন আমার চোখে ভাসছে। গরুবাজার অ্যাডভেঞ্চারে নিজে অংশ নিতে না পারার আফসোসটুকু বেচারা হয়ত বন্ধুর কাছ থেকে গল্প শুনে পুষিয়ে নিচ্ছে।

জীবনে প্রথমবারের মত কোরবানি দেখার জন্য উতলা এক কিশোরের জন্য আমার ভেতরে এক ধরনের মায়া তৈরি হতে লাগল। ডান-বাম বিচার না করেই স্ত্রীকে বললাম—'আমাদের দুই গরুতে তো সাত নাম করে চৌদ্দ নাম দেয়া যায় কোরবানিতে। আমাদের সঙ্গে কি শরিকে সুলেমানের এক নাম কোরবানি দেয়া যায় না?' ছেলে উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল—'গুড আইডিয়া।' সাংসারিক বুদ্ধিতে সর্বদা

www.pathagar.com

আমার চেয়ে উত্তম হিসেবে বিবেচিত স্ত্রী বলল—'প্রথমত মৌলভী সাহেবের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে এতে কোন অসুবিধা আছে কিনা। দ্বিতীয়ত ওর বাবা-মা বিষয়টা কীভাবে নেবেন কে জানে?' মৌলভী সাহেব তো এক কথায়ই বিষয়টা নাকচ করে দিলেন। যা বললেন তার সারাংশ হল এই যে, ঈমান আনেনি এমন কারও নামে শরিকে কোরবানি দিতে গেলে আমাদের পুরো কোরবানিই নাকি নাজায়েজ হয়ে যাবে। আমার ছেলেমানুষী প্রস্তাবখানা মৌলভী সাহেবের ফতোয়ায় নাকচ হয়ে গেল।

বিকেলবেলা বাপ-ছেলে মিলে গরুদের খড়-বিচালি খাওয়ানোর তদারকি করছি, তখন সুলেমান এল। তার চোখ-মুখ কিশোরসুলভ উত্তেজনায় চক্‌চক্ করছে। কোন্ গরুটার কত দাম হয়েছে জানতে চাইল। বন্ধুর হাত থেকে খড়-বিচালি টেনে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিজেই গরুদের খাওয়ানোর কাজে। দুই বন্ধুর অবিরাম তর্ক চলতে লাগল কোন্ গরুটা বড়, কোন্‌টা ছোট তা নিয়ে। আমি দুই বন্ধুর ছেলেমানুষী সব মতবিরোধ আর বিতর্ক উপভোগ করছিলাম। শুনলাম ছেলে বলছে—'গরুটাকে রাতের বেলা পাটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে মশা কামড়ানোর সুযোগ কম পায়।' সুলেমান তখন বিশেষজ্ঞের মত বলল—'আই থিঙ্ক, মশারি টানিয়ে দেয়া বেটার হবে।' ছেলে তো মশারির কথা শুনে হেসেই কুটিকুটি। সুলেমান অকাট্য সব যুক্তি দিয়ে তার মশারি তত্ত্ব ডিফেন্ড করতে লাগল। সন্ধ্যা নাগাদ আমি ওকে বললাম—'এবার তুমি বাসায় যাও সুলেমান। তোমার বাবা-মা নিশ্চয় দুশ্চিন্তা করছেন। কাল সকাল আটটার মধ্যে চলে এস। তোমাকে নিয়েই এবার আমরা স্পেশাল ঈদ উদযাপন করব, কোরবানি দেব।' ছেলে আর আমি ওকে পৌঁছে দিয়ে এলাম ওদের বাড়ির গেট অবধি। রাতে আরও দু'বার ফোন এল সুলেমানের। একবার ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। আরেকবার আমার সঙ্গে। কী ড্রেস পরে সে আসবে ঈদের দিন, তা জানতে চাইল আমার কাছে। আমি বললাম—'আমরা তো পাঞ্জাবি-পাজামা পরব। তুমিও তাই পরে এস।' ও বলল—'আমার তো পাঞ্জাবি-পাজামা নেই।' বললাম—'তাহলে তোমার যা আছে, তাই পরে এস।'

ঈদের দিন সকালবেলা সাতটার মধ্যে সুলেমানের ফোন। 'আঙ্কেল, আমি তো আপনাদের বাসার নিচে দাঁড়িয়ে আছি।' আমি বললাম—'বাবা, তুমি উপরে এস। আমরা এখন গোসল করব, তারপর নামাজে যাব।' উপরে উঠে এল সুলেমান। সবুজ টি-শার্ট, জিন্স প্যান্ট আর স্পোর্টস সুজ তার পরনে। ছেলে তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি, বন্ধুর ডাকে উঠল। দুই বন্ধুর কিচিরমিচিরে ঈদের দিন সকাল বেলায় আমার ঘর যেন সরগরম হয়ে উঠল। ছেলেকে গোসলে পাঠালাম আর সুলেমানকে শুধালাম—'তুমি কি গোসল করেছ, বাবা?' ও বলল—'করেছি।' বললাম—'তাহলে তুমি তোমার বন্ধুর একখানা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরে নাও ঝটপট।' ছেলের জন্য গত ঈদে কেনা একসেট পাঞ্জাবি-পাজামা বের করে দিল আমার স্ত্রী। প্রথমে এক দু'বার আপত্তি করলেও অবশেষে নিজের কাপড় পাল্টে বন্ধুর পাঞ্জাবি-পাজামা পরে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নিল সে। গোসল সেরে বেরিয়ে দেখি আমার স্ত্রী সুলেমানকে ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। পুডিং, সেমাই, নুডলস আর চটপটি সাজানো টেবিলে। সুলেমান সেমাই খেতে চাইছে না, কারণ আগে কখনও খায়নি। সে তার পরিচিত নুডলস, পুডিং আর চটপটি খেতে চাইছে। আমার স্ত্রী তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে, ঈদের দিন একটু সেমাই খেতে হয়। সবার অনুরোধে এক বাটি সেমাই খেয়ে সে প্রশংসার সুরে বলল—'দারুণ'।

নামাজে যাওয়ার জন্য গাড়িতে ওঠার আগ মুহূর্তে সুলেমান জানাল যে, সে নামাজে যেতে চায় না। আমার স্ত্রী ওকে বলল—'তাহলে তুমি আমার কাছে থাক। ওরা নামাজ পড়ে আসুক।' নামাজ শেষে ফিরে দেখলাম সুলেমান খুবই ব্যস্ত। ছোট্ট একখানা ক্যামেরা নিয়ে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করে কসাইদের ছুরি ধার দেয়ার ছবি তুলছে। গরুকে গোসল করানোর ছবিও তুলছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। সকাল ৯টায় আমাদের দুই গরু আল্লাহর নামে কোরবানি দেয়া হল। সেই ছবি বেশি কাছ থেকে তুলতে গিয়ে তার গায়ের কাপড়ে আর ক্যামেরার কাভারে ছিটকে ওঠা রক্ত লেগে গেল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে ছুটে এসে আমাকে তা দেখাল সে। বন্ধুর কাছ থেকে ধার করা পাঞ্জাবিতে রক্তের দাগ লেগে গেছে বলে বার বার দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। জীবনে প্রথমবারের মত কোরবানি প্রত্যক্ষ করা নিষ্পাপ এই কিশোরের প্রগলভতা আমার কাছে বেশ লাগছিল।

চামড়া ছাড়ানো শেষে গোশত যখন কোটা শুরু হয়েছে তখন সুলেমান এসে ফিসফিস করে বলল—'আঙ্কেল, আমাকে এখনই যেতে হবে। বাসায় বোধ হয় একটু ঝামেলা হচ্ছে।' বললাম—'যাও বাবা, ঝামেলা শেষ হলে চলে এস।' সুলেমান সেদিন আর আসেনি। আমাদের সঙ্গে ঈদের দিন তার লাঞ্চ বা ডিনার কোনটাই করা হয়নি। তার বাসায় কী ধরনের ঝামেলা হয়েছিল তাও জানা হয়নি আমাদের। এরপর থেকে সে আর ফোন দেয় না আমাদের বাসায়। ছেলে ওর মোবাইল ফোনে কল করলেও তা রিসিভ করে না। ক'দিন ধরে বাসার ল্যান্ডফোনটা বেজে উঠলেই মনে হয়, এই বুঝি আবার সুলেমান ফোন করেছে!

ছেলেকে জিজ্ঞেস করে ইদানীং জানলাম, সুলেমান স্কুলের লেখাপড়ায় বিশেষ অমনযোগী, মাঝে মাঝেই অদ্ভুত আচরণ করে এবং মোটামুটি বন্ধুহীন। ক্লাসের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েকে সে এক প্রকার এড়িয়েই চলে। তার নাকি কিছুই ভালো লাগে না। এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে তার। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা চাপিয়ে দেয়ার ফলে অপরিণত কিশোর সুলেমানের জীবনে অদ্ভুত কোন সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার ধারণা। হতে পারে তা বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে সৃষ্ট এক ধরনের আইডেনটিটি ক্রাইসিস বা আত্মপরিচয়ের সঙ্কট। আমি কে? এই চিরন্তন প্রশ্নের নিঃসংশয় উত্তর না জানার সঙ্কট। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সব ধর্মই আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন জীবনাচার বা লাইফস্টাইল

www.pathagar.com

সৃষ্টি করেছে। কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ সে বিতর্কে না গিয়েও বলা চলে, মুসলমানের জীবনাচার স্বতন্ত্র, হিন্দুদের থেকে আলাদা। তেমনি বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের জীবনাচারও স্বতন্ত্র, পরস্পর থেকে আলাদা।

নিজ ধর্মের দর্শন মৌলভী-পুরোহিতদের মত অতটা ভালোভাবে না জেনেও এবং নিয়মিত এবাদত বা প্রার্থনা না করেও, এ দেশে মুসলমান মুসলমানের মত জীবনযাপন করে, হিন্দু হিন্দুর মত জীবনযাপন করে। এই পৃথক পৃথক জীবনাচার তাদের প্রত্যেককে দিয়েছে স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় যার মূলভিত্তি হল তাদের স্ব স্ব ধর্ম। ধর্মবিশ্বাসের দর্শন ও গূঢ়তত্ত্ব এই অপরিণত বয়সে কতটুকুইবা বোঝে সুলেমান? ধর্মবিশ্বাসের চেয়েও তার কাছে বড় হল, যে সমাজে সে বাস করে সেখানে নিজের স্বকীয় পরিচয় নিয়ে নিঃসংকোচে মিশে যেতে পারার সুযোগ, সবার সঙ্গে একাকার হয়ে বেড়ে ওঠার আনন্দ। বছরের পর বছর ধরে সে না পারছে প্রাণ খুলে ঈদ উদ্‌যাপন করতে, না পারছে পূজোতে হৈ-হুল্লোড় করতে। আমাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলো যখন সবার জন্য বয়ে আনছে সীমাহীন আনন্দের বার্তা, তখন তা সুলেমানের জন্য কেবলই বয়ে আনছে অস্বস্তিকর বিচ্ছিন্নতা আর বিষণ্নতা। ধর্মান্ধতা যেমন অবশ্য বর্জনীয়, তেমনি ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতাও কতটুকু যুক্তিযুক্ত বা সমাজের জন্য মঙ্গলজনক তা গুরুত্বের সঙ্গে আজ আবার ভেবে দেখতে হবে। বিজ্ঞ সমাজবিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে ভেবেচিন্তে এমন এক যুৎসই সমাধান নিশ্চয় বাতলে দেবেন, যা কিশোর সুলেমানের জীবনকে সংশয়মুক্ত করবে, সংযুক্ত করবে এবং সর্বোপরি আনন্দময় করবে।

সুলেমান, তুমি ভালো থেক বাবা। তোমার বাসার ঝামেলা শেষ হলে আবার আমাদের বাসায় এস। তোমার সব অজানা কথা সবাই মিলে সেদিন শুনব।

দৈনিক আমার দেশ-এ ১৬ নভেম্বর ২০১১ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

অ্যানা গ্যাব্রিয়েলা

ভোর তখন পাঁচটা বাজে হয়তোবা। আমার মোবাইল ফোনটা বিরক্তিকরভাবে অবিরাম বেজেই চলেছে। হালকা শীতের আমেজে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিলাম। উঠতে ইচ্ছে করছিল না বলে লেপের নিচে মাথা ঢুকিয়ে নিলাম। ভাবলাম অসময়ের ফোনটা এড়িয়ে যাই। সকালে ঘুম থেকে রয়ে-সয়ে উঠে মিস্‌ড কল অ্যালার্ট দেখে কল ব্যাক করলেই চলবে। কিন্তু বারবার বেজেই চলল মোবাইল ফোনের রিঙ্গার। স্ত্রী ফজরের নামাজ শেষ করে ফোনটা এনে আমাকে ডেকে তুলল। বলল, 'বিদেশ থেকে ফোন, নাও ধর।' আমার আলসেমি দেখে লেপটাও টেনে সরিয়ে দিল। বলল, 'জরুরি কোন ফোন হতে পারে। বারবার যেহেতু করছে, ধরে দেখ।' নিরুপায় হয়ে স্ত্রীর হাত থেকে ফোনটা নিলাম। আধো ঘুম আর আধো জাগরণের মধ্যেই মোবাইলে কল রিসিভ করে জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যালো, কে বলছেন?' ওপার থেকে নরম একখানা নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'হ্যালো, স্যার! দিস ইজ অ্যানা গ্যাব্রিয়েলা।' এবার বিছানায় উঠে বসলাম, ততক্ষণে আমার আরামের ঘুমটুকু টুটে গেছে। ইংরেজিতেই বললাম, 'হ্যাঁ, মিজ গ্যাব্রিয়েলা, বলুন।' প্যারিসে আমার প্রিন্সিপালের হেড অফিস। ওখান থেকে মাঝে-সাঝে ফোন আসে আমার কাছে। ভাবলাম, সেখানকার আন্তর্জাতিক সমন্বয় ডেস্ক থেকে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ হয়ত ফোন করেছে। সম্ভবত আমাদের সময় পার্থক্য তার ঠিকমত জানা হয়নি এখনও। শুনলাম ওপার থেকে নারীকণ্ঠ বলছে, 'স্যার, আমি গ্রিস থেকে বলছি। আপনার সাহায্য প্রয়োজন আমার।' একটু আশ্চর্যই হলাম। আমার জানামতে গ্রিসে আমার কোন ব্যবসায়িক কানেকশন নেই। কোন রকম দিশে করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'বলুন, কীভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? তার আগে দয়া করে আপনার পরিচয়টা দেবেন?'

স্ত্রী ততক্ষণে মশারি খুলে ফেলেছে। পাশে এসে বসেছে কৌতূহলী হয়ে। ওপ্রান্ত থেকে অ্যানা গ্যাব্রিয়েলা বলে যাচ্ছে তার পরিচয়ের বৃত্তান্ত। দুর্বল ইংরেজিতে বলা তার বৃত্তান্ত বাংলায় অনুবাদ করলে সারাংশ যা দাঁড়ায় তা হল এই যে, সে গ্রিস দেশের এক তরুণী। রাজধানী এথেন্স শহর থেকে একটু দূরে শহরতলিতে থাকে। নিজে একটা ছোটখাট চাকরি করে এথেন্সে। গ্রিস প্রবাসী বাংলাদেশী যুবক কামালের প্রেমে সে হাবুডুবু খাচ্ছে গত তিন বছর যাবৎ। সেই প্রেম নিয়ে টানাপড়েনে নিরুপায় হয়ে আমাকে ফোন করতে বাধ্য হয়েছে। বিশ্ববিজয়ী বীর আলেকজান্ডারের দেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রিস থেকে এক গ্রিক তরুণী ফোন করেছে আমাকে–ভেবে এক ধরনের রোমাঞ্চ তৈরি হল আমার মধ্যে। মনে মনে তার অপরূপ একখানা ছবিও এঁকে ফেলেছি ততক্ষণে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার ফোন নম্বর কোথায় পেলেন, মিজ গ্যাব্রিয়েলা?' সে বলল, 'কামাল বলেছে, বাংলাদেশে আপনি তার নিকট প্রতিবেশী। ঈদে কিংবা নববর্ষে কামাল যখন আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এসএমএস পাঠাত, তা আমিই ওর হয়ে লিখে দিতাম। সে সময় আমি আপনার ফোন নম্বর টুকে নিয়েছি।'

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কোন কামালের কথা বলছে গ্যাব্রিয়েলা। আমার পাশের গ্রামেই কামালদের বাড়ি। গ্রিস যাবার আগে আমাকে ফোন করেছিল। মাঝে মাঝেই সে ফোন করত আমাকে কিংবা আমার স্ত্রীকে গ্রিস থেকে। কামালের হাসিখুশি চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। বললাম, 'কামাল কেমন আছে? ও কি আছে আপনার পাশে?' একটু যেন ভড়কে গেল গ্রিক তরুণী। কাতর স্বরে বলল, 'না, কামাল পাশে নেই। আমি যে আপনাকে ফোন করেছি, প্লিজ ওকে বলবেন না। ও শুনলে রাগ করতে পারে।' এবার আমার ভড়কে যাবার পালা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পাশে বসে থাকা স্ত্রীর দিকে তাকালাম এবং ফোন হাত দিয়ে ঢেকে স্ত্রীকে বললাম, 'এই মেয়ে তো বলছে, ও যে আমাকে ফোন করেছে, তা যেন কেউ না জানে। কী করব?' স্ত্রী বলল, 'শোন, কী বলে। এতদূর থেকে ফোন করেছে একটা মেয়ে!' শুনলাম ওপাশ থেকে অ্যানা গ্যাব্রিয়েলা বলছে, 'হ্যালো স্যার, আমি আপনাকে একটা এসএমএস পাঠাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর আমি আবার ফোন করছি।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে।' ফোন রেখে উদগ্রীব স্ত্রীকে অ্যানা গ্যাব্রিয়েলার সাথে আমার পুরো আলাপচারিতা শোনাতে হলো। তার মেয়েলি কৌতূহল বেশ জেগে উঠল, দেখলাম।

আধা ঘণ্টার মধ্যে পরপর তিনটা এসএমএস পেলাম অ্যানা গ্যাব্রিয়েলার কাছ থেকে। সবগুলো এসএমএস স্ত্রীকে পড়ে শোনালাম। গ্যাব্রিয়েলা যা লিখেছে তা বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'আমি বলতে পারেন একপ্রকার নিরুপায় হয়েই আপনাকে ফোন করেছি। কামাল গত দু'দিন ধরে খুব কান্নাকাটি করছে। শুধু বলছে, দেশে যাবে। তার এক ভাই নাকি গ্রামের বাড়িতে হঠাৎ করে মারা গেছে। ওর কান্না দেখে আমার খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু একটু ভয়ও হচ্ছে, ও যদি আর ফিরে না আসে! আবার কিছুটা সন্দেহ হচ্ছে, ও মিথ্যে অজুহাত দিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে না তো? আমি বাংলা জানি না বলে ওর বাড়িতে কাউকে ফোন করে যে প্রকৃত ঘটনা জেনে নেব, তাও পারছি না। যদি একটু খোঁজ নিয়ে জানান, আসলেই ওর ভাই মারা গেছে কিনা। ওর পরিবার আমার সাথে কামালের সম্পর্কের বিষয়ে এখনও কিছু জানে না। আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব, স্যার।' অ্যানা গ্যাব্রিয়েলার দুর্বল ইংরেজিতে লেখা এসএমএসগুলো পড়ে মনটা আমার একরকম দ্রবীভূত হয়ে গেল আর আমার স্ত্রীও দেখলাম রীতিমত আকুল হয়ে উঠেছে। স্ত্রীকে শুধালাম, কী করব?' সে বলল,

www.pathagar.com

'খোঁজ নিয়ে দাও। কতটা অসহায় হলে একটা ভিনদেশি মেয়ে তোমার মত অচেনা লোককে ফোন করে সাহায্য চাইতে পারে?' বললাম, 'দেখি, কী করা যায়। আমার তো আজ তোমাকে নিয়ে রূপগঞ্জ যাবার কথা পূর্বাচলে তোমার প্লট রেজিস্ট্রেশনের জন্য।' স্ত্রী বলল, 'আমার প্লট রেজিস্ট্রি আজ না হলেও চলবে। তুমি ওই বিদেশি মেয়ের সমস্যা সমাধান কর আগে।' অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম স্ত্রীর দিকে। তার মুখভঙ্গি দেখে বুঝলাম গ্রিক তরুণীর জন্য বাংলাদেশী এক নারীর কোমল হৃদয়ে গভীর মমতা তৈরি হয়েছে এরই মধ্যে।

কিছুক্ষণ বাদে অ্যানা গ্যাব্রিয়েলা আবার ফোন করল। ফোন ধরা মাত্র জিজ্ঞেস করল, ওর এসএমএস পেয়েছি কিনা। বললাম, 'পেয়েছি।' জিজ্ঞেস করল, 'কোন খবর কি পেলেন?' আমি বললাম, 'না, এখনও কোন খবর পাইনি। খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করছি।' সে বলল, 'আমি আপনাকে আবার ফোন করব, স্যার।' আমি বললাম, 'আপনার করতে হবে না। আমিই ফোন করব।' কেঁদে ফেলল ওই প্রান্তে গ্রিক তরুণী। ভেজা স্বরে বলল, 'কী যে করব, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, স্যার। আমি কামালকে খুবই ভালোবাসি। ওকে সব রকম সাহায্য করতে চাই। কিন্তু ওকে কিছুতেই হারাতে চাই না।' চুপ করে শুনছি ক্রন্দনরতা অ্যানা গ্যাব্রিয়েলার কথা। স্ত্রীও পাশে বসে শুনছে আমার কানের পাশে রিসিভারে কান পেতে। এক ফাঁকে সান্ত্বনা দেবার মত করে শুধু বললাম, 'কাঁদবেন না, প্লিজ। আমি যত শিগগির সম্ভব আপনাকে জানাচ্ছি।' কাঁদতে কাঁদতেই বলতে লাগল অ্যানা গ্যাব্রিয়েলা, 'নিশ্চয় জানেন, গ্রিসে গত এক বছর ধরে খুব খারাপ অবস্থা যাচ্ছে। কামালের কোন কাজ নেই এক বছরের ওপর হবে। আমিই ওকে সাপোর্ট করছি। ওর বাবা-মায়ের কাছে ওর নাম করে আমি প্রতি মাসে ইউরো পাঠাচ্ছি। ও যে বেকার-অসহায় অবস্থায় আছে, তা নিজের বাবা-মাকে জানাতে চায় না।' শুনতে শুনতে আমার অবাধ্য চোখ আর্দ্র হয়ে উঠল আপনা থেকেই। মৃদুস্বরে শুধু বললাম, 'মিজ গ্যাব্রিয়েলা, আপনি অনেক বড় হৃদয়ের মানুষ। আপনি আর কাঁদবেন না, প্লিজ।' সে আবার বলল, 'কামাল শিশুর মত ডুকরে ডুকরে কেঁদে বলছে, ওকে যেন একটা প্লেনের টিকিট কিনে দিই। ওর মৃত ভাইকে দেখতে যাবে। দেশে ফেরার টিকিটের টাকাও নেই ওর কাছে। ওকে তো সবকিছুই দিতে পারি আমি, ওর জন্যে সবকিছুই করতে রাজি আছি। কিন্তু ওর যে কাগজপত্র হয়নি এখনও। ও যদি দেশে ফিরে যায়, তবে কি আর আমার কাছে ফিরতে পারবে?' একখানা অসময়ের ফোন কল এমন করে এক হৃদয়বিদারক আন্তর্জাতিক প্রেমকাহিনীতে রূপান্তরিত হবে, শীতের ভোরবেলায় লেপের নিচে শুয়ে থাকাকালে মোটেও আন্দাজ করতে পারিনি।

নাস্তার টেবিলে স্ত্রী ভারী গলায় আমাকে বলল, 'তুমি এখনই কাউকে ফোন করে কামালের গ্রামে পাঠাও।' বললাম, 'পাঠাচ্ছি।' কামালের বাবার নাম জানি না, ওর বাড়ি পাশের গ্রামে ঠিক কোনখানে তাও জানি না ভালোমত। ভাবতে ভাবতে

www.pathagar.com

গাড়িতে উঠলাম রূপগঞ্জ যাবার উদ্দেশে। ফোন করলাম গ্রামের এক চাচাত ভাইকে, গাড়িতে বসেই। জিজ্ঞেস করলাম, 'পাশের গ্রামে কামাল নামের এক যুবক গ্রিসে থাকে, তাকে চেন?' সে বলল, 'হ্যাঁ, চিনি। ওর এক ভাই তো মারা গেছে গতকালকে।' থমকে গেলাম দুঃসংবাদটির সত্যতা নিশ্চিত হতে শুনে। কীটনাশক খেয়ে নাকি মারা গেছে ভাইটি। বাপ-মার সাথে রাগ করে দরজা বন্ধ করে বিষাক্ত ওষুধ খেয়েছে। মাত্র এক বছর হল দুবাই থেকে ফেরত এসেছিল সে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কামালের ছোট না বড়, এই ভাইটা?' উত্তর এল, 'কামালের চাইতে ছোট।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'তুমি একটু ওদের বাসায় গিয়ে আমার ও তোমার ভাবীর তরফ থেকে সমবেদনা জানিয়ে এস।' সে বলল, 'জ্বি আচ্ছা, ভাই।' মনটা গভীর বেদনায় ভরে গেল।

আরও কয়েক জায়গায় ফোন করে যা জানলাম তার সারমর্ম হল এই যে, কামালের ছোট ভাই জামাল বিশ বছর ধরে দুবাইতে ছিল। স্কুলের পড়া শেষ হবার আগেই সংসারের অর্থনৈতিক চাপে জামালকে দুবাই পাড়ি দিতে হয়েছিল নেহায়েত কচি বয়সে। দুবাইতে আয়-রোজগার সে সময়ে বেশ ভালোই হতো। জামালের পাঠানো টাকায় তার পরিবারের অর্থকষ্ট ঘুচে গিয়েছিল, এসেছিল দৃশ্যমান সমৃদ্ধির ছোঁয়া। জামালদের ঘরবাড়ি এখন পাকা, ঝকঝকে, সুন্দর। বৈঠকখানা আর ভেতরবাড়ির মুখ করে পুকুরের দুই পাড়ে দুই-দুইটা পাকা ঘাট। সমগ্র বাড়িটি ঘিরে উঁচু দেয়াল। দেয়ালের মাঝখানে রাজকীয় ডিজাইনের তোরণ, স্পেশাল অর্ডার দিয়ে বানানো। আগেকার আমলে বাড়ির শেষ প্রান্তে যে কাঁচা টাট্টি বা ল্যাট্রিন ছিল, তা সরিয়ে এখন দালানের ভেতরেই জায়গা করে নিয়েছে এটাচ্‌ড বাথরুম ও টয়লেট। ঘরভর্তি নতুন আসবাব এসেছে পুরনো চৌকি আর আলনাগুলো ঠেলে সরিয়ে। রঙিন টিভি, ফ্রিজ, আর ওয়্যারড্রোব দিয়ে ড্রইংরুম, ডাইনিংরুম, বেডরুমগুলো খুব সুন্দর করে সেজেছে। বড় এক ভাই আর ছোট দুই বোনের মোটামুটি লেখাপড়াও হয়েছে। দুই বোনকেই ভালো ঘরে বিয়ে-শাদি দেয়া হয়েছে অনেক সোনাদানা আর নগদ টাকা যৌতুক দিয়ে। বোনজামাইরা দু'জনেই পার্শ্ববর্তী জেলা শহরে মণিহারি দোকান দিয়ে ব্যবসা সাজিয়ে বসেছেন। প্রয়োজনীয় পুঁজির জোগান দেয়া হয়েছে জামালের পাঠানো টাকা থেকে। সর্বশেষ বড়ভাই কামালকেও গ্রিস পাঠানো হয়েছে বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করে।

বছর দুয়েক আগে দুবাইতে অর্থনৈতিকভাবে মন্দা আবির্ভূত হলে বেচারা জামালের চাকরিদাতা কোম্পানি ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। চাকরি হারাবার পর জামাল বিকল্প চাকরি খোঁজার চেষ্টা করেছিল বেশ কয়েক মাস। অন্য কোন দেশে যাবার জন্য চেষ্টাও চালায় সে। অবশেষে দেশে ফিরে আসে একপ্রকার নিঃস্ব অবস্থায়। হাতে তেমন পুঁজি না থাকায় দেশে কোন ব্যবসা শুরু করতে পারেনি। নিরুপায় হয়ে আপনজন বোনজামাইদের সাথে ব্যবসায়ে অংশীদার হবার প্রস্তাব

www.pathagar.com

দিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে মনটা একপ্রকার ভেঙে যায় জামালের। বোনজামাইরা এড়িয়ে চলতে থাকে জামালকে। মা-বাবার কাছে এসে বোনজামাইদের নামে অভিযোগ করে সে, বেইমান বলে গালাগাল করে বাড়ি গরম করে তোলে। মেয়েদের সংসারে অশান্তি হবে ভেবে মা-বাবাও সরাসরি জামালের পক্ষ নিতে কুণ্ঠাবোধ করতে থাকেন। জামালের মনে হতে থাকে মা-বাবা তার দিকটা মোটেই দেখছেন না, শুধুই বোনদের আর বোনজামাইদের দিকটা দেখছেন। নিজের কাছে কোন সঞ্চয় না রেখে বাবার কাছে সর্বস্ব পাঠিয়ে দেয়া জামাল অভিমানে আর হতাশায় ধীরে ধীরে মুষড়ে পড়তে থাকে। সর্বশেষ মাস তিনেক আগে থেকে ইটালি যাবে বলে বাবাকে দশ লাখ টাকা দেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে জামাল। কিন্তু বাবা তাকে জানান যে, এত টাকা নগদে দেবার সামর্থ্য এ মুহূর্তে তার নেই। একপর্যায়ে এযাবৎ পাঠানো সব টাকার হিসেব চাইলে, বাবাও তার সাথে ভীষণ রকম ক্ষেপে ওঠেন। ঝগড়াঝাঁটির একপর্যায়ে জামাল পরিবারের সবার সাথে কথা বলা এবং ঘরে কোন প্রকার খাবার গ্রহণ করা বন্ধ করে দেয়। রাগে-দুঃখে-অভিমানে জামাল নামের এই প্রবাসফেরত নিঃস্ব যুবক কখন যে আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল, নিকটজনেরা কেউ তা বুঝতে পারেননি ঘুণাক্ষরেও।

জামালের এমন দুঃখজনক মৃত্যু কারও কাম্য হতে পারে না। অসহায় প্রবাসফেরত জামালদের পুনর্বাসনে এবং কল্যাণসাধনে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকরা ভেবে-চিন্তে আরও কার্যকর কিছু উপায় খুঁজে বের করবেন, সেই প্রত্যাশা রইল। হতে পারে তা অনুৎপাদনশীল খাতে সব উপার্জন ঢেলে না দেবার ব্যাপারে প্রবাসী ও তাদের অভিভাবকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির পদক্ষেপ, হতে পারে কোন নির্ভরযোগ্য প্রবাসী পেনশন কর্মসূচি, হতে পারে কার্যকর সুরক্ষাদানকারী বীমা প্রকল্প জাতীয় উদ্যোগ কিংবা একেবারেই নতুন অন্য কোন কিছু। মোদ্দাকথা হল, এমন হৃদয়বিদারী ট্র্যাজেডি যেন আর কোন জামালের কপালে না জোটে, তা নিশ্চিত করতে হবে। বিগত বিএনপি সরকারের আমলে চালু হওয়া স্বতন্ত্র প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উচিত এই ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা নিয়ে অতিসত্বর এগিয়ে আসা।

রূপগঞ্জ পৌঁছে স্ত্রী ঢুকে গেল সাবরেজিস্ট্রারের অফিসে। আমি গাড়িতে বসেই ফোন করলাম অ্যানা গ্যাব্রিয়েলাকে। সে ফোন ধরল না। বরং কল ব্যাক করল মিনিট কয়েকের মধ্যেই। জিজ্ঞেস করল, 'হ্যালো, স্যার। কোন খবর পেলেন?' আমি বললাম যথাসম্ভব ঠাণ্ডাগলায়, 'হ্যাঁ, খবর পেয়েছি। কামালের ছোট ভাই গতকাল আত্মহত্যা করেছে।' মেয়েটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল ফোনের অন্যপ্রান্তে। শুনলাম সে কেঁদে কেঁদে বলে যাচ্ছে, 'ও মাই গড। ও মাই গড।' আমি চুপচাপ শুনে যাচ্ছি। এমনভাবে ক্রন্দনরত মানুষকে কী বলে সান্ত্বনা দেয়া যায়, আমার জানা নেই। অ্যানা গ্যাব্রিয়েলা মাতম করে বলছে, 'স্যার, আমি খুবই নীচ, আমি খুবই খারাপ। আমি আমার কামালকে সন্দেহ করেছি। ও তো মিথ্যে বলেনি। আমি শুধু শুধু সন্দেহ

www.pathagar.com

করেছি আমার কামালকে। ও মাই গড।' আমি শুধু আস্তে করে বললাম, 'মিজ গ্যাব্রিয়েলা, প্লিজ কাঁদবেন না।' সে এবার কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বলল, 'স্যার, আমি এখন ওকে দেশে যেতে দেব। ওর কান্না থামাতে আমি সব ত্যাগ স্বীকার করব। আমার কামাল সুখী হোক।' আমি একটু আগ বাড়িয়ে বললাম, 'মিজ গ্যাব্রিয়েলা, আপনি কামালকে বিয়ে করছেন না কেন? তাহলেই তো ওর কাগজপত্রের সমস্যা মিটে যায়।' চরম বিষণ্নতার মাঝেও এই প্রথম হাসতে শুনলাম অ্যানা গ্যাব্রিয়েলাকে। এ প্রসঙ্গে কথা না বাড়িয়ে সে শুধু বলল, 'আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, স্যার।'

সর্বশেষ খবর হল, কামাল দেশে ফিরে আসেনি। জামালকে দাফন করা হয়েছে গ্রামের কবরস্থানেই। অ্যানা গ্যাব্রিয়েলা একটা লম্বা এসএমএস পাঠিয়েছে আমাকে সপ্তাহখানেক পর, 'কামাল আর আমি আজ বিয়ে করেছি। আমাদের জন্য প্রার্থনা করবেন। ওর বাবা-মাকে এখনও কিছু জানাবেন না, প্লিজ! ওর কাগজগুলো হয়ে গেলে আমরা একসঙ্গে বাংলাদেশে আসব।' শুভেচ্ছা জানিয়ে আমিও একটা ফিরতি এসএমএস পাঠালাম ভ্রাতৃবধূ অ্যানা গ্যাব্রিয়েলাকে, 'চিরজীবী হোক তোমাদের প্রেম! সুখী হও তোমরা দু'জনে!'

দৈনিক আমার দেশ-এ ১৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

রুস্তমের গায়েবি ফোন

আমার বনানী অফিসে বসে একজন গুরুত্বপূর্ণ ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলছিলাম। এর মধ্যে হঠাৎ করে ফোন এল মোবাইলে। সামনে ক্লায়েন্ট রয়েছে বলে তখন ফোন কলটা রিসিভ করব না, এমনটাই ভাবছিলাম। কিন্তু বারবার বাজছিল বলে কে ফোন করেছে দেখে নেয়ার জন্য ফোনের কভার খুলে স্ক্রিনটা দেখলাম। শরীর শিরশির করে উঠল। মরহুম রুস্তম আলীর নম্বর থেকে ফোন আসছে। প্রায় ছয় মাস হতে চলল রুস্তম মারা গেছে। মারা যাওয়ার দিনকয়েক আগে রুস্তম আমাকে ফোন করে কান্নাকাটি করেছিল অনেক। বলেছিল, কোন বেয়াদবি করে থাকলে যেন তাকে মাফ-সাফ করে দিই।

খুব বিনয়ী স্বভাবের ছেলে ছিল রুস্তম। কখনও কোন বেয়াদবি তো করেইনি সে, বরং দরকারে-অদরকারে কয়েকবার আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। রাজনৈতিক সফরে তার গ্রামে গেলে বাড়িতে নিয়ে আপ্যায়ন করার জন্য জোরাজুরি করেছে বিস্তর। পরে কোন একদিন সস্ত্রীক তার বাড়িতে গিয়ে দাওয়াত খাওয়ার ওয়াদা করে রেহাই পেতে হয়েছে প্রতিবারই। হাসিখুশি ছেলে রুস্তম খুব জনপ্রিয় ছিল তার ইউনিয়নে। সেই প্রাণবন্ত ছেলে রুস্তমকে শিশুর মত কেঁদে উঠতে শুনে সেদিন মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। আজ এতদিন পর তার ফোন নম্বর থেকে কে ফোন করতে পারে? আমার জানামতে, সে তো ছিল অবিবাহিত। তার একটা ভাই শুনেছি বিদেশে থাকে। বাবা গেরস্তি করে সংসার চালাতেন। আমি অবশ্য সে ছাড়া তার পরিবারের অন্য কাউকে সেইভাবে ঠিক চিনিও না। ক্লায়েন্টের সামনে এই অস্বাভাবিক ফোনটা না ধরে পরে একসময় কল ব্যাক করবার সিদ্ধান্ত নিলাম। রিঙ্গার সাইলেন্ট করে দিয়ে চলমান ক্লায়েন্ট মিটিংয়ে মনোযোগ দিলাম।

লাঞ্চ শেষে ক্লায়েন্ট বিদায় করে নিজের রুমে এসে ফোনটা হাতে নিয়ে মিস্‌ড কল লিস্টটা দেখলাম। সকাল থেকে এ পর্যন্ত গোটা বিশেক নম্বর থেকে ফোন এসেছে। কিছু ব্যবসায়সংক্রান্ত ফোন, কিছু রাজনৈতিক আর একখানা ফোন নিতান্তই পারিবারিক। প্রিয়তমা স্ত্রী ফোন করেছিল, তাও দেখতে পাচ্ছি। তিনটা কল এসেছে স্ত্রীর নম্বর থেকে। লেডিস ফার্স্ট বিবেচনায় প্রথমেই স্ত্রীকে ফোন করে জেনে নিলাম জরুরি কোন দরকার ছিল কিনা। কোন দরকার ছিল না। শুধু কোথায় আছি–জানার জন্যই ফোন করেছিল বলে জানাল স্ত্রী। দিনে দু-তিনবার এই অধম স্বামীর হদিস জানার জন্যে ফোন করে থাকে স্ত্রী। ভালোই লাগে এই বয়সেও স্ত্রীর খোঁজখবর

www.pathagar.com

নেয়ার তাগিদ দেখে। অদরকারি এই ফোনগুলো মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেয় কাজ ছাড়াও কেবলই ভালোবাসার টানে খোঁজ-খবর নেয়ার কেউ একজন আছে এখনও। স্ত্রীর সঙ্গে কথা শেষ করে বাকি সব নম্বরেই একে একে কল ব্যাক করলাম। বাদ রইল শুধু রুস্তমের নম্বরটা। এই নম্বর থেকে সাতবার কল এসেছে বলে দেখাচ্ছে ফোনের মিস্‌ড কল লিস্ট। কয়েকবার চেষ্টা করলাম রুস্তমের ফোনে। কিন্তু কানেক্ট করতে পারলাম না। বন্ধ আছে মনে হয় ফোনটা। বারবার শুধু একটা মেয়েলি কণ্ঠ রেকর্ড করা মেসেজ শুনিয়ে যাচ্ছে, 'আপনি যে নম্বরে কল করেছেন তা এই মুহূর্তে বন্ধ আছে। অনুগ্রহ করে একটু পরে আবার চেষ্টা করুন।'

রুস্তমের বয়স কত হয়েছিল? প্রশ্নের উত্তরে বাবা হাতেম আলী জানালেন, 'তিরিশ কি বত্রিশ।' সচ্ছল একজন গেরস্ত কৃষক হিসেবে ভালোই চলছিল হাতেম আলীর সংসার। লেখাপড়ায় ভালো ছিল রুস্তম। প্রাইমারি বৃত্তি পেয়েছিল সে। তখন হাতেম আলী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার এই ছেলেটাকে তিনি লেখাপড়া করাবেন। গেরস্তির কাজে তাই রুস্তমকে জড়িয়ে পড়তে দেননি। বলতেন, 'তুই পড়াশোনা কর, বাবা। আমি না হয় এক-আধজন মুনি-মজুর বাড়াইয়া লমু।' মা রাজিয়া বেগম তার মেধাবী ছেলে রুস্তমকে দুধ বেচতে বাজারে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ঘরে পালা গরুর দোয়ানো দুধ থেকে ছেলেকে দুই বেলা দুধভাত দেয়া শুরু করেছিলেন। তার রুস্তম একদিন অনেক বড় হবে। লেখাপড়া শিখে ডাক্তার হবে। মায়ের চোখে অনেক স্বপ্ন এসে জমা হয়েছিল। প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব বৃত্তি পাওয়া উপলক্ষে রুস্তমের বাড়িতে দাওয়াত খেতে এসে বলেছিলেন, 'এই ছেলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, জজ, ব্যারিস্টার–যা চাইবে তা-ই হতে পারবে। আপনারা ওর দিকে একটু নজর দেন।' অন্দরবাড়ির আড়াল থেকে হেডমাস্টার সাহেবের এমন কথা শুনে মা রাজিয়ার খুব গর্ব হয়েছিল সেদিন। হেডমাস্টার সাহেবের কাছ থেকে জেনে নিতে ইচ্ছে করেছিল কীভাবে তার রুস্তমের দিকে নজর দিতে হবে। ছেলের প্রশংসা করছে যে মাস্টার, তাকে তার খুব আপন মনে হতে থাকে। আড়াল ভেঙে এগিয়ে এসে মাস্টার সাহেবের পাতে নিজ হাতে খাবার তুলে খাইয়েছিলেন রাজিয়া। মৃত ছেলের কথা বলতে গিয়ে চোখের পানি সামলে রাখতে পারেন না শীর্ণদেহী বৃদ্ধা। বাবা হাতেম আলী একটু দূরে বসে গামছায় চোখ মোছেন নীরবে। আমি আর আমার স্ত্রী ক্রন্দনরত ছেলেহারা মা-বাবার সামনে বসে সান্ত্বনা দেয়ার মত জুতসই কোন বাক্য খুঁজতে থাকি। 'বাপের কান্ধে পুতের লাশ যে কত ভার, আগে বুঝি নাই। বাবা রুস্তম রে...' হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন বৃদ্ধ হাতেম আলী। আমি শোকাকুল এক বাবার কাঁধে হাত রেখে নির্বাক বসে থাকি রুস্তমদের উঠানে। রুস্তমের গায়েবি ফোন পাওয়ার পর সাপ্তাহিক ছুটির দিন বেছে খোঁজ নিতে এসেছিলাম ওদের বাড়িতে। তার শোকাহত মা-বাবার করুণ বিলাপ শুনে চোখ সজল হয়ে ওঠে আমাদের। কান্না কি আসলেই সংক্রামক?

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রামের স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেছিল রুস্তম প্রথম বিভাগে। উপজেলা সদরে একটা কলেজ আছে। কিন্তু রুস্তম ঠিক করল, সে জেলা শহরের কলেজে ভর্তি হবে। বাবা হাতেম আলী তাতেই রাজি হলেন। রুস্তম জেলা শহরের কলেজে চলে গেল একদিন। মা রাজিয়ার এখনও মনে পড়ে সেই দিনটার কথা। জেলা শহরের কলেজে বড়সড় হোস্টেল ছিল। হাতেম আলী একদিন নিজে গিয়ে ছেলেকে হোস্টেলের রুমে তুলে দিয়ে এলেন। বিছানা-বালিশ, বইপত্র, কাপড়-চোপড় সবকিছু কিনে দিতে একসঙ্গে অনেক টাকা বেরিয়ে গেল হাতেম আলীর। গেরস্তের হাতে সারা বছরের খোরপোশ জোগানোর পর এত টাকা সাধারণত থাকে না। তাকে বাধ্য হয়ে এক বিঘা জমি দায়শোধি দিয়ে টাকা জোগাড় করতে হল। কোন কৃষকের আবাদি জমি অন্য আর এক কৃষকের কাছে বন্ধক দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধার নেয়ার পদ্ধতি হল দায়শোধি। ধার ফেরত দেয়ার আগে পর্যন্ত যিনি টাকা দেবেন তিনি জমিতে চাষবাস করে ফসল ভোগ করতে থাকবেন। সুদমুক্ত এই ধার দেয়ার পদ্ধতিতে ধার শোধের আগ পর্যন্ত ফসল লাভের অধিকার সুদের বিকল্প হিসেবে গ্রামগঞ্জে এখনও বেশ জনপ্রিয়। যে কৃষক তার জমি দায়শোধিতে দিয়ে টাকা ধার নেয়, সে ধার শোধের আগ পর্যন্ত ফসল থেকে বঞ্চিত হয়। বিয়েশাদি বা অসুস্থতার মত জরুরি পরিস্থিতিতে জমি দায়শোধি দিয়ে টাকা ধার নিয়ে থাকেন হাতেম আলীর মত কৃষকেরা। হাতেম আলীর আবাদি জমি এতে খানিকটা কমে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি আরেকজনের কাছ থেকে বিঘা তিনেক জমি বর্গা নিয়ে সেই অভাব পুষিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। পরিশ্রম বেড়ে গিয়েছিল তার অনেকটুকু। কিন্তু সোনার টুকরা ছেলে রুস্তম আলীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিন্তায় বাড়তি পরিশ্রম সানন্দে মেনে নিয়েছিলেন হাতেম আলী। রাজিয়া মাঝেমধ্যেই ছেলের জন্য পিঠা বানিয়ে পাঠাতেন শহরের হোস্টেলে। নিজে যেদিন ছেলেকে দেখতে গেলেন হোস্টেলে, তার আগের দিন হাতেম আলীকে বলে-কয়ে হাট থেকে একটা নতুন শাড়ি কিনিয়ে এনেছিলেন। তার খুব আনন্দ লেগেছিল সেদিন। আয়োজন করে তিন রকমের সালুন রেঁধে টিফিন ক্যারিয়ারে ভর্তি করে নিয়েছিলেন ছেলের জন্য। হোস্টেলে কী খায় না খায় কে জানে? স্বামীর সঙ্গে তিন মাইল হেঁটে বড় রাস্তা, তারপর বাসে জেলা শহরের বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে রিকশায় স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে গিয়ে উঠেছিলেন ছেলের হোস্টেলে। রুস্তমের বিছানায় গামছা পেতে একসঙ্গে বসে খেয়েছিলেন তিনজনে। রুস্তম অবশ্য হোস্টেলের ক্যান্টিনে নিয়ে মা-বাবাকে খাওয়াতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজিয়া রাজি হননি। লোকজনের সামনে বসে তিনি খেতে পারবেন না বলে ছেলের রুমেই খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। রাজিয়ার সবকিছু স্পষ্ট মনে আছে।

রুস্তম জেলা শহরের কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করল প্রথম বিভাগেই। হাতেম আলী আর রাজিয়া ছেলের কৃতিত্বে যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এই ছেলে নিশ্চিতভাবে তাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। গ্রামের

www.pathagar.com

মসজিদে সে উপলক্ষে মিলাদ দিয়েছিলেন হাতেম আলী। মসজিদের ইমাম সাহেব বাদজুমা দাওয়াতও খেয়েছিলেন রুস্তমদের ঘরে। রাজিয়া বেগম ছেলেকে কয়টা দিন বাড়িতে রেখে দিতে চেয়েছিলেন। রুস্তম রাজি হয়নি। বলেছিল, তার ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। কোচিং করতে হবে বলে বেশকিছু টাকা বাড়তি চেয়েছিল সে। হাতেম আলীর কাছে তখনই জোগাড় না থাকায় চাচাত ভাইয়ের কাছ থেকে একখণ্ড জমি দায়শোধি দিয়ে টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ঢাকায় থেকে কয়েক মাস কোচিং করেও মেডিকেল কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভর্তি পরীক্ষায় রুস্তম টেকেনি। হাতেম আলী আবার টাকা দিয়েছিলেন কোচিং করার জন্য। কিছুদিন বাদে নাকি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির কোচিং শুরু হবে। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতেও ভর্তি হতে পারেনি রুস্তম। জেদ ধরেছিল ঢাকাতেই পড়বে সে। অবশেষে একটা কলেজে পাস কোর্সে ভর্তি হয় রুস্তম। ডিগ্রি পাস করেছিল সে দ্বিতীয় বিভাগে। ঢাকায় থেকে ডিগ্রি পড়াকালীন রুস্তমের দাবি মোতাবেক খরচের জোগান দিতে হাতেম আলীর একটু কষ্টই হত। কিন্তু ছেলের চোটপাটে যেমন করেই হোক টাকা পাঠাতেন একপ্রকার বাধ্য হয়ে। সে সময়ে রুস্তমের ছোট ভাই আরব আলীকে সৌদি আরব পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আরব আলী লেখাপড়ায় অতটা মনোযোগী ছিল না। এসএসসি পাস করার আগেই সে নবীজির দেশে পাড়ি জমিয়েছিল।

রুস্তম যে নেশায় আসক্ত এই কথাটা প্রথম জানতে পারেন হাতেম আলী। রাজিয়াকে জানালে সে কেমনভাবে নেবে, হৈ-চৈ করবে কিনা এসব ভেবে চুপ মেরে ছিলেন অনেকদিন। মেয়েজামাই রবিউল ব্যাপারটা শ্বশুরকে জানিয়েছিল অতি গোপনে। জেলা শহরে মণিহারি দোকান আছে রবিউলের। সম্বন্ধী রুস্তম নাকি বিভিন্ন অজুহাতে তার কাছ থেকে টাকা ধার এনেছিল কয়েক দফা। অনেকবার চেষ্টা করেও সেই টাকা ফেরত না পেয়ে শ্বশুরকে জানিয়েছিল সে বাধ্য হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে রবিউল এও জানিয়েছিল যে, তার সন্দেহ রুস্তম আলী চরমভাবে নেশাসক্ত হয়ে পড়েছে। হাতেম আলী তা শুনে প্রথমটায় যেন আকাশ থেকে পড়েছিলেন। রুস্তম এমন কাজ করতে পারে, তার ঠিক বিশ্বাস হয়নি। ভেবেছেন মেয়েজামাই হয়ত না বুঝে কিংবা পাওনা টাকা না পাওয়ার ক্ষোভে এমন গুরুতর অভিযোগ তুলছে তার ছেলের বিরুদ্ধে। হাতেম আলী মেয়েজামাইকে টাকা শোধ করে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এই টাকা না দিলে যে বড়ই অশান্তি হবে, তা বুঝে গিয়েছিলেন হাতেম আলী। কিন্তু ছেলের ব্যাপারে যা শুনেছেন তা কীভাবে যাচাই করবেন, বুঝতে পারছিলেন না তিনি। আর যাচাই করে যদি অভিযোগ সত্যি হয়, এর সমাধানই বা কী করে করবেন তিনি? ছেলেকে বাড়িতে আসতে বলেছিলেন। ছেলে আসেনি। বলেছে, তার চাকরির জন্য চেষ্টা চলছে। এ সময়ে বাড়িতে এলে বিরাট সর্বনাশ হয়ে যাবে। হাতেম আলী অগত্যা নিজেই ঢাকা গিয়ে ছেলেকে পাকড়াও করেছিলেন। হাতেম আলীর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে। কিছুটা বিরতি নিলেন তিনি গলা ভারী হয়ে

www.pathagar.com

আসায়। আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'নিশা বলতে বিড়ি-তামুক আমরাও খাইছি। কিন্তু এইসব কী জিনিস খাইত রুস্তম আমি বুঝি নাই।'

রুস্তম বাবার সঙ্গে অনেক হম্বিতম্বি করেছিল। বাড়ি যেতে নাকি কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। হাতেম আলী ধৈর্য ধরে অনেক বুঝিয়ে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। তার সুন্দর ছেলেটার চেহারা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। রাজিয়া ভেবেছিলেন শহরে থেকে খাবার-দাবার ঠিকমত খায় না বলে হয়ত ছেলের চেহারা-স্বাস্থ্য এমন হয়ে গেছে। নিজের কাছে কিছুদিন রেখে সব ঠিক করে দেয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন মমতাময়ী মা। সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই রুস্তমের অত্যাচার শুরু হয়েছিল। তার মেজাজে মা রাজিয়া তটস্থ হয়ে থাকতেন সব সময়। খাবার-দাবার, বিছানা-বালিশ কিছুই তার পছন্দ হচ্ছে না। থালা-বাসন ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে যেত প্রতিবেলা। চিৎকার করে বলত, 'এই পচা রান্ধা খাওন যায়?' রাজিয়ার চোখে পানি চলে আসত। কী বলে তার ছেলে? হাতেম আলী চুপ করে থাকতেন। বুঝতে পারতেন যে, ছেলে তার অসুস্থ। উপজেলা হাসপাতালের এমবিবিএস ডাক্তার দেলোয়ার হোসেনের কাছ থেকে ছেলের নেশাসক্তি বিষয়ে পরামর্শ নিয়েছিলেন একান্তে। তার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রুস্তমকে রাজি করিয়ে চিকিৎসার জন্য ঢাকার কোন ক্লিনিকে ভর্তি করাবেন। অনেকদিনের চিকিৎসায় নাকি নেশার আসক্তি সেরে যায়। ডাক্তার দেলোয়ারের কথায় আশ্বস্ত হয়েছিলেন নিরুপায় বাবা। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল রুস্তম। বাবাকে মাকে মারতে উদ্যত হয়েছিল। প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনেরা হৈ-চৈ হট্টগোল শুনে সমস্যা আঁচ করে নিয়েছিল।

তিন মাস চিকিৎসা শেষে রুস্তম বাড়ি ফিরে এসেছিল। প্রথম কিছুদিন ভালোই ছিল ছেলেটা। ঘরেই থাকত। ডাকলে সাড়া দিত, নইলে চুপচাপ শুয়ে-বসেই কাটত তার দিনগুলো। রাজিয়া নিজের মনকে মানাতে পারতেন না কিছুতেই। করুণ চোখে তাকিয়ে থাকতেন রুস্তমের দিকে। সন্তানের দুঃখী দুঃখী চেহারা দেখে বুকটা তার হাহাকার করে উঠত। নিরিবিলিতে নফল নামাজ পড়ে কান্নাকাটি করতেন ছেলের জন্য। মাসখানেক পর থেকে রুস্তম আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল সকাল ১০টার মধ্যে। দুপুরে কোনোদিন খাবার খেতে বাড়ি ফিরত, কোনদিন হয়তবা ফিরতও না। হাতেম আলী শুনলেন, ছেলে তার উপজেলা সদরে যায় ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। ভাবলেন, তাও ভালো। শহরের নষ্ট বন্ধুদের চেয়ে গ্রামের সহজ-সরল বন্ধু অনেক ভালো। চা-পান খাবে চায়ের দোকানে বসে, না হয় বিড়ি-সিগারেট টানবে। থাকুক ছেলেটা তার বাড়িতেই, নিজের কাছে। নজরে নজরে রাখতে পারবেন। এলাকায় রুস্তমের অন্য কোন বদনাম ছিল না। সবার সঙ্গেই তার ব্যবহার খুব ভালো। তার মত ভদ্র ও বিনয়ী ছেলে আরেকটা খুঁজে পাওয়া যাবে না বলে মুরুব্বিদের প্রশংসা করতে শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন হাতেম আলী।

www.pathagar.com

একপর্যায়ে ছেলেকে হাতখরচের টাকাও দিতে শুরু করলেন। এই বয়সে চা-পানের খরচ তো কিছুটা লাগেই, ভাবলেন হাতেম আলী। বিয়ে দিয়ে দিলে কেমন হয় রুস্তমের? স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করলেন। রাজিয়া বললেন, 'মন্দ হয় না। সংসার হইলে ছেলে আমার ঠিক হইয়া যাইব।' বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ছুটোছুটি চলল বেশ কিছুদিন। একটা বিয়ের সম্বন্ধ ঠিকও হল। এর সূত্র ধরেই খারাপ খবর এল আবার। পাত্রীপক্ষ থেকে জানান হল যে, তারা এই বিয়েতে রাজি নয়। কারণ ছেলে নেশাসক্ত বলে তাদের কাছে পাকা খবর আছে। ঘটক বলল, 'একসময় ছিল, এখন তো সে চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ ভালো।' পাত্রীপক্ষ বলল, 'না, এখনও সে নেশা করে।' রেলস্টেশনের পেছনে রুস্তমের সঙ্গে নেশা করে, এমন একজনই তাদের খবরটা জানিয়েছে। হাতেম আলী আবার ছুটলেন ছেলের পেছনে। রুস্তম এবার আর বাবাকে পাত্তা দেয় না। পারলে বাবার গায়ে হাত তোলে। ঘরের জিনিসপত্র ভাংচুর করে। অশান্তির কোন শেষ নেই যেন। দিনের শুরুতে তার হাতে পাঁচশ'-হাজার টাকা তুলে দিলে ভালো, নইলে আর রক্ষা নেই।

বছর দু'য়েক যেমন করে হোক পরিবারের ভেতরে ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। এর মধ্যে একসময় আমাদের রুস্তম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। উপজেলা হাসপাতালের ডাক্তার বলল, 'জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।' জেলা হাসপাতাল বলল, 'ঢাকায় নিয়ে যান।' ঢাকার হাসপাতাল বলল, 'সময় লাগবে। লিভারে সমস্যা।' সে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিল বলে দলেবলে বন্ধুবান্ধব তাকে দেখতে গেল হাসপাতালে। ফোনের পর ফোন এলো। কিন্তু এসব সামাজিকতা তাকে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দিতে পারল না। পরিবারকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে মাস দু'য়েক বাদে পরপারে চলে গেল রুস্তম। নিঃস্ব করে রেখে গেল তার বাবা হাতেম আলীকে এবং কখনও শেষ না হওয়া কান্নায় ভাসিয়ে দিয়ে গেল মা রাজিয়া বেগমকে। জিজ্ঞেস করেছিলাম হাতেম আলীকে, 'রুস্তমের ফোন থেকে সেদিন আমার কাছে একটা ফোন এসেছিল। কার কাছে আছে সেই ফোনটা, জানেন?' হাতেম আলী বললেন, 'জানি না। ছেলেই যখন নাই, ছেলের ফোনের খবর আর রাখি না।' কে ফোন করেছিল তবে রুস্তমের ফোন থেকে? মরহুম রুস্তম গায়েবি একটা কল করে আমাকে কিছু একটা মনে করিয়ে দিল–সেরকম গাঁজাখুরি কোন গল্প ফাঁদতে মন সায় দিচ্ছে না। বরং মাদকাসক্তি সমস্যার গভীরতা নিয়ে ভাবতে গিয়ে গা শিউরে উঠছে বারবার। শহরাঞ্চল ছাড়িয়ে মাদকাসক্তির মরণছোবল আজকাল নাকি গ্রামগঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপকভাবে। রুস্তম আলীদের সর্বনাশা নেশার কবল থেকে বাঁচাতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিণতি কী?

দৈনিক আমার দেশ-এ ৪ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

জন্ম তব বঙ্গে

হে শহীদ জিয়া, জন্মদিনের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। ৭৬ বছর আগে আজকের এই দিনে, ১৯ জানুয়ারি তারিখে আপনি জন্মেছিলেন এই বঙ্গে। সেই ১৯৩৬ সালে। তখন এই ভূখণ্ড অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত বঙ্গভূমি নামে পরিচিত ছিল। আপনার জন্মস্থান হালের বগুড়া জেলার বাগবাড়ী গ্রাম। সম্ভ্রান্ত এক মুসলমান পরিবারে আপনার জন্ম হল। পারিবারিকভাবে নাম রাখা হল কমল। আনুষ্ঠানিক নাম জিয়াউর রহমান। আপনার জন্ম উপলক্ষে পাখিরা সেদিন কলকাকলিতে মুখর হয়েছিল। ফুলেরা ছড়িয়েছিল বাড়তি সৌরভ। সূর্য যেন একটু বেশি পরিমাণে জ্বলে উঠেছিল। ধানের শীষে মৃদু দোল লেগেছিল। প্রকৃতি বুঝে গিয়েছিল অনন্য এক কমল কলি হয়ে কেবল চোখ মেলল। এই কমল একদিন ফুল হয়ে ফুটবে এবং শোভায়-সৌরভে তার জন্মভূমিকে আলোকিত করবে।

হে ক্ষণজন্মা, আপনার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল কলকাতায় পার্ক সার্কাসের এক পাঠশালায়। তখন আপনার বয়স মাত্র চার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। সেই শিশু বয়সে আপনি মহাযুদ্ধের দামামা শুনতে পেয়েছিলেন। ভারতজুড়ে চলছে তখন স্বাধীনতার আন্দোলন। মহাযুদ্ধের বেকায়দায় পরাক্রমশালী ব্রিটিশরাজ আত্মরক্ষার্থে পালানোর পথ খুঁজছে। কলকাতায় যে কোন সময় জাপানি বোমা পড়বে–সেই আতঙ্কে আপনার পিতা আপনাকেসহ পুরো পরিবারকে বগুড়ায় পাঠিয়ে দিলেন। গ্রামের স্কুলেই পাঠ গ্রহণ করলেন বেশ কয়েক বছর। মহাযুদ্ধের শেষ দিকে কলকাতা ফিরে গেলেন আবার। ভর্তি হলেন বিখ্যাত হেয়ার স্কুলে। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত হেয়ার স্কুলেই আপনার লেখাপড়া চলল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ হল এবং পাকিস্তান সৃষ্টি হল। আপনার পিতা পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকরি নিয়ে কলকাতা ছেড়ে করাচি গেলেন। পরিবারের সবার সঙ্গে আপনিও গেলেন। করাচি একাডেমিতে আবার পড়ালেখা শুরু করলেন।

১৯৫২ সালে এই করাচি একাডেমি থেকেই আপনি মেট্রিক পাশ করলেন। মানসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি আপনি শিক্ষা গ্রহণ করলেন সে সময় ঘটে যাওয়া ইতিহাসের বাঁকফেরানো সব ঘটনা থেকে। সেই অপরিণত বয়সে এত কিছু চাক্ষুষ দেখে দেখে আপনি বেড়ে উঠছিলেন এবং পরিণত হয়ে উঠছিলেন। আপনার মননে ও চিন্তায় এসব ঐতিহাসিক ঘটনা সুদূরপ্রসারী রেখাপাত করেছিল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হে উন্নত শির বীর, ১৯৫৩ সালে আপনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে জেন্টলম্যান ক্যাডেট অফিসার হিসেবে যোগ দিলেন। সে সময়ের হাতেগোনা কয়েকজন বাঙালি সেনা কর্মকর্তার মধ্যে আপনার মেধা, শৌর্য-বীর্য ও পেশাগত দক্ষতার কারণে সবার নজর কেড়েছিলেন আপনি।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে আপনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীন আলফা কোম্পানির কমান্ডার হিসেবে লাহোরের খেমকারান সেক্টরে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে আপনার কোম্পানি সমগ্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বীরত্বের খেতাব লাভ করল। পাঞ্জাব, বালুচ, পাঠান প্রভৃতি স্বনামখ্যাত রেজিমেন্টের ভিড়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক অখ্যাত কোম্পানি বীরত্বের তকমা ছিনিয়ে নেয়ায় সবাই ফিরে তাকিয়েছিল আপনার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে। জানতে চেয়েছিল, কে এই বাঙালি বীর?

হে মহান স্বাধীনতার ঘোষক, ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি যখন জেগে উঠেছে স্বাধীনতার দাবিতে, আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান তখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে দর কষাকষির আলোচনা চালাচ্ছেন তিনি। কিন্তু বাঙালি জাতি তত দিনে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক কূটচাল আর টালবাহানার জের ধরে এল ২৫ মার্চ কালরাত্রি। অপারেশন সার্চলাইট নামে বাঙালি জাতির ওপর ইতিহাসের ভয়াবহতম গণহত্যা চালাল জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পাক বাহিনী।

আকস্মিক গণহত্যার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতায় গোটা জাতি হয়ে পড়ল ভীত, বিহ্বল এবং দিশাহারা। শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার বরণ করলেন ২৫ মার্চ রাতেই এবং আওয়ামী লীগের সব প্রধান নেতা সেই রাতেই আত্মগোপন করে সীমান্ত অতিক্রম করলেন। সেই দিশাহীন অবস্থার মধ্যে কে দেবে জাতিকে আশা? কে দেবে ভরসা? কে তাদের বলবে–'ভয় পেও না বাঙালি জাতি। এস আমরা রুখে দাঁড়াই!' আপনিই আশা দিলেন, ভরসা দিলেন এবং সাহস জোগালেন পলায়নপর ভীতসন্ত্রস্ত জাতিকে। ২৫ মার্চ রাতে যখন শুনলেন নিজ জাতির ওপর গণহত্যার খবর, একমুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন রুখে দাঁড়ানোর। সিপাহসালার হিসেবে নিজের রেজিমেন্টের যোদ্ধাদের বললেন–'উই রিভোল্ট' অর্থাৎ 'আমরা রুখে দাঁড়ালাম।' সমগ্র জাতিকে ভরসা দিতে ছুটলেন কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে। সেখান থেকে উচ্চারণ করলেন এক কালজয়ী ঘোষণা–'আমি মেজর জিয়া বলছি। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।'

এমন একটি ঘোষণা দিলেন আপনি, যা শুনে গোটা জাতি দিশা খুঁজে পেল, পলায়নপরতা থেকে ফিরে দাঁড়াল, সিদ্ধান্ত নিল রুখে দাঁড়ানোর এবং নয় মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করে ফেলল। যতদিন এই বাংলাদেশ থাকবে,

www.pathagar.com

পতপত করে উড়বে লাল-সবুজ স্বাধীন পতাকা; ততদিন বাজতেই থাকবে আপনার এই কালজয়ী স্বাধীনতার ঘোষণা বাংলার পথে-ঘাটে-প্রান্তরে, মানুষের মুখে মুখে, পাখপাখালির কলতানে।

হে বীর উত্তম মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতা যুদ্ধে আপনার অবদান শুধু যে স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়; আপনি একই সঙ্গে ২৫ মার্চ রাত থেকেই সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সূচনা করেন। নিজের অধস্তন বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে রেজিমেন্টে কর্মরত অন্য পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের তাৎক্ষণিকভাবে নিরস্ত্র ও বন্দি করেন। পরাক্রমশালী পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিকভাবে মোকাবিলা করবার লক্ষ্যে নিজের রেজিমেন্টসহ সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিকদের সংগঠিত করে দুর্ধর্ষ এক বাহিনী গড়ে তোলেন। নিজের জীবন, পেশা এবং পরিবারের নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করে এমনতর সাহসী ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় নিজের অনন্য স্থান করে নিয়েছিলেন আপনি। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে চট্টগ্রাম ও এর আশপাশের অঞ্চল আপনার নেতৃত্বে মুক্তাঞ্চল হিসেবে বজায় ছিল।

পরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে তার অধীনে আপানি সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তারও কিছুদিন পরে জেড ফোর্সের কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধে আপনার বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য আপনি বীর উত্তম খেতাব লাভ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আপনার এই অনন্য সাহসী ভূমিকা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

হে অকুতোভয় বিপ্লবী, স্বাধীনতার পর কুমিল্লায় একটি ব্রিগেডের দায়িত্ব অর্পিত হয় আপনার ওপর। ১৯৭২ সালে আপনি সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে দেশে এক দমবন্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয়। অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর মাঝারি পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তার অভ্যুত্থানে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত হন।

এই দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগেরই একটি বৃহৎ অংশ শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী খন্দকার মুশতাক আহমদের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে। নানামুখী ষড়যন্ত্র ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থান সংঘটিত হলে শেখ মুজিব হত্যাকারী সেনাকর্মকর্তাদের আপস-মীমাংসার অংশ হিসেবে বিদেশ চলে যেতে দেয়া হয় এবং চেইন অফ কমান্ড বা নির্দেশসূত্র ভেঙে আপনাকে গৃহবন্দী করা হয়। খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান সেনাবাহিনীর সাধারণ সিপাহি ও জনসাধারণের মধ্যে কোনরকম গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়। সততা ও পেশাগত দক্ষতার জন্য

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর সাধারণ সিপাহিদের মধ্যে আপনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। তাই আপনার নামে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর তারিখে ঐতিহাসিক সিপাহি জনতার বিপ্লব সংঘটিত হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সিপাহি জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আপনাকে গৃহবন্দি দশা থেকে মুক্ত করে তাদের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করে। আপনার ওপর অর্পিত হয় নজিরবিহীন এক মহান বিপ্লবের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং দেশের সর্বস্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মত গুরুদায়িত্ব। দেশ ও জাতির স্বার্থে বরাবরের মত আপনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কঠিন সময়েও। আপনার সেই মহান বিপ্লবী ভূমিকা আজও জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে এবং ৭ নভেম্বর তারিখটিকে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে থাকে।

হে সফল রাষ্ট্রনায়ক, দেশ ও জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে আপনার কাঁধে যখন রাষ্ট্রের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল আপনি তা গ্রহণ করেছিলেন গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেনাবাহিনীতে চেইন অফ কমান্ড বা নির্দেশসূত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বেসামরিক প্রশাসনকেও ঢেলে সাজিয়েছিলেন। বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন এবং বাকশালের অধীনে বিলুপ্ত আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দলকে পুনরুজ্জীবিত হয়ে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় রাজনীতি করবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। বাকশাল আমলে নিষিদ্ধঘোষিত সব সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং বিচার বিভাগের হারানো স্বাধীনতাও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। নানা মত, গোষ্ঠী ও শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে স্থিতিশীল ও স্বনির্ভর করে তোলার কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করেছিলেন আপনি।

১৯৭৮ সালের ৩ জুন তারিখে আপনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। আপনার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে দেশে এক নতুন কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। দেশে কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনি সব পতিত জমিতে আবাদের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিলেন এবং সেচের সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য সাড়াজাগানো খালকাটা কর্মসূচি চালু করলেন। শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্ধ সরকারি কলকারখানা চালু করে তিন শিফটে কাজ শুরু করলেন এবং বেসরকারি খাতে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের জন্যও প্রণোদনা দিলেন। আপনার আমলেই গার্মেন্ট শিল্প পরীক্ষামূলক সূচনা লাভ করে, যা আজ আমাদের দেশের প্রধান রফতানি খাতে পরিণত হয়েছে।

গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার আপনিই শুরু করেছিলেন এবং বিদেশে শ্রমশক্তি রফতানিও আপনার আমলেই শুরু হয়েছিল। নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে গণশিক্ষা কর্মসূচি চালু করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি চালু করা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপনের মাধ্যমে পশ্চাৎপদ নারীসমাজকে সামনে এগিয়ে আনার উদ্যোগ, শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠা ও টেলিভিশনে নতুন কুঁড়ি অনুষ্ঠান

www.pathagar.com

চালু করা প্রভৃতি আপনার যুগান্তকারী কিছু কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম–যার সুদূরপ্রসারী সুফল আজও বাংলাদেশের জনগণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি বাংলাদেশকে দিয়েছিলেন এক ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির দিশা। নতজানু একমুখী পররাষ্ট্র নীতির অবসান করে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মুসলিম বিশ্বসহ জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন আপনি। বাংলাদেশের যেটুকু সমৃদ্ধি আজ চোখে পড়ে চারিপাশে, তার অধিকাংশ আপনার আমলে রোপিত নানা ধরনের বীজের সুফল। রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতার এমন দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল।

হে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতা, বাংলাদেশ নামে জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন আপনি। যুগান্তকারী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রবর্তন ও এর তাত্ত্বিক ভিত্তি স্পষ্টীকরণের কাজটি করেছিলেন আপনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করার লক্ষ্যে।

স্বাধীন বাংলাদেশে বসবাসরত সব অধিবাসীর আত্মপরিচয় নিয়ে সব সংশয়ের অবসান করে দিয়েছিলেন এর মাধ্যমে। বিভেদ ও অনৈক্যের অবসান করে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশী জাতি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শের ভিত্তিতে আপনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কালজয়ী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি।

১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনার আমলে পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছিল এবং সেই নির্বাচনে আপনার প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী হয়েছিল। বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনে আপনার এবং আপনার প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপির অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য। আপনার প্রণীত ১৯ দফা কর্মসূচি উন্নয়নের এক নতুন দিগন্তের উণ্মোচন করেছিল। নেতা হিসেবে দেশের আপামর মানুষকে অনুপ্রাণিত করে নানা উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করেছিলেন আপনি। আপনার মত জনদরদি কর্মঠ নেতা পেয়ে দেশবাসী অভিভূত হয়েছিল, কর্মচাঞ্চল্যে জেগে উঠেছিল।

হে মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ, আপনার কর্মময় বর্ণাঢ্য নেতৃত্ব যখন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিচ্ছিল সামনের দিকে, তখনই ছোবল মেরেছিল আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্রকারীরা। ১৯৮১ সালের ৩০ মে তারিখে আপনি কিছু বিপথগামী সেনাকর্মকর্তার হাতে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে শাহাদত বরণ করেছিলেন। সারা দেশ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সময় থমকে দাঁড়িয়েছিল। আপনার শাহাদত বরণের মর্মান্তিক খবরটি ছড়িয়ে পড়ার পর কান্নার রোল পড়েছিল দেশজুড়ে।

আপনার জানাজায় নেমেছিল লাখো মানুষের ঢল। ষড়যন্ত্রকারীরা ভেবেছিল, আপনার শাহাদত বরণের পরপর হয়ত থেমে যাবে এই দেশে জাতীয়তাবাদের

www.pathagar.com

মিছিল। কিন্তু আপনার আদর্শ সময়ের পরিক্রমায় বিলীন হয়ে যায়নি; সগৌরবে টিকে আছে জনতার হৃদয়ের মণিকোঠায়। দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে আপনার গড়া দল বিএনপি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষা দেয়ার প্রয়োজনে আজও সগৌরবে যুগোপযোগী ভূমিকা রেখে চলেছে। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আপনার সহধর্মিণী দেশনেত্রী খালেদা জিয়া গত তিন দশকে আপনার গড়া দলকে নিয়ে গেছেন দেশের প্রতিটি আনাচে-কানাচে, মানুষের দোরগোড়ায়। আপনার সুযোগ্য পুত্র তারেক রহমানও প্রতিকূল ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে নিজেকে তৈরি করেছেন আপনার আদর্শের ঝান্ডাকে সুদূর ভবিষ্যতে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে। আপনার আদর্শের জয়গান এদেশে বিরাজমান ছিল, আছে এবং থাকবে চিরদিন।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৭৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমার দেশ, যুগান্তর, নয়াদিগন্ত, দিনকাল, সংগ্রাম প্রভৃতি জাতীয় দৈনিকে বিএনপি কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে ছাপা হয়েছে ১৯ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

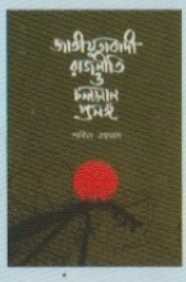

JATIOTABADI RAJNEETI 'O' CHOLOMAN PROSHONGO
by Shakil Wahed

Price Bdt 300.00 only
US $ 9.00 only
Cover Design : Md. Uzzal Hossain

শিকড়
A SHIKOR Publication
ISBN 984760162-3
9 789847 601625